শক্তিশাস্ত্র
শক্তিশাস্ত্র
অর্ধেন্দু সেন

শক্তিশাস্ত্র

পরমাণু শক্তি, বিশ্ব উষ্ণায়ন, ইত্যাদি বিষয়ে

অর্ধেন্দু সেন

iMAP
International Mass Awareness Programme

Shaktishastra
by
Ardhendu Sen

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১৩

প্রকাশক
ইন্টারন্যাশনাল মাস অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম
২৭ দেশবন্ধু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
ফোন : (০৩৩) ২৪২৫ ৪৫৭৫/৮৯৩৫
www.imaptrust.org

অলংকরণ
অনুপ রায়

টাইপ সেট
চঞ্চল কুমার দাস

মুদ্রণ
নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬, গ্রে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬

বিপণন
দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানি

দাম
৩০০ টাকা

সূচিপত্র

মুখবন্ধ : ৫

অধ্যায় ১ : **আগের কথা** / ১৫

প্রথম ভাগ জীবাশ্ম জ্বালানি

অধ্যায় ২ : **কয়লা** /২৩

কয়লা কী? ● কয়লা ব্যবহারের ইতিহাস ● খনির গভীর থেকে ● কয়লা ও পরিবেশ ● কয়লার আন্তর্জাতিক বাজার ● ভারতে কয়লা ● আমাদের দেশে কতখানি কয়লা আছে?

অধ্যায় ৩ : **পেট্রোলিয়ম** /৩৭

ইতিহাস ● তেল শোধন ● অনুসন্ধান ও উৎপাদন ● উৎপাদনের শীর্ষবিন্দু ● তেলের দাম ● আগামীকালের বাজার ● তেলের রাজনীতি ● তেল ও পরিবেশ ● ভারতীয় প্রেক্ষাপট

অধ্যায় ৪ : **প্রাকৃতিক গ্যাস** /৬৫

গ্যাস শিল্পের বিকাশ ● আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ● ভারতে আমদানি ● লিকুইফায়েড ন্যাচরাল গ্যাস (এল এন জি) ● দাম ও নিয়ন্ত্রণ

দ্বিতীয় ভাগ নবীকরণীয় শক্তি

অধ্যায় ৫ : **জলবিদ্যুৎ** /৮৪

গোড়াপত্তন ● ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

অধ্যায় ৬ : **সৌরশক্তি** /৯২

একটি নবীকরণীয় শক্তি ● সৌর তাপবিদ্যুৎ ● সৌর ফোটোভোলটায়িক ● সৌরশক্তির অন্যান্য ব্যবহার

অধ্যায় ৭ : **বায়ুশক্তি** /১০৫

বায়ুশক্তি সম্পদ ● বায়ুশক্তির সম্ভাবনা ● বায়ু থেকে বিদ্যুৎ ● বিশ্ব পরিবেশ

অধ্যায় ৮ : **জৈব পদার্থ থেকে শক্তি** /১১২

পুরানোর সঙ্গে নতুন ● জৈব গ্যাস থেকে শক্তি ● শুকনো জৈব পদার্থ ● জৈবজ্বালানি ● জৈব রসায়ন ● ব্রাজিলিয় কর্মসূচী ● ভারতীয় কর্মসূচী

তৃতীয় ভাগ শক্তির অন্যান্য উৎস

অধ্যায় ৯ : **পরমাণু শক্তি** /১৩৩

পারমাণবিক বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিশন ● পরমাণু চুল্লি ● ইউরেনিয়ামের মজুত ভাণ্ডার ● পরমাণু শক্তির সমস্যা ● পুনরুজ্জীবন ? ● ভারতের ত্রিপর্যায় কর্মসূচী

অধ্যায় ১০ : **দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস** /১৫৬

বিদ্যুৎ ● হাইড্রোজেন

অধ্যায় ১১ : **অপ্রচলিত এবং কম প্রচলিত শক্তি** /১৭০

স্বচ্ছতম উৎস—শক্তির সাশ্রয় ● অপ্রচলিত তেল ● অপ্রচলিত গ্যাস ● কোল বেড মিথেন ● শেল তেল ও গ্যাস ● গ্যাস হাইড্রেট ● আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশন (ভূগর্ভস্থ কয়লার গ্যাসে রূপান্তর) ● ভূতাপীয় শক্তি ● বর্জ্য পদার্থ থেকে শক্তি ● সাগরজাত শক্তি ● জোয়ার এবং সমুদ্রস্রোত জাত শক্তি ● তরঙ্গ শক্তি ● মহাসাগরীয় তাপশক্তি রূপান্তর (ও টি ই সি)

চতুর্থ ভাগ শক্তি ব্যবহারের সমস্যা

অধ্যায় ১২ : **শক্তি ও বিশ্ব উষ্ণায়ন** /১৯৮

বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যা ● ব্যর্থতার দন্ড ● শক্তি ব্যবহারের ফল ● দেশ-ভিত্তিক নির্গমনের মাত্রা নির্ধারণ

অধ্যায় ১৩ : **শক্তি নিরাপত্তার অর্থ** /২১৪

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলা ● তেলের দীর্ঘমেয়াদি যোগান ● পরবর্তী গিগাওয়াটের চিন্তা ● আবার উৎপাদনের শীর্ষবিন্দু ● দারিদ্র্য এবং শক্তির নাগাল

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ /২২৮

উৎস ও অনুসন্ধান /২৩৩

মুখবন্ধ

প্রসাদরঞ্জন রায়

মানব সভ্যতার শক্তি-তৃষ্ণা প্রায় অপরিসীম। অর্থনীতিবিদ্‌দের একাংশ মনে করেন যে মাথা পিছু আয়ের পরিবর্তে মাথা পিছু শক্তির ব্যবহারকেই উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে কাজে লাগানো যায়। আজ থেকে একশো বছর আগে নোবেল-জয়ী বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক সডি তাঁর Matter and Energy (১৯১২) বইতে লিখেছিলেন :

"No one today is ignorant of the part played by energy, not only in science, but in industry, politics and the whole science of human welfare. From the cradle to the grave everyone is dependent on Nature for an absolutely continuous supply of energy in one or other of its numerous forms. When the supplies are ample there is prosperity, expansion and development. When they are not, there is want. Often, it is true, energy appears to play a very subsidiary and indirect part in the development, just as, no doubt, the supply of wind might be looked upon as playing a very secondary role in the music of an organ. The fact remains that, if the supply of energy failed, modern civilization would come to an end as abruptly as does the music of an organ deprived of wind."

এই কথাগুলি আজও প্রায় ততখানিই সত্য। তাই সাম্প্রতিককালে বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই নজর পড়েছে Energy Security বা শক্তি নিরাপত্তার দিকে। কিন্তু শক্তি নিরাপত্তা আসবে কোন পথে? World Energy Council তাঁদের ২০১১ সালের Policies for the Future : 2011 Assessment of Country Energy and Climate Policies রিপোর্টে বলেছেন কেবল শক্তি নিরাপত্তা নয় এই নিরাপত্তার ধারাবাহিকতাই (Energy sustainability) কাম্য। আবার Energy Sustainability'র তিনটি অঙ্গ। তাঁদের ভাষায় :

Energy Sustainability Dimensions

Energy security. For both net energy importers and exporters this includes the effective management of primary energy supply from domestic and external sources; the reliability of energy infrastructure; and the ability of participating energy companies to meet current and future demand. For countries that are net energy exporters, this also relates to an ability to maintain revenues from external sales markets.

Social equity. This concerns the accessibility and affordability of energy supply across the population.

Environmental impact mitigation. This encompasses the achievement of supply and demand-side of energy efficiencies and the development of energy supply from renewable and other low-carbon sources.

উন্নয়ন ও শক্তিনীতির ক্ষেত্রে World Energy Council তিনটি নীতির কথা বলেছেন :

The Three Energy Goals : Accessibility, Availability, Acceptability

WEC considers economic growth together with national and international institutional reforms essential to energy accessibility for everyone, including the poorest two billion people in the world. When only some individuals or regions of the world benefit from energy development and others are left behind, the ensuing political and social instability can pose a significant threat to world peace and, in turn, to energy availability through supply disruptions. In addition to the impact of accessibility on energy availability, it is also linked closely to energy acceptability. Investment partnerships to achieve energy accessibility and availability could also address social and environmental issues.

Accessibility is the provision of reliable and affordable modern energy services for which a payment is made. It depends on policies specifically targeted to meeting the needs of the poor, in the context of increasing reliance on market signals. The best way to ensure that a growing number of people will be able to afford commercial energy in line with their needs is to accelerate economic growth and pursue more equitable income distribution. This requires increasing reliance on the market, while addressing cases of market "failure" with special policies. An energy tariff reflecting all costs, including external costs such as emissions or waste management, is necessary to secure adequate investment and encourage energy efficiency and environmentally preferred technologies, but such a tariff would be unaffordable for many people. At the same time, a tariff subsidised down to a socially affordable price would not attract sufficient investment, consequently in the long-run working against the interests of those who are in need of commercial energy infrastructure. There may be a need, in some cases, to subsidise energy technology and delivery for a period of time without creating price distortions or at least by keeping them to a minimum. Variable, maintenance and extension costs need to be reflected in the price paid for energy, but sunk costs might be handled differently in some circumstances.

Availability covers both quality and reliability of delivered energy. The continuity of energy supply, particularly electricity, is essential in the 21st Century. While short-term interruptible supply may be feasible in certain circumstances as long as the conditions are known and understood by customers, unexpected power cuts bear a high cost for society that cannot be ignored. The world's growing reliance on information technologies makes reliability even more critical than eight years ago. Energy availability requires a diversified energy portfolio consistent with particular national circumstances together with the means to harness potential new energy sources. Most WEC Member Committees agree that all energy resources will be needed over the next fifty years and there is no case for the arbitrary exclusion of any source of energy.

Acceptability addresses environmental goals and public attitudes. Local pollution is a cause of harm to billions of people, especially in developing countries. Global climate change has become an important concern. Mindful of these two facts, developing countries are concerned about both the potential impact of climate change-related response measures on their economies, and the rising levels of consumer-based household emissions which create local (urban) and regional pollution (e.g. such as acid rain's impact on crops and forests). The energy sector is one area in which new and readily available technologies have already reduced emissions and hold out prospects for future improvement. Of course, environmentally friendly technologies have to be developed, diffused, maintained and expanded in all parts of the world. Hence, there is a need to foster adequate local capacity to ensure that the technologies can be used and maintained by local people. Energy resources must be produced and used in a manner that protects and preserves the local and global environment now and in the future.

Addressing these three goals of energy accessibility, availability and acceptability is fundamental to political stability world-wide, to energy business strategy in the 21st century, and to achieving a sustainable future for the world.

অবশ্য উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে শক্তির উৎসের ব্যবহার ক্রমশ পাল্টে গেছে। পৃথিবীর সব শক্তির উৎস আদতে সৌর শক্তি। উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় এর একটা সামান্য অংশ (০.০২ শতাংশ) প্রবেশ করে জৈব চক্রে। উদ্ভিদ ও তৃণভোজী প্রাণীর মাধ্যমে তা পরিণত হয় পেশী শক্তিতে এবং পেশী শক্তিই মানুষের প্রয়োজনে লাগত আদি যুগে। ক্রমে আগুনের ব্যবহার পশুপালন এবং চাকা ও লিভার প্রভৃতি সহজ যন্ত্রের ব্যবহারে পেশীশক্তির বদলে পশুশক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার বাড়তে থাকে। ১৮ শতক থেকে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার ভিতটাই পালটে দেয় শিল্পবিপ্লব ও নগরায়ণ। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের বদলে কয়লার ব্যবহার বাড়ে ব্যাপক হারে। ১৮ শতকের গোড়ায় জ্বালানির মাত্র শতকরা ৪ ভাগ ছিল কয়লা, ১০০ বছরে তা পালটে দাঁড়ায় শতকরা ৯০ ভাগে। কয়লাকে তখন বলা হত 'black diamond' আর আধুনিক সভ্যতায় কয়লার অবদানের জয়গান গেয়েছিলেন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জি এফ পোর্টার তাঁর The Progress of the Nation (১৮৪৭) বইতে :

"If, on the one hand, our great mechanical inventions owed so much to the abundance and consequent cheapness of our fuel, it is none the less true that some of those inventions have, on the other hand, materially assisted in bringing about that abundance."

অবশ্যই কয়লার ধোঁয়ার সমস্যার কথা জানাই ছিল। কিন্তু গত ১৫০ বছরে পরিস্থিতিটা এত পালটে যায় যে সম্প্রতি NASA'র পরিবেশবিজ্ঞানী জন হ্যানমেন কয়লাকে "the dirtiest fuel available" বলে বলেছেন "Coal is the single greatest threat to civilisation and all life on our planet."

১৮৫৯ সালে খনিজ তৈল বা পেট্রোলিয়ামের বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ হয় এবং স্পষ্টই দেখা গেল কয়লার থেকে পেট্রোলিয়াম (বা তার নিকট আত্মীয় প্রাকৃতিক গ্যাস) অনেক পরিষ্কার জ্বালানি এবং তার দাহিকা শক্তিও অনেক উন্নত। তখন পাশ্চাত্য দুনিয়ায় পেট্রোলিয়ামকে বলা হত 'perfect fuel' এবং তার ব্যবহার বৈপ্লবিক হারে বৃদ্ধি পায়। অবশ্যই তার জন্য দায়ী 'ইন্টারনাল কমবাসশন এঞ্জিন' ও মোটর গাড়ির ক্রমান্বয়ে অধিক ব্যবহার এবং বিদ্যুতের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও তার চাহিদার বৃদ্ধি।

অবশ্যই খনিজ তেলের বা প্রাকৃতিক গ্যাসের যোগান সর্বত্র সমান ছিল না এবং জ্বালানির উৎস আমদানি-নির্ভর হয়ে পড়ায় গরীব দেশগুলি আর্থিক সমস্যায় পড়ে যায়। তবু ১৯৭০ সালের মধ্যে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহারকে (শতকরা ২৫ ভাগ) পিছনে ফেলে দেয় খনিজ তেলের ব্যবহার (শতকরা ৪১ ভাগ)—শক্তি যোগানের বাকিটা আসত প্রাকৃতিক গ্যাস ও জলবিদ্যুৎ থেকে।

হয়তো এই ধারাটি আরো কিছুকাল চলত, কিন্তু সত্তরের দশকে তিনটি ঘটনা এই উন্নয়নের মডেলের ভিত ধরে টান মারে। এর প্রথমটি ১৯৭২ সালে Club of Rome-এর তরফে প্রকাশিত ডেভিড ও ডোনেলা মেডোজ তাঁদের The Limits to Growth রিপোর্টে দেখান যে সম্পদ ব্যবহারের বর্তমান হার (ও তার বৃদ্ধির হার) দীর্ঘদিন ধরে রাখা যাবে না অর্থাৎ তা unsustainable এবং সমস্ত অপুনর্নবীকরণ- যোগ্য সম্পদের (non-renewable resource) ভাঁড়ার ফুরিয়ে আসছে—যার মধ্যে প্রধান বিভিন্ন ধাতু এবং শক্তির উৎস (কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস)। প্রথমে এ কথা অনেকেই মানতে চাননি এবং মেডোজ-রা তাঁদের রিপোর্টে দুবার সংশোধনও করেন, কিন্তু আজ তা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং খনিজ তেলের বহু উৎপাদক দেশেই উৎপাদন শীর্ষে উঠে আবার কমতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণাটি এক বিশাল ধাক্কা খেল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ভূ-রাজনৈতিক—১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যের তেল-উৎপাদক দেশগুলির সংগঠন 'ওপেক' (OPEC) তেল উৎপাদন ও রপ্তানি কমিয়ে দেয়, ফলে চাহিদা ও যোগানের সহজ শর্ত অনুসারে দাম বেড়ে যায় হু হু করে। ফলে পশ্চিমী দেশগুলিতে সংকট দেখা দেয় ও বিপদে পড়ে যায় তেল আমদানি-কারক ছোট দেশগুলি। বিখ্যাত মার্কিন পরিবেশবিদ্ ব্যারি কমনার বলেন "Oil represents the energy crisis"। ১৯৮০-র দশক থেকে কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা বদলে যায় এবং বর্তমানে মোট খনিজ তেলের উৎপাদন ১৯৭০ সালের তুলনায় ডবল, যদিও দাম সে তুলনায় প্রায় ২৫ গুণ। এ দুটি ঘটনার ফলে দুনিয়া জুড়ে গত ২৫ বছরে ঘটেছে তেল ও অপুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস সন্ধান, শক্তির ব্যবহারে কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং ধাতুর পুর্নব্যবহার বা ধাতুর পরিবর্তে প্লাস্টিক ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি। তৃতীয় বিষয়টি বিশ্বের উষ্ণায়ন বা 'গ্রীনহাউস এফেক্ট' যার জন্য মূলত দায়ী জ্বালানির দহন। বিষয়টি তত্ত্বগতভাবে অনেকদিন জানা থাকলেও ১৯৭০-এর দশক থেকে এর স্পষ্ট প্রমাণ বিজ্ঞানীদের হাতে আসে। দেখা যায় যে গত শতকে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৭৪ সেলসিয়াস ডিগ্রি এবং বিশ্বের উষ্ণতম কুড়িটি বছরের ১৯টিই ছিল গত দুই দশকে। আন্তর্জাতিক সংস্থা Inter-Governmental Panel for Climate Change (IPCC) এই সিদ্ধান্তে এসেছেন :

"most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations"

এই পটভূমিতে বিশ্ব শক্তি পরিস্থিতি আগামী দিনে কোন্ পথে চলবে? পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আন্তর্জাতিক সংস্থা International Energy Agency (IEA) তাঁদের ২০০৮ সালের রিপোর্ট World Energy Outlook 2008-এ পেশ করেছেন।

তাঁদের মতে Business As Usual Scenario-তে (অর্থাৎ যেমন চলছে সেইভাবেই চললে) পৃথিবীতে শক্তির চাহিদা 2006 থেকে 2030 পর্যন্ত পঁচিশ বছরে শতকরা 1.6-এর কিছু বেশি হারে মোট শতকরা 45 ভাগ বাড়বে। এই বর্ধিত চাহিদার অর্ধেকটাই আসবে চীন আর ভারত থেকে, কারণ পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলি শক্তি ব্যবহারে, কার্যকারিতায় এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই শক্তির উৎস হিসেবে মূলত তখনও ব্যবহৃত হবে ফসিল জ্বালানি (অর্থাৎ কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস) এবং শতকরা 80 ভাগ শক্তিই আসবে ফসিল জ্বালানি থেকে, বাকিটা পরমাণু বিদ্যুৎ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস থেকে—পেট্রোলিয়াম নির্ভরশীলতা কমবে বর্তমানের শতকরা 40 ভাগ থেকে শতকরা 30 ভাগে, কয়লার ব্যবহার অল্প বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে শতকরা

29 ভাগ, প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার দাঁড়াবে শতকরা 22 ভাগ। এই Business As Usual Scenario-তেও আগামী পঁচিশ বছরে বিশ্বব্যাপী 26,000 বিলিয়ন ডলারের লগ্নী দরকার হবে—প্রায় অর্ধেকটা বিদ্যুৎ উৎপাদনে, বাকিটা জ্বালানি নিষ্কাশনে। কিন্তু এইভাবে চললে তার ফল হবে মারাত্মক—কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বর্তমান 383 পি পি এম থেকে 600 পি পি এম ছাড়িয়ে যাবে এবং এজন্য গড় তাপমাত্রা বাড়বে 6.4^{0}C। ফল সহজেই অনুমেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে World Energy Outlook, 2008-এ বলা হয়েছে :

"The world's energy system is at a crossroads. Current global trends in energy supply and consumption are patently unsustainable-environmentally, economically, socially. But that can-and must–be altered; *there's still time to change the road we're on.* It is not an exaggeration to claim that the future of human prosperity depends on how successfully we tackle the two central energy challenges facing us today : securing the supply of reliable and affordable energy; and effecting a rapid transformation to a low-carbon, efficient and environmentally benign system of energy supply. What is needed is nothing short of an energy revolution."

অবশ্যই এই Business As Usual Scenario চলতে দেওয়া যায় না। IEA'র Executive Director নোবুও তানাকা বলেছেন :

"We cannot let the financial and economic crisis delay the policy action that is urgently needed to ensure secure energy supplies and to curtail rising emissions of greenhouse gases. We must usher in a global energy revolution by improving energy efficiency and increasing the deployment of low-carbon energy."

এ কাজটি অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন। এ পথে কি আমরা সত্যি চলতে পারব?

বিশ্বজোড়া এই শক্তি পরিস্থিতিতে ভারতের শক্তিনীতি কোন্ পথে? ভারতে মাথাপিছু বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার অত্যন্ত কম—2007 সালেও মাত্র গড়ে মাথাপিছু 503 কিলোওয়াট-আওয়ার, যা উন্নত দেশগুলির তুলনায় খুব কমতো বটেই, এমনকি চীন, ব্রেজিল বা মেক্সিকোর মতন উন্নয়নশীল দেশেরও এক-চতুর্থাংশ। এর মূল কারণ আজও দেশের শতকরা 40 ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি আর দারিদ্র্যের জন্য বহু গরীব পরিবার বিদ্যুৎ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেন না। তবু ভারতের বিশাল জনসংখ্যার জন্যই ভারতের স্থান পৃথিবীতে চতুর্থ এবং মোট বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে গড়ে বছরে শতকরা 7 ভাগ হারে। বিগত অর্থাৎ 2008-09 অর্থবর্ষের শেষে সারা দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 135,473 মেগাওয়াট আর সর্বমোট উৎপাদন 704,469 মেগাওয়াট আওয়ার (বা মিলিয়ন ইউনিট)। বর্তমান বিদ্যুতের চাহিদা কিন্তু এর থেকে শতকরা 12 থেকে 15 ভাগ বেশি, অর্থাৎ চাহিদার সবটা মেটানো যাচ্ছে না। এই মোট উৎপাদনের শতকরা 79 ভাগ আসে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে, শতকরা 18 ভাগ জলবিদ্যুৎ থেকে, শতকরা 2 ভাগ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে আর শতকরা 1 ভাগ পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যেও ভারতে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ অত্যন্ত কম—পৃথিবীর মোট প্রমাণিত সম্পদের শতকরা 0.5 ও 0.6 ভাগ; তুলনায় কয়লা সম্পদ ভারতে যথেষ্ট, বর্তমানে কয়লা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থানে আছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে ভারত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে কয়লার উপর বেশি নির্ভরশীল আর এই নির্ভরশীলতা আগামীদিনে আরো বাড়বে। আমাদের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে শতকরা 70 ভাগ কয়লা ব্যবহৃত হয়, তেল আমদানির খরচের কথা ভাবলে আগামী পঁচিশ বছরে তা শতকরা 80 ভাগে দাঁড়াতে পারে। ইতিমধ্যেই ভারতকে মোট কয়লার চাহিদার শতকরা 4 ভাগ আর পেট্রোলিয়ামের চাহিদার শতকরা 25 ভাগ আমদানি করতে হচ্ছে। যোজনা পরিষদ নিযুক্ত Integrated Energy Policy

Report (IEPR), 2006 অনুসারে 2030 সত্রালে তা দাঁড়াবে কয়লার জন্য শতকরা 25 ভাগ, পেট্রোলিয়ামের জন্য শতকরা 90 ভাগ আর প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য শতকরা 25 ভাগ। পেট্রোপণ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যের বাজারে এই আমদানির আর্থিক চাপ সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় বিদ্যুতের বন্টন ব্যবস্থাকে জোরদার করে সমস্ত গ্রামে সমস্ত মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া আর অন্যদিকে শতকরা 8-9 ভাগ হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বজায় রাখতে শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার জোগান দেবার জন্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির এক বিশাল পরিকল্পনা করেছেন যোজনা পরিষদ। একাদশ যোজনায় (2007 থেকে 2012 সাল) উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে 78,577 মেগাওয়াট (অর্থাৎ বর্তমান মোট উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা 60 ভাগ)—তবে এর আগে নবম ও দশম যোজনায় লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকও রূপায়ণ করা যায়নি। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নজর দিতে হবে পরিবহন ও বন্টন ব্যবস্থায় শক্তির অপচয় কমানোর উপর—বর্তমানে এই অপচয়ের পরিমাণ বিভিন্ন রাজ্যে শতকরা 30 থেকে 50 ভাগ। সেই সঙ্গে জলবিদ্যুৎ এবং অন্যান্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া—জলবিদ্যুৎ সম্পদ, সৌরশক্তি সম্পদ, বায়ুশক্তি সম্পদ ও বায়োমাস বা উদ্ভিজ্জ-নিঃসৃত শক্তি সম্পদে ভারত রীতিমতন সমৃদ্ধ। সেইসঙ্গে এই প্রথম বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে, Energy Efficiency Act, 2001 অনুসারে এ ব্যাপারে 'নোডাল' সংস্থা Bureau of Energy Efficiency (BEE)। BEE'র হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন বড় শিল্পে শক্তির ব্যবহারে কার্যকারিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণ এইরকম : চিনি উৎপাদন (শতকরা 25-30 ভাগ); বস্ত্রশিল্প, কাগজশিল্প (শতকরা 20-25 ভাগ); ফাউন্ড্রি, কাচ ও সেরামিক্স শিল্প (শতকরা 15-20 ভাগ); পেট্রোকেমিক্যাল, রসায়ন, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট ও সার শিল্প (শতকরা 10-15 ভাগ); এবং তৈল শোধনাগার, অ্যালুমিনিয়াম ও ফেরো-অ্যালয় শিল্প (শতকরা 8-10 ভাগ)। শুধু শিল্পক্ষেত্রে নয়, গার্হস্থ্য বিদ্যুতের ব্যবহারেও ক্ষতি কমানোর বিপুল সুযোগ আছে—BEE'র মতে energy efficient devices ব্যবহার করে পাঁচ বছরে 75 টেরাওয়াট আওয়ার (অর্থাৎ 75 মিলিয়ন মেগাওয়াট আওয়ার) বাঁচানো সম্ভব—এর শতকরা 32 ভাগ আসবে বাল্ব থেকে, 15 ভাগ টিউবলাইট থেকে, 11 ভাগ রেফ্রিজারেটর থেকে, 10 ভাগ পাখা থেকে, 9 ভাগ টেলিভিশন থেকে, 7 ভাগ এয়ারকন্ডিশনিং থেকে, 6 ভাগ গিজার থেকে ও বাকিটা অন্যান্য থেকে। BEE ইতিমধ্যেই পাঁচটি রাজ্যের জন্য যৌথ পরিকল্পনা রচনা করছেন।

লেখক তাঁর শক্তিশাস্ত্র বইতে শক্তির প্রতিটি উৎস নিয়ে আলোচনা করেছেন, আলোচনা করেছেন বিভিন্ন ধরণের শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ভারতের অবস্থান আলোচনা করেছেন। পুনর্নবীকরণযোগ্য (অথবা) অচিরাচরিত শক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সেই পটভূমিতে শক্তি নিরাপত্তার বিষয়টি উপস্থাপনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে এই মুখবন্ধের বক্তব্যের হুবহু মিল নাই থাকতে পারে, সাধারণ অর্থে সাযুজ্য নিশ্চয়ই আছে।

প্রসঙ্গত লেখক পরমাণু শক্তি (বা নিউক্লীয় শক্তি) নিয়েও আলোচনা করেছেন। বহু মানুষের ধারণা যে শক্তি-সমস্যার একটা বৈপ্লবিক সমাধান আসতে পারে নিউক্লীয় শক্তির হাত ধরে। লেখক অবশ্যই তাতে অন্ধ-বিশ্বাসী নন—নিউক্লীয় শক্তির সমস্যার দিক সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। নিউক্লীয় শক্তির একটু আভাসমাত্র পেয়ে পিয়ের ক্যুরি ১৯০৩ সালে বলেছিলেন :

"I ask, what if such dangerous force falls into the hands of warring men, what if it is used by criminals who lead the peoples towards war? How shall we justify what we do?"

আবার ১৯২১ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ওয়াল্টার নের্নস্ট বলেন :

"We may say that we are living on an island of guncotton ... But, thank God, we have not yet found a match that will ignite it."

কার্যক্ষেত্রে তাঁদের জীবদ্দশাতেই নিউক্লীয় শক্তির ক্ষমতা দেখা গেল—কেবল পারমাণবিক বোমার

ধ্বংসের তাণ্ডবেই নয়, পরমাণু চুল্লির শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও।

1953 সালের 8 ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁর বিখ্যাত Atoms for peace বক্তৃতাটি দেন। তিনি বলেন :

"It is with the book of history, and not with isolated pages, that the United States will ever wish to be identified. My country wants to be constructive, not destructive. It wants agreement, not wars, among nations. It wants itself to live in freedom, and in the confidence that the people of every other nation enjoy equally the right of choosing their own way of life ....

To the making of these fateful decisions, the United States pledges before you – and therefore before the world – its determination to help solve the fearful atomic dilemma – to devote its entire heart and mind to find the way by which the miraculous inventiveness of man shall not be dedicated to his death, but consecrated to his life."

পরমাণু-বিদ্যুতের কাছে প্রত্যাশা ছিল আকাশ-ছোঁয়া। মার্কিন Atomic Energy Commission-এর মতে পরমাণু বিদ্যুৎ হবে "too cheap to meter"।

পরমাণু বিজ্ঞানী গ্লেন সীবর্গ 1971 সালে বলেছিলেন পরমাণু শক্তি আনবে "unimagined benefits that will directly improve the quality of life for the greater part of the... people who will inhabit the earth." আর এক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হান্স বেথে 1977 সালে বলেছিলেন : "The vigorous development of nuclear power is not a matter of choice but of necessity."।

কার্যত কিন্তু তা হল না—উইণ্ডস্কেল, থ্রী মাইল আইল্যান্ড, চেরনোবিল, ফুকুজিমা'র দুর্ঘটনার ছায়া ছাড়াও অর্থনৈতিক কারণেও নিউক্লীয় সমাধান সহজলভ্য রইল না।

আশির দশককে বলা হয় "a decade of withered expectations and shrunken forecasts". The Future of Nuclear Power নামে MIT-র এক রিপোর্টে (2003) বলা হয়েছে :

"In deregulated markets, nuclear power is not now cost competitive with coal and natural gas. However, plausible reductions by industry in capital cost. operation and maintenance costs, and construction time could reduce the gap. Carbon emission credits, if enacted by government, can give nuclear power a cost advantage."

আমেরিকার নিউক্লিয়ার শিল্পের প্রবক্তা ডেভিড লিলিয়েস্থাল বলেছেন :

"The atom had us bewitched. It was so gigantic, so terrible, so beyond the power of imagination ... So greatly did it transcend the ordinary affairs of men that we shut it out of those affairs altogether; or rather tried to create a separate world, the world of the atom."

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্যার জর্জ পোর্টার বলেছেন :

"When that first baby reactor was born in Chicago in 1942, scientists saw it growing into a benefactor of mankind. It was also good for science, and billions of dollars have flowed into research of all kinds because of this hope. Today, I don't think I am using emotional terms when I say the baby has grown into a monster. The world is as near to anarchy as it has ever been, and yet we are about to put nuclear reactors all over the earth – in Northern Ireland and Southern Ireland, In India and Pakistan,

in Israel and Egypt, in Turkey and Cyprus, in Vietnam and in Chile. We haven't the remotest idea how to destroy the radioactive wastes, but soon everybody will know how to use them for war, sabotage, or blackmail. If we are making a mistake, then it is – unlike other mistakes we must make from time to time – irrevocable and irreversible because the radioactive products will be with our children and theirs for more generations than have passed since the beginning of civilization. What chance is there of man surviving in a plutonium economy, even as long as one half-life of plutonium, 24,000 years? Yet the momentum, the investment in nuclear power, is now so great that it seems already too late to stop the proliferation."

ভারতের নিউক্লীয় বিদ্যুৎ শিল্প নিয়ে লেখক এক বাস্তব চিত্রই এঁকেছেন। এর নানা সমস্যার কথা নিয়ে সাম্প্রতিককালে অনেক কিছু লেখা হয়েছে।

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত TV Channel lTV 1992 সালে Nuclear India : A Dream Gone Sour তথ্যচিত্রে বলেছে :

"The nuclear industry in India, one of the largest in the developing world, is shrouded in such secrecy that glaring inefficiency and safety lapses are unchecked, according to a documentary to be shown on British television tonight.

The lack of public information or safety precautions has led to high levels of birth defects and radiation-related ailments among people working in and living near the country's nuclear plants, the programme says.

At a mine and processing complex in Bihar state, workers sit on raw uranium and radioactive dust blows about from a dried-up waste pond. In Kerala state, thorium is mined from the beaches for nuclear fuel, but local people are unaware of the dangers of radiation. Despite the prevalence of congenital deformities among children, a local health worker says that the government does not even recognise the existence of abnormalities."

অবশ্য জ্বালানি এবং কারিগরিতে অনেকাংশে আমদানি-নির্ভর ভারতে নিউক্লীয় শক্তি কি শক্তি-নিরাপত্তা যোগাতে পারবে? বিশেষ করে যেখানে ভারতের মতন দরিদ্র দেশে দরিদ্রতম মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছানোই সবচেয়ে বড় সমস্যা আর World Energy Council-এর মতে বিশ্বের দরিদ্রতম ২০০ কোটি মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নিউক্লীয় শক্তি "not a realistic source of energy"। শক্তির জোগানের মাত্র শতকরা ১০/১৫ ভাগই যদি নিউক্লীয় শক্তি থেকে আসতে পারে, তবে শক্তি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তার উপর অধিক নির্ভরশীলতা অর্থহীন।

তা হলে সমাধান কোন পথে? চিরাচরিত পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনের পাশাপাশি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যাপক ব্যবহার, শক্তির অপচয় রোধ ও শক্তি ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং Demand Side Management বা প্রযুক্তির সাহায্যে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অহেতুক শক্তির চাহিদা কমানো—এই একমাত্র রাস্তা, যদিও এ পথে চলা সহজ নয়। World Energy Council সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন যে সময় বেশি নেই এবং সরকার, উৎপাদন পরিবহন ও বন্টন ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের উপভোক্তাদের সকলকে নিয়েই এ পথে চলতে হবে। তাঁদের মতে :

"It is important to note that the timing and extent of action by governments or companies will vary from country to country depending on the maturity and stability of their economies. We have tried to think globally about sustainable

energy development in a way which fosters local action.

The energy industry is obviously the key provider of Wider accessibility to commercial energy services, of the availability of uninterrupted supply, and of more socially and environmentally acceptable energy products. The speed, scale and nature of these developments depends in part on enabling frameworks, the wishes and support of other social actors, and the deployment of the required technologies and financing.

Lack of awareness, education and commitment relating to clear energy policy goals, as well as the basic requirements for achieving them, are among the largest barriers to success. These barriers affect Policy-makers ,public authorities, industry and the general public. They increase the reluctance to support innovative policies geared to promoting more sustainable energy development. They discourage consumers from changing attitudes and habits. They inhibit shareholders and other investors from supporting change.

The WEC scenarios now go out to 2050 and beyond. None of us can ignore the long-term perspective within which modern energy services will develop. To the extent that our views and recommendations contribute to the sustainable production and use of energy for the greatest benefit of all, what we accomplish between now and 2020 will hopefully be decisive for a "sustainable world" for many decades thereafter. The World Energy Council is, therefore, determined to focus its efforts on the Energy Goals and to help implement all of the Policy Actions contained in this Statement."

পরিশেষে আবার বলি, সাম্প্রতিককালে শক্তি সমস্যা নিয়ে বাংলায় বেশ কটি বই লেখা হলেও, সবদিক থেকে শক্তি সমস্যা ও তার নিরসনের উপায় নিয়ে এমন বই আগে আমার চোখে পড়ে নি। বইয়ের ভাষা ঝরঝরে এবং অহেতুক বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে জর্জরিত নয় (প্রয়োজনে ইংরেজি শব্দ বাংলা হরফেও লেখা হয়েছে)। সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কাছে শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের সব দিকটা ফুটিয়ে তুলতে এ বইয়ের তুলনা নেই। প্রসঙ্গত বলি, লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় ৩৫ বছরের, তিনি আমার অনুজ-প্রতিম এবং দীর্ঘকাল সরকারি চাকরিতে আমার সহকর্মী। তবে সরকারি কাজের বাইরেও 'শক্তিশাস্ত্র' নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছেন Tata Energy Research Institute-এ—এ বইয়ের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এই কাজের জন্য তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ। ■

কলকাতা,
২৫ ডিসেম্বর, ২০১২

আগের কথা

বাণিজ্যিকভাবে শক্তির উৎপাদন এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে বিংশ শতাব্দীতে। এই সাফল্যের মূলে ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হওয়া দুটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং অন্তর্দহন ইঞ্জিন। বিদ্যুতের বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং সরবরাহ যে সম্ভব তা সেই ১৮৮২ সালেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন এডিসন। শুধু তাই নয়, বৈদ্যুতিক বাতি বা বাল্‌ব তৈরির কৃতিত্বও তাঁরই। এর কয়েক বছরের মধ্যেই এই আলোর বহুল ব্যবহার শুরু হয়। চর্বি, উদ্ভিজ তেল, কেরোসিন অথবা কয়লার গ্যাস কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাসে জ্বলা বাতির বদলে বিজলি বাতিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অলটারনেটিং কারেন্ট বা প্রতিবর্তী প্রবাহের আবিষ্কার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করে।

১৮৭০-এর দশকে পেট্রোল ইঞ্জিন এবং ১৮৯৩ সালে রুডলফ ডিজেলের হাতে আরও উন্নত অন্তর্দহন ইঞ্জিনের জন্ম। সেকালে কল-করখানা, জাহাজ অথবা রেল যোগাযোগে ব্যবহৃত বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের থেকে অনেক বেশি কার্যকর এই ইঞ্জিন। তখন পর্যন্ত তেল শোধনাগারের উৎপাদন সীমিত ছিল কেরোসিনেই। তারপরই গুরুত্বের নিরিখে শীর্ষে উঠে আসে দুটি ভিন্নধারার জ্বালানি—পেট্রোল এবং ডিজেল। সদ্য আবিষ্কৃত ইঞ্জিনের উন্নত কর্মদক্ষতা এবং সেইসঙ্গে সুলভ জ্বালানির যোগান—এই দুইয়ের সংযোজনের ফলে মোটরগাড়ি প্রথম বার বহু সংখ্যক মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে। ১৯১৫ সালের মধ্যে গাড়ির সংখ্যা ১০ লক্ষে পৌঁছে যায়। জাহাজ এবং রেলগাড়ির জ্বালানি হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ডিজেল। পরবর্তী পর্যায়ে বিমানও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং শোধনাগারগুলিও পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহের কাজ শুরু করে।

শক্তির উৎস হিসেবে বিদ্যুতের উপযোগিতা বহুমুখী। বিদ্যুতের সাহায্যে কারখানার অত্যাধুনিক যন্ত্র যেমন চলে, তেমনই চলে গৃহস্থালির নানা সরঞ্জামও। শুধু তাই নয়, বিবিধ উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সর্বপ্রথম উৎস ছিল কয়লা। এরপর, জলের প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে উৎপন্ন হয় জলবিদ্যুৎ। পরবর্তী পর্যায়ে, ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে পরমাণু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ শুরু হয় সাড়ম্বরে। অশোধিত তেল থেকে সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলেও তা বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। নয়ের দশকের সময় থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সবথেকে পছন্দের জ্বালানি হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক গ্যাস। এর কারণ হল—প্রথমত জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং দ্বিতীয়ত ‘কম্বাইনড সাইকেল’

পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মদক্ষতা অনেক বেশি। আটের দশকে আত্মপ্রকাশ করে সবথেকে সফল দুটি নবীকরণীয় শক্তির উৎস—সৌর এবং বায়ু। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত এদের বৃদ্ধির গতি যথেষ্ট দ্রুত। বর্তমানে, গোটা বিশ্বে উৎপন্ন শক্তির একটা বড় অংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয়, যে কোনও দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তার মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাত্রাকেও ধরা হয়। তেলকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হলেও তা বিদ্যুতের মতো সর্বত্রগামী হয়নি; তার সর্বাধিক ব্যবহার হয়েছে পরিবহন ক্ষেত্রে।

শক্তির সরবরাহ ব্যবস্থার এই সম্প্রসারণের মূল কৃতিত্ব শক্তি উৎপাদনকারী শিল্পেরই প্রাপ্য। এরা গোটা বিশ্ব জুড়ে যেমন জ্বালানির সন্ধান চালিয়েছে, তেমনই ক্রমাগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে শক্তির দাম কম থাকে। যথোপযুক্ত নীতি নির্ধারণ এবং শিল্পক্ষেত্রের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার কৃতিত্ব বিভিন্ন দেশের সরকারের। তবে, এই পথের সবটাই কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ব্যর্থতার কাঁটাও রয়েছে। শক্তি উৎপাদন, সরবরাহ বা ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে। কয়লা, তেল বা গ্যাসের মতো জীবাশ্ম-জ্বালানির দহনই কারবন ডাই অক্সাইড নির্গমণের প্রধান কারণ। ২০৫০ সালের মধ্যে আমাদের শক্তির খরচ দ্বিগুণ হয়ে যাবে আর পরিবেশের ভয়াবহ দূষণের থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে নির্গমণের মাত্রাকে অর্ধেক করে ফেলতে হবে। এইরকম আমূল পরিবর্তন কার্যকর করার উপযোগী নীতি কি আমরা তৈরি করতে পারব?

গোটা বিশ্ব জুড়ে প্রায় ২০০ কোটি দরিদ্র মানুষের জন্য আমরা স্বচ্ছ শক্তির ব্যবস্থা করতে পারিনি, যা আমাদের ব্যর্থতার তালিকায় আরও একটি বিষয়। এটি আবার সরকারি নীতির ক্ষেত্রেও একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এই দুটি বিষয় যুক্ত হয়েই গড়ে উঠেছে শক্তিক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন অথবা শক্তির সবুজায়ন সংক্রান্ত আন্দোলনের রূপরেখা। রাষ্ট্রপুঞ্জ এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে প্রয়াসী হলেও সেই প্রয়াস বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। তবে আশার কথা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি এ ব্যাপারে চাপ বজায় রেখেছে। বৃহত্তর জনচেতনা গড়ে তোলা এবং নীতি নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তারা সাফল্য পেতে চাইলেও এই সাফল্যের অংশও খুবই সীমিত।

সম্প্রতিকালে ভারতে শক্তি নীতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা এবং বিতর্কের মাত্রা বেড়েছে অন্য একটি পথ ধরে। ২০০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরমাণু সহযোগিতার চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করে ভারত। এ ব্যাপারে সংসদে তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে, শক্তি নিরাপত্তার স্বার্থে এই চুক্তির যৌক্তিকতার কথা বলে সরকার। এই কথা বলতে গিয়ে সরকারকে অন্তত দুটো ঝুঁকি নিতে হয়। প্রথমত,

পরমাণু শক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কখনই আমাদের মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের তিন শতাংশের বেশি দখল করতে পারেনি। একে উল্লেখযোগ্য স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে, একথা জনসাধারণকে বিশ্বাস করানো সহজ ছিল না। দ্বিতীয়ত, এর থেকে বোঝা যায় যে ভারতের বহু বন্দিত ত্রিপর্যায় পরমাণু শক্তি কর্মসূচির উপর সরকার আস্থা হারিয়েছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, সরকারের যুক্তিই মানুষ মেনে নিয়েছে। শক্তি নিরাপত্তার বিষয়টি যথেষ্ট স্পর্শকাতর। ভারতীয় জনসাধারণ অর্থনীতির বৃদ্ধির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন, আর তাই, শক্তির অভাবে এই বৃদ্ধির মাত্রা কমাতে তারা একেবারেই রাজি নয়। এই মনোভাবকে কাজ লাগিয়ে সরকারও তড়িঘড়ি ফ্রান্স থেকে পরমাণু চুল্লি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং পরমাণু শক্তি বিরোধী আন্দোলনকেও কঠোর হাতে দমন করে। সাতের দশকে ব্রিটেনে পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের নামে অভিযোগ ছিল—(১) তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয়; (২) তাদের আন্দোলন মূলত আবেগধর্মী; (৩) আন্দোলনের পিছনে পেশাদার মদতদাতাদের হাত আছে; (৪) আন্দোলনকারীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের চর। ভারতেও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুর একইরকম ছিল। কেবল স্থান, কাল অথবা প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সামান্য কিছু রদবদল করা হয়। এই সব যুক্তি জইতাপুরে যেমন শোনা গেছে, তেমনই শোনা গেছে কুডমকুলমেও।

But there are no full stops in India. ভারতে কোনো বিষয়ে অত সহজে ইতি টানা যায়না। সচেতন এবং তথ্যনিষ্ঠ জনমত যে কোনও সময়েই পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে।

শক্তি নিরাপত্তা নিয়ে এত বেশি দুশ্চিন্তার কি সত্যিই কোনও যুক্তি আছে? পরমাণু শক্তিই কি ভবিষ্যতে ভারতের একমাত্র পথ? কয়লার মতো আমাদের অন্যান্য উৎসগুলি কতটা নির্ভরযোগ্য? সব তথ্য কি যথাযথভাবে জনসমক্ষে আসছে, যাতে সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে? ইন্টারনেটে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেলেও তা খাপছাড়া এবং অগোছালো। এইসব বিষয়কে একত্র করে সহজবোধ্য ভাষায় তা নিয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরি। এই বইয়ের মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে। তবে কোনওরকম মতাদর্শ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। বিষয়গুলি পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে সে সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহী করার লক্ষ্যেই এই রচনা, যাতে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা তাঁদের পছন্দমতো বিষয়ে বিস্তারিতভাবে চর্চা করতে পারেন।

পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে কোনওরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে অন্যান্য বিকল্প উৎসগুলিকে সবিস্তারে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এই বইতে শক্তির বিভিন্ন উৎস এবং জ্বালানি নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে। প্রতিটি জ্বালানিকে তার দীর্ঘমেয়াদি সহজলভ্যতা,

দামের স্থিতিশীলতা, ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ের ক্ষমতা এবং উৎপাদন থেকে ব্যবহার পর্যন্ত পরিবেশের উপর প্রভাব—এই সমস্ত বিষয়ের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। বিভিন্ন জ্বালানির মধ্যে এক বা একাধিককে বেছে নেওয়া শক্তি নীতির একটি বিশেষ কাজ। যেমন, গ্যাস অথবা পরমাণু শক্তি—দুটি থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু আমরা কোনটি বেছে নেব? দাম এবং সহজলভ্যতার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ সবসময় সহজ নয়, কারণ প্রযুক্তিগত উন্নতি সবসময়েই সহজলভ্যতা এবং দাম দুটিকেই বদলে দিচ্ছে। দুরকমের জ্বালানিকে যদি বিশ্বের ভিন্ন প্রান্ত থেকে আমদানি করতে হয়, তাহলে এই তুলনা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

যে কোনও দেশ তার জ্বালানিভাণ্ডার বেছে নেয় তার নিজস্ব নীতি অনুযায়ী। কোনও জ্বালানির যোগান কম হলে, স্বল্পমেয়াদি সমাধান হিসাবে তা আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় দেশজ উৎস অনুসন্ধান করার কথা ভাবা যেতে পারে। ভারত তার তেল এবং গ্যাসের মজুতভাণ্ডারের অনুসন্ধান এবং উন্নয়নের কাজে বেসরকারি ক্ষেত্রকে যুক্ত করেছে ১৯৯০ এর দশকে। এর ফলে আমাদের মজুত যথেষ্ট সমৃদ্ধও হয়েছে। স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রকের নিয়োগ বিদ্যুৎ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্পক্ষেত্রকে আমূল বদলে দিয়েছে। জ্বালানির নতুন উৎস বা মজুতভাণ্ডার খোঁজা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একইভাবে, শক্তির দাম নির্ধারণও অত্যন্ত জরুরি একটি দিক। উদাহরণ হিসাবে ডিজেলের দামের কথা বলা যায়, যা আমাদের দেশের রাজনীতির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

শক্তি নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিচিত্র বিষয়সমূহ। এগুলির কেন্দ্র হল তেলের আমদানিজনিত সমস্যা। সাতের দশকে ওপেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নেদারল্যান্ডকে তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়, তখনই এই সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার সূচনা হয়। সেই প্রথম, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে তেলকে ব্যবহার করে এবং তেলের সব ক্রেতাদেরই সতর্ক করে দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে তেলের মূল্যবৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাজারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ওপেক রাষ্ট্রের বাইরে তেলের অনুসন্ধানের কাজ ত্বরান্বিত হতে শুরু করে। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প এবং নবীকরনীয় শক্তির উন্নয়ন অগ্রাধিকারের তালিকায় উঠে আসে। তেলের সরবরাহ ব্যবস্থা অকস্মাৎ বিঘ্নিত হলে তার মোকাবিলায় বিভিন্ন পথের সন্ধানও করা হয়। এ সব কথাই আসবে শক্তি নীতির উপর আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায়।

শক্তি সংক্রান্ত যে কোনও বইতেই নানারকম তালিকার বাহুল্য থাকে, যা সাধারণ পাঠকের উৎসাহের পরিপন্থী। টীকা বা তথ্যপঞ্জীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই এই বইটির ক্ষেত্রে তা সচেতনভাবেই পরিহার করা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে

লেখক তাঁর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে উৎসাহী নন। এই বইতে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য এবং ধারণা ভারত সরকার, IEA, TERI, IPFM এর প্রকাশনা এবং অবশ্যই উইকিপিডিয়া থেকে গৃহীত। শক্তিক্ষেত্রের এই অন্বেষণের কাজে সহযোগিতা করেছেন বেশ কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। সকলের প্রতিই লেখক একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে কৃতজ্ঞ শ্রীমতী বিন্দিয়া থাপরের কাছে।

লেখক যখন দিল্লিতে পেট্রোলিয়ম মন্ত্রকে কর্মরত, তখন ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য। দেখা হলেই উৎসাহ দিয়েছেন বই লিখতে—বলতেন যে তাঁর প্রথম বইও পেট্রোলিয়ম নিয়ে লেখা। এই বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করলাম।

একটিমাত্র গ্রন্থে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আশা করি, চিত্তাকর্ষক কয়েকটি বিষয়ের উপর সামান্য আলোকপাত করা গেছে। পাঠকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। শক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়নপর্ব শুভ হোক। ■

অর্ধেন্দু সেন

২০ নভেম্বর, ২০১২

প্রথম ভাগ জীবাশ্ম জ্বালানি

- ❖ কয়লা
- ❖ পেট্রোলিয়ম
- ❖ প্রাকৃতিক গ্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায় **কয়লা**

২.১। কয়লা কি? ●

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পেট্রোলিয়মের ব্যাপক ব্যবহার পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে কয়লাই ছিল প্রধান জ্বালানি। বিশ্বের জলপথ জুড়ে জাহাজ অথবা স্থলপথে রেলগাড়ি—সবই চলত কয়লার শক্তিতে। ধাতুশিল্প, বিশেষ করে ইস্পাত তৈরিতে কয়লা ছিল অপরিহার্য। গরম কয়লার উপর বাষ্প চালিয়ে তৈরি হত গ্যাস। কাঠের (পরে ইস্পাতের) পাইপলাইন দিয়ে সেই গ্যাস ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার বাড়িতে পাঠানো হত রান্না এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে। ১৮৮২ সালে টমাস অ্যালভা এডিসন নিউইয়র্কে এক পরীক্ষার মাধ্যমে দেখালেন কয়লা পুড়িয়ে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের সম্ভাবনা। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার হত বয়লারের বাষ্পে চলা ইঞ্জিন। বয়লার চলত কয়লায়—প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে লাগত ১০ পাউন্ড বা চার কিলো কয়লা। কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ উৎপন্ন হত তখন তার মাত্র ১০ শতাংশ বিদ্যুতে পরিণত হত। এখন হয় ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ।

সাধারণভাবে কঠিন বা ঘন বস্তু জ্বালানি হিসেবে খুব কার্যকর নয়। বাইরের স্তরের পরমাণু ভালভাবে জ্বললেও ভিতরের স্তরের পরমাণু সবসময় সঠিকভাবে অক্সিজেনের সংস্পর্শে নাও আসতে পারে। কঠিন বস্তুর বহু অণু ও পরমাণু অসম্পূর্ণভাবে অথবা একেবারেই না জ্বলতে পারে। তাহলে উপায়? দুটি উপায় আছে। প্রথমত, কঠিন বস্তুকে ছোট ছোট টুকরোয় কেটে ফেলা — যেমন কাঠের টুকরো। দ্বিতীয়, কঠিন বস্তুকে গুঁড়ো করে ফেলা। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা এইভাবেই ব্যবহার হয়। তবে এ দুটিই যথেষ্ট শ্রমসাধ্য এবং সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। জ্বালানি হিসেবে গ্যাস অনেক উন্নত—কারণ, এর অণু-পরমাণুগুলি অনেক বেশি ছড়ানো এবং প্রতিটিই বিনা বাধায় জ্বলতে পারে। গ্যাসের আবার অন্য সমস্যা। গ্যাস অনেক জায়গা জুড়ে থাকে এবং চাপ দিয়ে সংহত না করলে মজুত করা যায় না। এও আবার, অত্যন্ত শ্রম এবং জ্বালানিসাপেক্ষ। সব চেয়ে কাজের ও সুবিধার জ্বালানি হল উদ্বায়ী তরল— যা তরলের মতো পরিবহন ও মজুত করা যায় এবং গ্যাসের মতো জ্বলে। এই তালিকায় পড়ে এল পি জি, ডিজেল এবং

পেট্রোল। বেশি পরিমাণে পাওয়া গেলে তা সহজেই কয়লার পরিবর্ত জ্বালানি হতে পারে।

তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে অনেক বেশি হাইড্রোজেন আছে বলে এগুলি কয়লার থেকে ভাল জ্বালানি। কয়লার বেশিরভাগই কার্বন, তার সঙ্গে আছে সামান্য হাইড্রোজেন। সম্পূর্ণ পুড়ে গেলে এক গ্রাম কার্বন যেখানে ৩৩ কিলোজুল তাপ উৎপন্ন করে সেখানে এক গ্রাম হাইড্রোজেন দেয় ১২০ কিলোজুল তাপ। হাইড্রোজেন ও কার্বনের যৌগ অর্থাৎ হাইড্রোকার্বনের তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা এই দুইয়ের মাঝামাঝি— যেমন মিথেনের ৫০ কিলোজুল প্রতি গ্রাম, প্রতি গ্রাম অকটেনের ৪৪ কিলোজুল ইত্যাদি। আরও অনেক মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থ আছে যা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু হয় তারা সহজলভ্য নয় অথবা তাদের ব্যবহার অন্যত্র বা বিশেষ ক্ষেত্রে।

রেলের ইঞ্জিনে কয়লার বদলে প্রথমে ব্যবহার হয় ডিজেল, তারপর বিদ্যুৎ। কয়লার গুরুত্ব তখন আবার কিছুটা বাড়ে, কারণ এই কয়লা থেকেই উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ। তবে, গত ৫০ বছরে অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাসও ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯০০ সালে বিশ্বের শক্তিক্ষেত্রে কয়লার অবদান ছিল ৭৫ শতাংশ। ২০০০ সালে তা কমে আসে ২৬ শতাংশে—ভারতে অবশ্য ৫৫ শতাংশ। ক্রমাগত পতনের পরেও কয়লা তার হৃতগৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করে যখন বিশ্বে কয়লার উৎপাদন ৪০ শতাংশ বাড়ে। ২০০০ সালের ৪৬০ কোটি টন উৎপাদন ২০০৪ সালে বেড়ে হয় ৬৪০ কোটি টন। মনে হচ্ছিল, পরিবেশবিদরা কয়লার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করার আগেই সব দেশ তাদের জমা কয়লা খরচ করে ফেলতে চাইছে! প্রকৃতপক্ষে, তেলের (সঙ্গে গ্যাসের) দামের অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলেই কয়লার চাহিদা বাড়তে থাকে। তেলের এই দামবৃদ্ধি কিছুটা কমলে কয়লার চাহিদাও কমবে। তবে, পেট্রোল বা গ্যাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতার থেকেও কয়লার ক্ষেত্রে আশঙ্কার হল গ্রিনহাউজ গ্যাসজনিত সমস্যা। এখনও জ্বালানি হিসেবে কয়লার ভান্ডারই সব থেকে সমৃদ্ধ। কয়লার প্রমাণিত মজুত ৮৪ হাজার ৭০০ কোটি টন— উত্তাপ বা শক্তির নিরিখে পেট্রোলিয়মের প্রমাণিত মজুতের তিনগুণ। বিস্তৃতির হিসাবেও কয়লার স্থান সবার উপরে। তাই, কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হওয়ার সমস্যার যথাযথ সমাধান বার করতে পারলে একুশ শতকেও কয়লা তার গুরুত্ব বজায় রাখতে পারবে।

লক্ষ লক্ষ বছরের পুরানো উদ্ভিদের অবশেষ থেকে তৈরি হয়েছে কয়লা। জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ায় এগুলিতে পচন ধরে নি। ভূমিকম্পের ফলে মাটির তলায় অথবা সমুদ্রের অতলে ডুবে যাওয়া বিশাল কোনো বনভূমি থেকে বহু বছর পরে কয়লা উৎপন্ন হয়েছে। কিংবা বিশাল জলাভূমিতে জন্মানো ঘাস এবং জলে ডোবা মৃত গাছ থেকেও

পরে কয়লার উদ্ভব হতে পারে। সম্ভবত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার উপর বালি ও কাদামাটির স্তর জমেছে এবং যুক্ত হয়েছে উচ্চচাপ ও তাপ—বনস্পতি রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়। প্রাচীনতম কয়লা তৈরি হতে প্রায় ৩০ কোটি বছর সময় লেগেছে বলে মনে করা হয়। এগুলি হল ৮০ শতাংশের বেশি কারবনযুক্ত অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা। ৪৫ থেকে ৬৫ শতাংশ কারবনযুক্ত বিটুমিনাস বা সাব বিটুমিনাস কয়লা তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক। আর ২৫ শতাংশ কারবনযুক্ত লিগনাইট বা ব্রাউন কোল আরও নতুন। উদ্ভিদজাত জ্বালানির মধ্যে সবচেয়ে কাঁচা হল পীট (Peat) যা কয়লার তুলনায় বলা যায় জীবন্ত। কয়লার প্রমাণিত মজুত ৮৪ হাজার ৭০০ কোটি টন। তাই, কয়লা নিঃশেষিত হওয়ার আশঙ্কায় কেউই উদ্বিগ্ন নয়।

২.২। কয়লা ব্যবহারের ইতিহাস ●

আগুনের নিয়মিত ও বহুল ব্যবহার শুরু হয় সম্ভবত এক লক্ষ ২৫ হাজার বছর আগে। স্বাভাবিক অনুমান থেকেই বলা যায়, সেই সময় কাঠই ছিল সবচেয়ে সুলভ জ্বালানি। তখন কি কয়লা ব্যবহার হত? অনেক জায়গাতে মাটির উপরেই কয়লা পাওয়া গেছে, তাই সেই সময়ে কয়লার ব্যবহার অবশ্যই সম্ভব ছিল। বস্তুত, ইউরোপে এই ব্যবহারের কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। চীনে কয়লা ব্যবহার করা হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সাল থেকে। ভারতে লোহা গলানো শুরু হয়েছে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, কিন্তু তা গলানো হত কাঠ কয়লার সাহায্যে। ভারতে সেই যুগে, আকরিক কয়লা ব্যবহারের কোনো নিদর্শন নেই। । ১৭৪৪ সালে ভারতে প্রথম কয়লাখনি খননের কাজ শুরু হয় রানিগঞ্জে। পরে ওয়ারেন হেস্টিংস ছোটনাগপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে কয়লাখনি খননের অনুমতি দিলেও সেই প্রয়াস সার্থক হয়নি। সাফল্য আসে ১৮১৪ সালে এবং সেই রানিগঞ্জেই। এইসব প্রয়াসকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন বেন্টিঙ্ক এবং ১৮৪৩ সালে গঠিত হয় বেঙ্গল কোল কোম্পানি। ১৮৮৬ সালে জন্ম হয় হায়দরাবাদের ডেকান কোম্পানির। ভারতের মাটিতে বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন চলতে শুরু করে ১৮৫৩ সালে এবং জন্ম নিতে থাকে শহর ও নগরের ধারণা। ফলে, কয়লার চাহিদাও বাড়তে থাকে দ্রুতগতিতে। ১৯০০ সালে ভারতে কয়লার উৎপাদন ছিল ৬০ লক্ষ টন। স্বাধীনতার সময় এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় তিন কোটি টনে।

বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন ক্রমে অবলুপ্ত হওয়ায় কয়লার ব্যবহার সীমিত হয় মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ করে ইস্পাত ও সিমেন্ট শিল্পে। ইঞ্জিনের বদলে টারবাইনের ব্যবহার অনেকটাই বাড়িয়ে দেয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের দক্ষতা। প্রথম বাষ্পচালিত

টারবাইনের নকশা তৈরি করেছিলেন পারসন্‌স্ এবং এটি বানানো হয় ওয়েস্টিংহাউজ ও অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগে। জেমস ওয়াট বা তাঁরও আগে নিউকোমেন যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন, তাতে বাষ্পের সাহায্যে ঠেলা পিস্টনের ঋজুরেখ গতিকে চাকার বৃত্তাকার গতিতে বদলানো হত। এই ব্যবস্থায় অর্জিত গতিবেগ সীমিত। টারবাইন আরও অনেক দ্রুতগতিতে ঘোরে। বাষ্পের প্রসারণের ফলে তা টারবাইনের গায়ে লাগানো সারি সারি বাঁকানো ব্লেডের গায়ে ধাক্কা দিয়ে টারবাইনটি ঘোরাতে থাকে। টারবাইন যুক্ত থাকে একটি জেনারেটরের সঙ্গে। জেনারেটরের শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে যে কয়েল থাকে সেটি ঘুরতে শুরু করলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন বা জার্মানির মতো শিল্পোন্নত দেশগুলি কয়লার উৎপাদন ও ব্যবহার— দুই ক্ষেত্রেই শীর্ষে। লিগনাইট কয়লার উৎপাদনে এক নম্বর দেশ জার্মানি। আটের দশকের মধ্যেই বৃটেন তাদের অগভীর খনির সব কয়লা ব্যবহার করে ফেলে। তারপর হিসাব কষে দেখা গেল, দেশজ খনির কয়লা তোলার খরচের থেকে আমদানির খরচ কম। তাই ১৯৮৪ সালে মার্গারেট থ্যাচার ২৪টি ব্যয়বহুল কয়লাখনি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর প্রতিবাদে কয়লাখনির শ্রমিকরা ধর্মঘট ডাকলেও জোর করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালে যেখানে কয়লার উৎপাদন ছিল ১২ কোটি ৭০ লক্ষ টন, ২০০৭ সালে তা কমে আসে এক কোটি ৭০ লক্ষ টনে। দেশজ উৎপাদন কমলেও, কয়লার আমদানি কিন্তু এই সময় বেড়েছে। জার্মানিতে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট কয়েকটি খনি জার্মান সরকার ভর্তুকি দিয়ে চালাচ্ছে। বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করে এই খনিগুলি ১০০০ মিটার গভীর স্তর থেকে কয়লা তুলে আনছে।

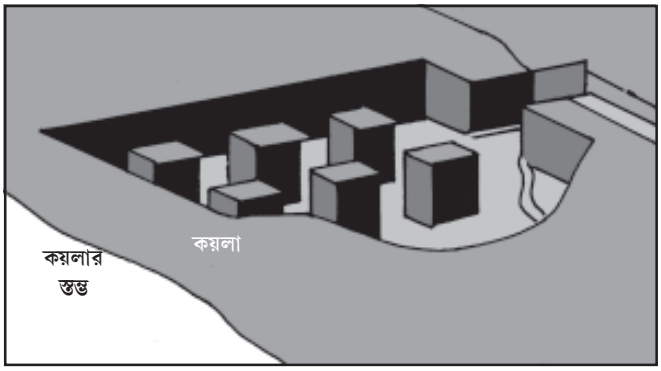

কয়লা কাটা। বোর্ড অ্যান্ড পিলার পদ্ধতির নকশা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়লা উৎপাদনের হার বরাবরই বেশি, তবে সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে এখন চিহ্নিত হয়েছে চীন। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা — এই পাঁচটি দেশই এখন কয়লা উৎপাদনে শীর্ষে। ২০০৭ সালে বিশ্বে উৎপাদিত কয়লার পরিমাণ ছিল ৬৪০ কোটি টন। বিশ্বে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৪০ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

উৎপন্ন বিদ্যুতের ৫০ শতাংশ এবং ভারতে ৬০ শতাংশেরও বেশি তৈরি হয় কয়লা থেকে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে স্টিম-কয়লা বা তাপীয় কয়লা ব্যবহার হলেও ইস্পাত তৈরিতে লাগে কোকিং কোল। কোকিং কোল হল উচ্চমাত্রায় কারবন যুক্ত, অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন কয়লা। কোক তৈরি করার চুল্লিতে ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কয়লা উত্তপ্ত করলে তার থেকে পাওয়া যায় কোক। কোককে প্রায় বিশুদ্ধ কারবন বলা চলে। একে জ্বালানি এবং বিজারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোকের সাহায্যে লৌহ আকরিক গলানো যায় এবং লৌহ অক্সাইডের বিজারণের মাধ্যমে শুদ্ধ লোহা পাওয়া যায় যা 'তপ্ত ধাতু' বা হট মেটাল বলে পরিচিত। এই তপ্ত ধাতুকে এরপর নিকেল, কোবাল্ট বা মলিবডেনাম-এর মতো অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োজনমতো বৈশিষ্ট্যযুক্ত ইস্পাতে পরিণত করা হয়। প্রায় ৭০ শতাংশ ইস্পাতই এইভাবে উৎপন্ন হয়। গত ৩০ বছরে বিশ্বে ইস্পাত উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৭০ সালের ৬০ কোটি টন ২০০৬ সালে বেড়ে হয়েছে ১২০ কোটি টন। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোকিং কয়লার চাহিদাও ৪০ কোটি টন থেকে বেড়ে ৭০ কোটি টন হয়েছে।

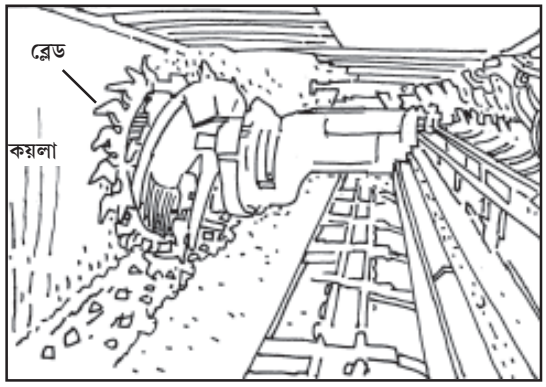

কয়লা কাটা। লং-ওয়াল যন্ত্রের কাজ

২.৩। খনির গভীর থেকে ●

কয়লার ভান্ডার মাটির গভীরে থাকলে খননের কাজ কঠিন হয়। কিন্তু ৩০০ থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত কেবল মাটি সরিয়েই কয়লা তোলা যায়। একে বলা হয় ওপেন কাস্ট মাইনিং। আরও বেশি গভীর খনিতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কয়লা বার করার প্রক্রিয়াকে বলে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং। বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ কয়লাই এইভাবে বার করা হয়। স্যান্ডউইচে যেমন দু'টি পাউরুটির মধ্যে থাকে চিজের টুকরো—তেমনই ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কয়লার পরত জমে থাকে। কয়লার এই স্তর ৫০ সেন্টিমিটার থেকে বেশ কয়েকশো মিটার পুরু হতে পারে। একেক জায়গায় একেক রকম। কয়লার স্তরের উপর জমে থাকা মাটি বিস্ফোরকের সাহায্যে ভেঙে সরিয়ে ফেলা হয় এবং উত্তোলনের

সুবিধার জন্য ফাটানো হয় কয়লার স্তরও। যত বেশি কয়লা তুলতে হবে তত বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। মাটি তোলার জন্য ব্যবহৃত ড্র্যাগলাইন-এর সঙ্গে যুক্ত আধার একসঙ্গে ১৫০ টন মাটি তুলে তাকে ২০০ মিটার দূরে ফেলতে পারে। যেখানে ড্র্যাগলাইন ব্যবহার করা হয় না, সেখানে বিশালাকার ট্রাকের (ডাম্পার) সঙ্গে বড় বড় বেলচা কাজে লাগানো হয়। মাটির আরও গভীরে কয়লা থাকলে, গর্ত খুঁড়ে নামতে হয় কয়লার স্তর পর্যন্ত। প্রয়োজনীয় গভীরতায় পৌঁছে খনি-শ্রমিকরা কয়লার স্তরের মধ্যে আয়তাকার আনুভূমিক সুড়ঙ্গ বা গ্যালারি খুঁড়ে নেয় এবং গ্যালারির কয়লা বার করে আনে। এই গ্যালারি সাধারণত ১০ ফিট উঁচু এবং ছয় ফিট চওড়া হয়, যাতে তার মধ্যে মানুষ ও যন্ত্র দুই-ই প্রবেশ করতে পারে। নির্দিষ্ট দূরত্বে কয়েকটি সমান্তরাল গ্যালারি কাটা হলে আড়াআড়িভাবে আর এক সারি গ্যালারি কাটা হয়। মধ্যবর্তী না-কাটা কয়লা দাঁড়িয়ে থাকে চৌকো চৌকো স্তম্ভের মত। পরে, এক এক করে এই স্তম্ভগুলিকে সরিয়ে সেই জায়গায় বালি ভর্তি করে দেওয়া হয়, যাতে সুড়ঙ্গের ছাত ভেঙে না পড়ে। একে বলা হয় বোর্ড অ্যান্ড পিলার মেথড। ভূগর্ভস্থ কয়লা তোলার পদ্ধতিকে আরও উৎপাদনশীল করতে হলে লংওয়াল যন্ত্রের ব্যবহার করা হয় যা দ্রুত গতিতে কয়লা কাটে। ১০০ থেকে ৩৫০ মিটার লম্বা গ্যালারিতে বসানো হয় লংওয়াল যন্ত্র। এর ব্লেড বা কাটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আসা যাওয়া করে ঠিক তাঁতের মাকুর মত এবং ঘুরতে ঘুরতে কাটতে থাকে সামনের দেওয়ালের কয়লা। নিচে থাকা কনভেয়ার এই কয়লা খনির বাইরে নিয়ে যায়। জল-চাপের সাহায্যে ধরে রাখা হয় মেশিনের উপরের ছাত। ছাত সুরক্ষিত রেখে লংওয়াল কয়লা কাটতে কাটতে সামনের দিকে এগোয়। পিছনের অরক্ষিত ছাত ভেঙে পড়ে একটু একটু করে। বোর্ড অ্যান্ড পিলার পদ্ধতিতে খনির ৬০ শতাংশ কয়লা উপরে তোলা যায়। বাকিটা স্তম্ভের মধ্যেই থেকে যায়। লংওয়ালের সাহায্যে ৭৫ শতাংশ কয়লা তোলা সম্ভব। তবে লংওয়াল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। একটি যন্ত্রের দাম পাঁচ কোটি ডলার বা তার বেশি। এত মূল্যবান যন্ত্র ব্যবহারের আগে খনির ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হয়। লংওয়ালের সাহায্যে গোটা বিশ্বেই কয়লার উৎপাদন বাড়লেও ভারতে এখনও তা সেভাবে ব্যবহার করা হয় নি।

২.৪। কয়লা ও পরিবেশ ●

কয়লা খনন পরিবেশের ক্ষতি করে নানাভাবে। বিশেষ করে তা যদি হয় ওপেন কাস্ট পদ্ধতিতে। খননের জন্য বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাটির উপরিভাগ ভেঙে প্রচুর পরিমাণ মাটি সরিয়ে ফেলা হয়। অর্থাৎ, খনি অঞ্চলের বেশ কয়েক বর্গ কিলোমিটার জুড়ে চলে এই মাটি ভাঙা ও সরানোর কাজ। এত পরিমাণ ধূলো-বালির তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসাবে বলা

যায় দৃশ্য-শব্দ- বায়ু দূষণের কথা। এর প্রভাব কিন্তু শুধু খনি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কয়লার ট্রাক যে পথ দিয়ে যায়, তার দু'পাশে গাছের পাতা থেকে বাড়ির ছাত — কয়লার গুঁড়ো বা ধুলোয় ভরে যায়। খনি থেকে বেরনো কয়লার গুঁড়ো ও বর্জ্য পদার্থ দূষিত করে নদী এবং ভূগর্ভস্থ জল। ভারতের কয়লায় সালফারের ভাগ খুব কম। উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লায় জল পড়লেই তৈরি হতে পারে সালফিউরিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড অন্যান্য খনিজ পদার্থকে দ্রবীভূত করে। এই দ্রবণে জলের উৎস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। অনেকসময়েই কয়লার স্তর জমা থাকে বনভূমির নিচে, আর সেক্ষেত্রে কয়লা তুলতে হলে বনের সমস্ত গাছপালা কেটে ফেলতে হয়। গাছের ক্ষতিপূরণ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে করা যায়, কিন্তু বনভূমির উদ্ভিদ-পশু-পাখি সহ পরিবেশের যে ভারসাম্য তা নষ্ট হয়ে যায় চিরতরে। তাই যে কোনও অঞ্চলে কয়লাখনির জন্য মাটি খোঁড়ার আগে পরিবেশের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই ধরনের গবেষণায় পরিবেশ দূষণের ক্ষতি কমাতে বিভিন্ন রকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। ভারতে এই ধরনের গবেষণায় ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

কয়লাখনির নানা সমস্যার মধ্যে একটি হল মিথেন। সব কয়লাখনিতেই কিছু পরিমাণ মিথেন থাকে। আমরা জানি, মিথেন হল প্রাকৃতিক গ্যাসের সব চেয়ে বড় উপাদান এবং একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি। এককালে এই মিথেন খনি শ্রমিকদের লণ্ঠনের আগুনে দপ করে জ্বলে উঠত এবং বিস্ফোরণ ঘটাতো। সেই সমস্যার সমাধান হয় ডেভিস লাম্পের সাহায্যে। এখন সমস্যা অন্য। কয়লার স্তরে বিস্ফোরণ হলেই এই মিথেন বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়। বিশ্ব উষ্ণায়নে কারবন-ডাই-অক্সাইডের থেকে অনেক বেশি ক্ষতিকর এই মিথেন। সবসময় সম্ভব না হলেও কয়লা তোলার আগে যদি মিথেন আলাদা করে নেওয়া যায় তা হলে তা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। খনি থেকে কয়লা তোলার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই অঞ্চলকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা উচিত। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী এই জায়গা বনসৃজন, পর্যটন বা আবাসনের কাজে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের প্রবল চাপ ছাড়া, বাস্তবে এই সব কাজ সাধারণত হয় না। খনির মালিক জমি সংস্কারের এই খরচকে যথাসম্ভব এড়িয়েই যায়। এখান থেকে আরও খানিকটা কয়লা পাওয়া যেতে পারে — এই অজুহাতে তারা জায়গাটিকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থাতেই রেখে দেয়।

কয়লা খননের থেকেও পরিবেশের আরও অনেক ক্ষতি করে কয়লার দহন। এই সমস্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কয়লা গ্রহণযোগ্য হয়েছে জার্মানির মতো প্রবল পরিবেশ সচেতন 'সবুজ' দেশেও। কয়লার বেশির ভাগটাই কারবন, তাই কয়লা পুড়লে প্রচুর পরিমাণে কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। অঙ্কের হিসাবে তেল বা গ্যাসের থেকে প্রাপ্ত

প্রতি ইউনিট শক্তিতে যত কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, কয়লার ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি। কয়লা ব্যবহারের ভবিষ্যত নির্ভর করছে এই সমস্যা কত দ্রুত এবং কতখানি সমাধান করা যায় তার উপর।

আর একটি বড় সমস্যা হল, জ্বলার সময় ধোঁয়ার সঙ্গেই কয়লার গুঁড়ো বা টুকরো বেরনো। ভারতে এই সমস্যা বিশেষ গুরুতর; কারণ এখানকার কয়লার ৪০ শতাংশই অপদ্রব্য। আর তাই, এই কয়লা পোড়ালে অনেক বেশি ছাই ওড়ে। কয়লা ব্যবহারের আগে তা ধুয়ে ফেলা হলে অথবা দেশি কয়লার সঙ্গে আমদানি করা কয়লা মেশালে ছাই কিছুটা কমে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, ১০০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে কয়লাকে ধুয়ে ফেলতে হবে, যাতে ছাই-এর পরিমাণ ৩৪ শতাংশের বেশি না হয়। এই ধোয়ার কাজ হয় জল ও মিহি বালি ভরা একটি ট্যাঙ্কে। কয়লা ধোয়ার পর, খণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনটি স্তরে জমা হয়। অপেক্ষাকৃত হালকা এবং পরিচ্ছন্ন কয়লা ভেসে ওঠে উপরে। ভারি কয়লা জমা হয় নিচে এবং ব্যবহার করা হয় বিদ্যুৎ প্রকল্পে। মধ্যবর্তী স্তরের কয়লা— 'মিডলিং'—বিক্রি করা হয় শিল্পক্ষেত্রে, কল-কারখানায় ব্যবহারের জন্য। বর্তমানে প্রায় সাত থেকে আট কোটি টন কয়লা ধুয়ে ফেলা হয়। কোল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে, তারা আরও ১০ কোটি টন কয়লা ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর-এর সাহায্যে কয়লার ছাই আটকানো হয়। এত জমা ছাই কোথায় ফেলা হবে, সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সর্বত্র। আগে একে জলে মিশিয়ে বিদ্যুৎ প্রকল্পের নিকটবর্তী মাঠে ফেলা হত। কিন্তু এতে মাটি এবং জল, দুইয়েরই ক্ষতি এবং ফেলে দেওয়ার পরে এই ছাই আর ব্যবহার করা যেত না। এখন ইট, সিমেন্ট ইত্যাদি তৈরির কাজে লাগে এই ছাই। একে রাস্তা বা বাঁধ তৈরির কাজে ব্যবহার করা সম্ভব কিনা তাই নিয়ে বহু বিতর্ক হলেও এখন কিন্তু এই ব্যবহার যথেষ্ট প্রচলিত।

ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উচ্চ সালফার যুক্ত কয়লা আমদানির হার ক্রমেই বাড়ছে। এই কয়লা পুড়লে তা মিশ্র সালফার-অক্সাইড তৈরি করে, যাকে সমষ্টিগতভাবে SO_X বলা হয়। এই অক্সাইড হাওয়ার জলকণার সঙ্গে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। বেশ কয়েকটি ইউরোপিয় দেশ গবেষণা করে দেখেছে, এই অ্যাসিড হাওয়ায় মিশে বহু দূর অতিক্রম করে অন্য কোনও দেশ বা অঞ্চলে অ্যাসিড বৃষ্টি হিসেবে মাটিতে পড়ে। রীতিমতো ভয়াবহ এই অ্যাসিড বৃষ্টিতে শুধু বন বা জলভূমিই নষ্ট হয় না, মারা পড়ে মাছ ও অন্যান্য প্রাণীও। তাই, যেসব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র উচ্চ সালফার যুক্ত কয়লায় চলে তাদের এখন চিমনির গ্যাসকে সালফার-মুক্ত করা আবশ্যিক।

কয়লা এবং অন্য যে কোনও হাইড্রোকারবনে যে নাইট্রোজেন থাকে, তা আগুনে পুড়ে নাইট্রোজেন অক্সাইড বা NO_X তৈরি করে। এর থেকে স্মগ এবং অ্যাসিড বৃষ্টি — দুই'ই হতে পারে। এই NO_X কমাতে হলে বার্নার বা চুল্লিকে আরও উন্নত করতে হবে—সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ফ্লুইডাইজড বেড কমবাশ্চন নামে বিশেষ একধরনের দহন প্রক্রিয়ার। এই প্রক্রিয়ায় তুলনামূলকভাবে কম তাপমাত্রায় জ্বালানির দহন আরও বেশি হয়। এতে নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ কমানো যায়। চিমনির ধোঁয়ায় যে NO_X থাকে, অনুঘটকের সাহায্যে তারও রাসায়নিক রূপান্তর সম্ভব, ঠিক যেমন গাড়ির টেল পাইপে করা হয়। এভাবে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ NO_X সরিয়ে ফেলা যায়।

কয়লা চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত যে কোনও প্রযুক্তিই দূষণের মাত্রা কমায়, কারণ সেখানে কম কয়লা ব্যবহার করা হয়। সাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দক্ষতা যেখানে ৩৩ শতাংশ, সেখানে আধুনিক 'সুপারক্রিটিকাল' কেন্দ্রে অনেক উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে বাষ্প তৈরি করে ৪৫ শতাংশ দক্ষতা অর্জিত হয়। আরও আধুনিক 'আল্ট্রা-সুপারক্রিটিকাল' কেন্দ্রের কর্মদক্ষতা ৫০ শতাংশ। 'ইন্টিগ্রেটেড গ্যাসিফিকেশন কমবাইন্ড সাইকেল' (আই জি সি সি) উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লাকে বাষ্প সমেত কম মাত্রায় অক্সিজেনে পোড়ানো হয়। এর থেকে উৎপন্ন হয় 'সিনগ্যাস' যা মূলত কারবন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ। গ্যাস টারবাইন ও স্টিম টারবাইনের মাধ্যমে এই গ্যাসকে প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো ব্যবহার করা হয়। ৫০ শতাংশ দক্ষতা পাওয়া যায় আই জি সি সি তে । এইসব আধুনিক ব্যবস্থায় আগের তুলনায় ৯০ শতাংশ কম SO_X এবং NO_X উৎপন্ন হয়। গোটা বিশ্বে মোট ৪০০টি সুপার ক্রিটিকাল এবং ১৬০টি আই জি সি সি উৎপাদন কেন্দ্র আছে। ভারতে সুপারক্রিটিকাল কেন্দ্র চালু করবার এবং হায়দরাবাদের কাছে পরীক্ষামূলকভাবে আই জি সি সি উৎপাদন কেন্দ্র খোলার কথা চলছে।

প্রযুক্তি যত আধুনিকই হোক না কেন, তা কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গমণের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। আর এই সমস্যার উপরেই নির্ভর করছে কয়লার ভবিষ্যৎ। এই সমস্যার সমাধান পেতে হলে কারবন 'আটক ও বন্দি' (Carbon Capture and storage) পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কারবন-ডাই-অক্সাইডকে বিশোষিত করে অ্যামোনিয়ার মতো তরল। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের চিমনি দিয়ে যে কারবন-ডাই-অক্সাইড বেরোয় অ্যামোনিয়ার মধ্য দিয়ে পাঠালে তা আটকানো সম্ভব। উত্তপ্ত করলে এই দ্রবণ থেকে আবার গ্যাস বেরিয়ে আসে। পাইপলাইনের মাধ্যমে এই গ্যাস মাটির নিচে নিঃশেষিত তেল বা গ্যাসের খনিতে বন্দি করা যেতে পারে। অথবা, এই গ্যাস তেলের খনিতে পাঠিয়ে খনির ভিতরকার চাপ বাড়িয়ে আরও বেশি তেল পাওয়া যায়। নরওয়েতে এই ধরনের দুটি বৃহৎ

কেন্দ্র আছে। কিন্তু তাতেও বছরে মাত্র ১০ লক্ষ টন কারবন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার হয়।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে বছরে উৎপাদিত ৬৪০ কোটি টন কয়লার ৭০ শতাংশ ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে, তাহলে প্রতি বছর ১৬০০ কোটি টন কারবন ডাই অক্সাইড পৃথক করে দেওয়ার ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। এত পরিমাণ গ্যাস পৃথক করলেও তাকে রাখা হবে কোথায়? এই গ্যাস অন্তত এক কিলোমিটার মাটির গভীরে রাখতে হবে। পরিত্যক্ত তেলের খনি এবং লবণাক্ত জলাশয় মিলিয়ে এক লক্ষ কোটি টনের কিছু বেশি কারবন ডাই অক্সাইড বন্দি করে রাখা যায়। কাজেই, ৫০-৬০ বছর আমাদের জায়গার অভাব হবে না। কিন্তু হিসাব মতো এই ভাবে বন্দি করতে হলে টন প্রতি খরচ পড়ে ৩০ ডলার। তার মানে, প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ হবে দ্বিগুণেরও বেশি। এক মাত্র উচ্চহারে কারবন-কর চালু করলেই বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি এই ব্যবস্থা নিতে পারে।

কয়লাকে ডিজেল বা পেট্রোলের মত তরল জ্বালানিতে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করলে তার থেকে পরিবেশ দূষিত হয় না। ১৯২৫ সাল থেকেই এই প্রযুক্তি চালু আছে। ফিশার-ট্রপস পদ্ধতিতে প্রথমে কয়লা থেকে কারবন-মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ তৈরি করে তাকে অণুঘটকের সাহায্যে প্রত্যাশিত জ্বালানিতে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৪৪ সালে জার্মানিতে এইরকম ২৫টি উৎপাদন কেন্দ্র ছিল যেখানে প্রতিদিন এক লক্ষ ২৪ হাজার ব্যারেল তরল জ্বালানি উৎপন্ন হত। পাঁচের দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার স্যাসল কোম্পানি কয়লা থেকে ডিজেল ও পেট্রোল উৎপাদনের এক বাণিজ্যিক প্রকল্প তৈরি করে। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকায় তেল সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বহুদিন, তবুও সেখানে দৈনিক এক লক্ষ ৫০ হাজার ব্যারেলের একটি প্রকল্প এখনও কাজ করছে। চীন ঘোষণা করেছে, তারা ৬০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে কয়লা থেকে তরল জ্বালানি তৈরির একটি প্রকল্প তৈরি করবে যেখানে প্রতিদিন ১২ লক্ষ ব্যারেল তরল জ্বালানি তৈরি হবে।

কয়লা থেকে তৈরি ডিজেল বা পেট্রোল কম সালফারের ডিজেলের মতই পরিবেশ-বান্ধব। শুধু তাই নয়, বিকল্প জ্বালানি হিসেবে তেল-আমদানিকারি যে কোনো দেশের কাছেই এই তরল রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে। তবে, এর জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি করতে ৬০ থেকে ৭০ কোটি ডলার প্রয়োজন। এ ছাড়াও কয়লা থেকে তরল জ্বালানিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় প্রচুর কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। কাগজে-কলমে এই গ্যাস পৃথক করে সরিয়ে দেওয়ার কথা, কিন্তু কোনও বাণিজ্যিক প্রকল্পে আজ পর্যন্ত কেউ এ কাজ করেনি।

২.৫। কয়লার আন্তর্জাতিক বাজার ●

তেলের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ৫০ শতাংশই যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে। কয়লার ক্ষেত্রে হিসাবটা আলাদা। উৎপন্ন কয়লার অধিকাংশই ব্যবহার হয় দেশের ভিতরে—মাত্র ২০ শতাংশের মতো যায় আন্তর্জাতিক বাজারে। ৭০টি দেশে কয়লা উৎপন্ন হলেও গত কয়েক বছরে কয়লার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেড়েছে বার্ষিক আট শতাংশ হারে। আমদানি বৃদ্ধির নেতৃত্বে আছে পশ্চিমের বৃটেন, জার্মানি এবং স্পেন। আর, এশিয়ার জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ান। কোকিং কয়লার সাবেক আমদানির সঙ্গে সম্প্রতি বহুল পরিমাণে স্টিম কয়লাও আমদানি করে ভারত। ২০৩০ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে কয়লার ব্যবহার দেড় শতাংশ হারে বাড়বে এবং সরবরাহ ঠিক থাকলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

কয়লা রপ্তানিকারী দেশের তালিকায় শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া। মোট উৎপাদিত ২৮ কোটি টন কয়লার মধ্যে ২২ কোটি টনই তারা রপ্তানি করে। অন্যান্য রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, কানাডা ও কলম্বিয়া। কোকিং কয়লা রপ্তানির ক্ষেত্রেও এক নম্বর দেশ অস্ট্রেলিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং সাম্প্রতিককালে চীনও এই কয়লা রপ্তানি করছে। বহু বছর ধরেই কয়লার তাৎক্ষনিক দাম বা স্পট প্রাইস একই জায়গায় থেকেছে। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে তেলের দামবৃদ্ধির ফলে কয়লার দামও বাড়তে শুরু করে। গত কয়েক বছরে এই বৃদ্ধি হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত।

কয়লার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই বৃদ্ধি কি আগামী দিনেও বজায় থাকবে? বৃহত্তম রপ্তানিকারী দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়াই এ বিষয়ে সব থেকে বেশি চিন্তিত। এখানে কয়লা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৩০ হাজার কর্মী। তাই, এক্ষেত্রে আধিপত্য বজায় রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী অস্ট্রেলিয়া। কয়লা-রপ্তানি বাড়ানোর বিরুদ্ধে এদেশে কিছুটা প্রতিবাদের সুর থাকলেও এই শিল্প তার গুরুত্ব বজায় রেখেই চলেছে। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে অস্ট্রেলিয়া সরকার দেখিয়েছে যে ২০২৫ সালে কয়লা-রপ্তানির মোট পরিমাণ হবে ১১০ কোটি টন। এরমধ্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে রপ্তানি হবে ৪০ কোটি টন। এই রিপোর্টে এ কথাও বলা হয়েছে, খনির সম্প্রসারণ, নতুন খনি খোলা এবং রেলপথ ও বন্দরের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ পেতেও বিশেষ অসুবিধা হবে না। আরও বলা হয়েছে, দুই বৃহৎ রপ্তানিকারী দেশ— দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইন্দোনেশিয়াও রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করছে। উৎপাদনের খরচের বিষয়ে এই রিপোর্টে আশা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, উচ্চমানের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনই কমবে উৎপাদনের খরচও ।

কয়লা-উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির এই চিত্রপটে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কয়লা উৎপাদন ও ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত পরিবেশ দূষণের দিকগুলি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সেই সঙ্গে এই আশাও করা হয়েছে যে, কয়লা সরবরাহকারীরা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির বদলে তাৎক্ষনিক বাজারের উপরেই বেশি জোর দেবে। কারণ, নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিদ্যুতের বাজারও নিশ্চিতভাবেই তাৎক্ষণিক দামেই চালিত হবে। তেলের তুলনায় কয়লার বাজারকে নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্যই মনে করা হয়। কয়লার বিস্তৃতি তেলের থেকে বেশি। কয়লার রপ্তানি কোনও ছোট অঞ্চল বা কয়েকটি দেশ থেকে হয় না, রপ্তানিকারীরা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যেও পড়ে না এবং কয়লার ক্ষেত্রে ওপেক এর মত কোনও সংগঠন গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। এই পশ্চাদপট থেকেই বলা যায়, কয়লার আমদানির উপর নির্ভরশীলতা তেলের আমদানির উপর নির্ভর করার মতো ততটা ঝুঁকির নয়। এই বিষয়গুলি ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভারতে কয়লার আমদানি দ্রুত বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়ার সম্ভাবনা।

২.৬। ভারতে কয়লা ●

স্বাধীনতার সময় ভারতের কয়লা শিল্প বিশেষ উন্নত ছিল না। টিস্‌কো এবং ইস্‌কোর মতো ইস্পাত নির্মাতাদের নিজস্ব কয়লাখনি ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের সিঙ্গারেনি কয়লাখনিটি চলত কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্ধ্রপ্রদেশের সরকারের যৌথ উদ্যোগে। অন্য কয়লাখনিগুলির মালিকানা ছিল ছোট বা মাঝারি মাপের পারিবারিক বাণিজ্যিক সংস্থার হাতে। ছয়ের দশকের পুরো সময় জুড়েই কয়লার উৎপাদন থেমে ছিল সাত কোটি টনেই। আর, খনি মালিকদের বিরুদ্ধে যত্রতত্র মাটি খুঁড়ে কয়লার সন্ধান চালানো এবং কর্মচারীদের নিরাপত্তা এবং সুখ-সুবিধার বিষয়ে উদাসীনতার অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে লেখা উৎপল দত্তের নাটক 'অঙ্গার'— কলকাতার পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বহু দিন চলেছিল। নাটকের উপজীব্য ছিল, জলমগ্ন খনির গহ্বরে আটকে পড়া শ্রমিকদের দুর্দশা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই নাটক দেখেন নি ঠিকই— কিন্তু কয়লার ভবিষ্যৎ এবং খনি-শ্রমিকদের দুর্দশা সম্পর্কে অবশ্যই অবগত ছিলেন। ১৯৭২-৭৩ সালে কয়লাশিল্পকে যখন তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, তখন তা সারা দেশেই প্রশংসিত হয়েছিল। আঞ্চলিক সহায়ক সংস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনিগুলির উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব নেয় কোল ইন্ডিয়া। ৪০ বছরে ভারতে কয়লার উৎপাদন সাত কোটি টন থেকে বাড়িয়ে ৫০ কোটি টনেরও বেশি করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবেই কোল ইন্ডিয়ার।

কয়লার মজুতের ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতের স্থান চতুর্থ। ভারতের আগে রয়েছে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন। ভারতে কয়লার ভূতাত্ত্বিক মজুত ২৭ হাজার ৬০০ কোটি টন।

এর মধ্যে ১১ হাজার কোটি টনের প্রমাণিত মজুতও আছে। অবশ্য এই কয়লার অধিকাংশই নিম্নমানের — যার তাপন-মূল্য প্রতি কিলোগ্রামে ৪৫০০ কিলো ক্যালরি। তুলনামূলকভাবে বিদেশ থেকে আমদানি করা কয়লার তাপন-মূল্য কিলোগ্রাম প্রতি সাধারণত ৬০০০ কিলো ক্যালরি। ভারতের কয়লায় অশুদ্ধ বস্তু বা ছাইয়ের পরিমাণ ৪০ শতাংশ, যেখানে আমদানি করা কয়লায় এই পরিমাণ ১২ শতাংশ। ভারতের কয়লার মাত্র ২০ শতাংশ উচ্চমানের যা থেকে কোক তৈরি হয়। এই কয়লা পাওয়া যায় ঝরিয়াতে। কয়লাখনিগুলি মূলত ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ছত্তিসগড় এবং অন্ধ্রে। বৃহত্তম কয়লাখনি রয়েছে সিঙ্গারেনি, কোরবা, ইব উপত্যকা এবং তালচেরে। অ্যানথ্রাসাইট ও বিটুমেনাস কয়লা ছাড়াও ভারতে ৩৫০ কোটি টন লিগনাইট কয়লা আছে। লিগনাইটের খনি মূলত তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং গুজরাতে ।

কয়লাখনিগুলি যেহেতু পূর্বভারতে অবস্থিত এবং তাদের চাহিদা সারা দেশ জুড়ে, তাই কয়লার পরিবহন দূর-দূরান্তে। দেখা গেছে রেলপথে কয়লা পরিবহনের থেকে তারবাহী বিদ্যুৎ প্রেরণ অনেক সস্তা। তাই, খনির কাছাকাছি কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সবসময়েই শ্রেয়। কয়লাখনি সংযুক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের এই নীতিকে বরাবরই গ্রহণ করে এসেছে ভারত। কিন্তু যে কোনও অঞ্চলে এই ধরনের অনেকগুলি কেন্দ্র খোলার সমস্যা হল—মাটি, জল এবং পরিবেশের দূষণ।

২০১০-১১ সালে ভারতে উৎপাদিত ৫০ কোটি টন কয়লার ৮০ শতাংশই উৎপাদন করেছে কোল ইন্ডিয়া। আরেকটি বড় উৎপাদক সিঙ্গারেনি কোলিয়ারি। নেইভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন মূলত লিগনাইট উৎপাদন করেছে। ভারতের কয়লার ৬০ শতাংশই পাওয়া যায় ভূগর্ভের ৩০০ মিটার গভীরতায় অর্থাৎ ওপেন কাস্ট পদ্ধতির মাধ্যমে। এইরকম ১৭০টি খনি থেকে আমাদের কয়লার ৮৫ শতাংশ উৎপন্ন হয়। এছাড়া আরও ৩৯০টি গভীর খনিতে চলে বোর্ড অ্যান্ড পিলার পদ্ধতি ।

জাতীয়করণের ফলে কয়লাশিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি হলেও এখনও অনেক সমস্যার সমাধান হয়নি। বস্তুত, নয়ের দশকে শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার উর্ধ্বমুখী হওয়ায় চাহিদার সঙ্গে সমস্যা বাড়তেই থাকে। শুরু হয় চালু খনির সম্প্রসারণ ও নতুন খনির সন্ধান। ওপেন কাস্ট খনিগুলির ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক সবরকমের অনুমোদন পেয়ে উৎপাদন শুরু হওয়া উচিত তিন বছরে। কিন্তু বাস্তবে তার থেকে অনেক বেশি সময় লেগে যায়। ফলে সঙ্কট তীব্র হয়। এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে ইস্পাত ও সিমেন্ট শিল্প তাদের প্রযুক্তি বদলায়। সিমেন্ট তৈরিতে অধিক পরিমাণে ফ্লাই অ্যাশ এবং স্টিল স্ল্যাগ ব্যবহার শুরু হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলের বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে কয়লার আমদানি বাড়ে।

সাতের দশক ছিল কয়লাখনি জাতীয়করণের দশক। নয়ের দশকে পরিস্থিতি বদলে যায় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখা শুরু হয়। কয়লাশিল্পের অবনতির দায় এড়ানো কোল ইন্ডিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গত ৩০ বছরে প্রযুক্তি উন্নয়নের

ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও প্রয়াসই নেওয়া হয়নি। ভারতের একটি ওপেন কাস্ট খনিতে প্রতি শিফটে শ্রমিক পিছু কয়লা উৎপাদনের হার ছয় টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই হার ৫৫ টন। গভীর খনির ক্ষেত্রে এই উৎপাদন-ক্ষমতা আরও শোচনীয়। কারণ হল, নয়া প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ ও তার ব্যবহারে অবহেলা, এমন কি উৎপাদনের মান সম্পর্কেও আমাদের ঔদাসীন্য। ফলে, শ্রমিক-নিরাপত্তার দিকটিও যেমন নজরের বাইরে থেকেছে তেমনই উৎপাদিত কয়লার নিম্নমান ক্রেতাদের বিরক্তির কারণ হয়েছে। বেড়েছে ফ্লাই অ্যাশের সমস্যা।

গত এক দশকে কয়লা শিল্পে বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংস্কার এনেছে সরকার। ২০০০ সালে কয়লার দাম নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত হয়। উৎপাদন খরচের উপর ভিত্তি করে যে কোনও মানের কয়লার দাম নির্ধারণে এখন কোল ইন্ডিয়া স্বাধীন। এই সময়েই আবার ২০৮টি খনি অঞ্চল বিদ্যুৎ, সিমেন্ট ও ইস্পাত-শিল্পকে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয় যাতে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় কয়লা নিজেরাই তুলতে পারে। সেই সঙ্গে, কয়লা খননের অনুমোদন দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের কিছু সংস্থাকে। কয়লার অভাবে আবশ্যক শিল্পগুলি যাতে বিপদে না পড়ে, আবার, সীমিত হলেও কিছুটা প্রতিযোগিতায় কোল ইন্ডিয়ার কর্মদক্ষতা যাতে বাড়ে সে জন্যই নেওয়া হয় এই ব্যবস্থা। কিন্তু পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকায় এই পুরো ব্যবস্থাই এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে সংসদে সরকার বিপর্যস্ত।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর ২০১১-১২তে কয়লার চাহিদা ৭১ কোটি ৩০ লক্ষ টন হবে বলে হিসাব করা হয়েছিল। জাতীয় উৎপাদন থেকে এই চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যাবে না, লক্ষ্য ছিল আট কোটি ৩০ লক্ষ টন আমদানি। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে, ২০১৬-১৭সালে এই ঘাটতি বেড়ে দাঁড়াবে ২৫ কোটি টন। এত বিপুল পরিমাণ আমদানি করা কি সম্ভব? প্রথমত, আমাদের বন্দরগুলির মাল খালাসের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, যদিও নতুন কয়েকটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বন্দর নির্মাণের কাজ চলছে এবং মনে হচ্ছে, এর ফলে বন্দরের মাল-খালাসের ক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে। দ্বিতীয়ত, একই সঙ্গে প্রয়োজন অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মত রপ্তানিকারী দেশগুলির খনি এবং সেই সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নতি। অবশ্য এই কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ভারতীয় বিনিয়োগকারীরাও এগিয়ে আসছেন।

আন্তর্জাতিক বাজারে সর্বাধিক সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য করতে হলে আমদানির বিষয়টি আমাদের ভাবতে হবে অনেক আগে থেকেই। কয়লাখনি, রেল অথবা বন্দরে লগ্নি পেতে হলে ভারতে রপ্তানিকারী দেশগুলিকে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, ভারত তাদের কাছে কিছুটা অজ্ঞাতই হয়ে আছে, কারণ আমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে আমদানির সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের প্রয়োজনের পুরোটা উৎপাদনের পরিবর্তে আমরা কিছু পরিমাণ আমদানির সিদ্ধান্ত যদি আগে থেকেই জানাতে পারি, তা হলে যথেষ্ট পরিমাণে লগ্নি ও আন্তর্জাতিক বাজারের সবচেয়ে

সুবিধাজনক দাম পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

২.৭। আমাদের দেশে কতখানি কয়লা আছে? ●

২০১০ সালের ১ এপ্রিল, ভারতে কয়লার ভূতাত্ত্বিক মজুত ২৭ হাজার ৬০০ কোটি টন। এর মধ্যে প্রমাণিত মজুত ১১ হাজার কোটি টন। সেইসঙ্গে আছে ৪ হাজার কোটি টন লিগনাইট বা বাদামি কয়লা। এত বিশাল মজুত থাকা সত্ত্বেও এটা বিস্ময়ের যে আমরা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারি না। শুধু তাই নয়, কয়লার সরবরাহের অনিশ্চয়তার কারণে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কাজও বিলম্বিত হচ্ছে। চাহিদা ও যোগানের ফারাক মেটানোর মতো স্বল্পমেয়াদি সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে ফিরলেও, আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে সরবরাহ নিয়ে কোনও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হবে না। সম্প্রতি সেই আত্মবিশ্বাসেও চিড় ধরেছে। আমরা এখন বছরে ৫০ কোটি টন কয়লা উৎপাদন করছি। আগামী বছর তা বেড়ে হওয়া উচিত ৭০ কোটি টন, ২০১৬ সালে ১০০ কোটি টন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা বেড়ে হতে হবে ২০০ কোটি টন। এই বিপুল উৎপাদন আমাদের দীর্ঘ লালিত একটি ধারণাকে সতর্কভাবে খতিয়ে দেখতে বাধ্য করেছে। তা হল, ভারতে কয়লার মজুতের সঠিক পরিমাণ এবং সেই মজুতের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি।

কয়লা অনুসন্ধানের প্রথম ধাপই হল, প্রাথমিক পরীক্ষা এবং সম্ভাবনা বিচার। এই দায়িত্ব জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জি এস আই)। এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য হল কয়লার মজুত থাকতে পারে এমন অঞ্চল খুঁজে বার করা। নদী উপত্যকা অঞ্চলেই কয়লা পাওয়ার সম্ভাবনা যেহেতু সব থেকে বেশি, তাই জি এস আই আমাদের দেশের সব কটি প্রধান নদী-উপত্যকায় অনুসন্ধান চালিয়েছে। ৪৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে অনুসন্ধান করার পর জি এস আই কয়লার সম্ভাব্য মজুত ভান্ডার হিসেবে চিহ্নিত করেছে ২৪,৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা। জি এস আই আঞ্চলিক অনুসন্ধানও চালিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক গহ্বর খোঁড়া হয়। এই গহ্বর থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন অঞ্চলে পরবর্তী পর্যায়ের অনুসন্ধান চালানো হবে তা স্থির করে কয়লা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি।

তারপর বহুসংখ্যক গহ্বর খুঁড়ে শুরু হয় বিস্তারিত খনন। প্রাথমিকভাবে এই গহ্বরগুলির মধ্যে বেশ কয়েক কিলোমিটারের দূরত্ব থাকে। সম্ভাব্য খনি এলাকার দিকে যতই এই খনন এগোয়, গহ্বরের দূরত্ব কমে হয় এক থেকে দু'কিলোমিটার। শেষ পর্যায়ে, সম্ভাব্য খনির জন্য নির্বাচিত অঞ্চলে ৪০০ মিটার দূরত্বের গহ্বর খুঁড়ে জোরদার অনুসন্ধান চলে। গহ্বরের দূরত্ব যত কমে, মজুত সম্পর্কে অনুমান ততই স্পষ্ট হয়। প্রথম পর্যাযের মজুতকে বলা হয়, অনুমান নির্ভর মজুত (Inferred Reserve)। দূরত্ব দুই কিলোমিটার বা তার কম

হলে তাকে বলে নির্দেশিত মজুত (Indicated Reserve) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে যে হিসাব করা হয়, তাকে বলে প্রমাণিত মজুত (Proved Reserve)। এটিই হল কয়লা তোলার আগে করা সব থেকে নিখুঁত হিসাব, যা মাটির নিচের কয়লার পরিমাণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়।

সমস্যা হল, 'প্রমাণিত মজুত' হিসাবে যতখানি কয়লা রয়েছে, তার সবটা বার করা সম্ভব হয় না। কিছুটা কয়লা হয়তো জমা আছে কোনও শহর বা নদীর তলায়, কিছুটা অভয়ারণ্যের নিচে। একটি বিশেষ কয়লার স্তর হয়তো এতই পাতলা যে তাকে বার করে আনা সমস্যা। আর একটি স্তর হয়তো এতই নিম্নমানের যে তাকে তুলে আনা অর্থহীন। গভীর কয়লাখনিতে স্তম্ভের আকারে কিছু কয়লা রেখে দিতে হয় যাতে ছাত ভেঙে না পড়ে। এই সব কারণে প্রমাণিত মজুতের থেকে খননযোগ্য মজুত সব সময়েই কম। ভারতে অনুমান নির্ভর, নির্দেশিত এবং প্রমাণিত মজুতের পরিমাণ প্রতি বছর সরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে হিসাবে আমরা সবথেকে বেশি উৎসাহী, সেই খননযোগ্য মজুতের হিসাব কখনও প্রকাশিত হয় না। এই হিসাব এবং এ ব্যাপারে কোনও ব্যাখ্যা বা নির্দেশের অভাবে আমরা প্রমাণিত মজুতকেই খননযোগ্য মজুত হিসাবে গণ্য করে এসেছি। আর, তা থেকেই প্রাচুর্যের এই বিভ্রমের সূচনা।

দুঃখের কথা, ভারতের খননযোগ্য মজুতের পরিমাণ সম্পর্কে কোনও ঐকমত্য নেই। কিছু নথিপত্রে দেখা গেছে এই পরিমাণ ৫ হাজার ২০০ কোটি টন। মোট ভূতাত্ত্বিক মজুতের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত প্রয়োগ করে এই পরিমাণের হিসাব করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই হিসাব যদি ঠিক হয়, তাহলে, আমরা আগামী ৪০ বছর ধরে প্রতি বছর প্রায় ১৩০ কোটি টন কয়লা উৎপাদন করতে পারব এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে প্রায় তিন লক্ষ মেগাওয়াট—যা নিতান্তই অপ্রতুল। কয়লা থেকে আমাদের আরও বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন বলেই কয়লার মজুত নিয়ে আমাদের আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার। জি এস আই চিহ্নিত ২৪,৫০০ বর্গ কিলোমিটার সম্ভাব্য এলাকার মধ্যে মাত্র ৬০০০ বর্গ কিলোমিটারেই বিস্তারিত অনুসন্ধান হয়েছে। অনুসন্ধান হওয়া এলাকায় প্রমাণিত মজুত চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এলাকাতেও বিস্তারিত অনুসন্ধান চালানোর দরকার। তেল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে নতুন এবং দুর্গম এলাকায় অনুসন্ধান চালানোর কাজে যেমন সুবিধা করে দিয়েছে নতুন উদারনীতি এন ই এল পি (NELP), তেমনই কয়লাশিল্পেও অবিলম্বে এই ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। ■

তৃতীয় অধ্যায় পেট্রোলিয়ম

৩.১। ইতিহাস ●

তেলশিল্প হল মুনাফা, প্রতিপত্তি এবং সাফল্যের এক বর্ণময় সমাহার। তেলের বাণিজ্যে লগ্নি করে শীর্ষস্থানীয় বহুজাতিক সংস্থা। এই শিল্পে চাকরির বাজার লোভনীয়, তেমনই চড়া শেয়ারের দাম। হিউস্টনের ঝাঁ-চকচকে অফিস, দোহা বা রিয়াধের দীর্ঘাকার নিঃশব্দ গাড়ি অথবা কুয়ালালামপুরের গগনচুম্বী পেট্রোনাস টাওয়ার — এসবই গত একশো বছরে তেলের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সাফল্যের এক একটি প্রতীক। এই শিল্পে ঠিক কী করা হয়? এই শিল্পের কাজ হল প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে পেট্রোলিয়ম-এর ভান্ডার খুঁজে বার করা, মাটির তলা থেকে তুলে এনে তাকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত শোধনাগারে নিয়ে আসা এবং সব শেষে পরিশুদ্ধ জ্বালানি পৃথিবীর যে কোনও দেশের ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া। গত একশো বছরে তেলের উৎপাদনের হার বেড়েছে বহুগুণ। ১৯০০ সালে প্রতিদিন মাত্র পাঁচ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপন্ন হত। একশো বছর পরে, অর্থাৎ ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় দৈনিক সাত কোটি ৫০ লক্ষ ব্যারেলে। শুধু তাই নয়, ২০০০ সালে মোট উৎপাদিত শক্তির ৩৮ শতাংশই পাওয়া যায় তেল থেকে, যেখানে কয়লা থেকে পাওয়া যায় ২৬ শতাংশ। আর পরিবহনের ক্ষেত্রে তেলের ভূমিকা অপ্রতিরোধ্য, কারণ ৯৪ শতাংশ পরিবহনের জ্বালানিই ছিল পেট্রোল বা পেট্রোলিয়মজাত তেল।

সমৃদ্ধির এই উর্ধ্বমুখী যাত্রা সত্ত্বেও এই শিল্প আগাগোড়াই দুটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমত, পৃথিবীতে তেলের ভান্ডার ফুরিয়ে আসছে— এই গভীর আশঙ্কা এবং দ্বিতীয়ত তেলের দাম নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা। প্রথম সমস্যাটি শুরু থেকেই ছিল, আর দ্বিতীয়টি প্রবল হয়েছে গত চল্লিশ বছরে। মজার কথা হল, এই সমস্যা অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদেরই বিচলিত করেছে, শিল্পের ক্যাপ্টেনরা একে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। বরঞ্চ তাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন যাতে, তেলশূন্য পৃথিবীর আশঙ্কা অথবা মূল্যবৃদ্ধির চিন্তা — কোনওটাই ক্রেতাদের বিমুখ না করে। সদ্য কৈশোর পেরোনো যে মেয়েটি মোটরবাইকে লম্বা রাস্তা পেরোতে উদগ্রীব, সে যাতে তার সামর্থ্যের মধ্যে তেল পেতে পারে তার ব্যবস্থা তেল কোম্পানিগুলি করেছে। ইচ্ছাপূরণ এবং সুখবিলাসের অবসান ঘটল একুশ শতকের গোড়ায়। ক্রেতারা এখন তেলের দামের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। কবে এক ব্যারেল তেলের দাম ২০০ ডলারে পৌঁছায় সেই দুশ্চিন্তা এখন তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। অন্যদিকে উৎপাদকরাও ১৯৮৬ এবং ১৯৯৮ সালের অস্বাভাবিক মূল্যহ্রাসের কথা ভেবে তেলের দাম কমাবার কোনও উদ্যোগই নেয় না। কেবলমাত্র মুষ্ঠিমেয়

ফাটকাবাজ বাজারের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট। এখন প্রশ্ন — দেড়শো বছরের এই গৌরবময় আধিপত্যের পরে এবার কি পেট্রোলিয়মের বিদায়বেলা আসন্ন?

বর্তমানে, মাটির এক থেকে চার হাজার মিটার গভীরে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু অতীতে, তেল পাওয়া যেত মাটির খুব কাছেই। অনেক সময়েই দেখা যেত গাঢ় বাদামি রঙের তেল মাটি ফুঁড়ে উঠছে, জ্বলেও উঠছে। জ্বলে ওঠার ক্ষমতাই এই তেলকে জ্বালানি হিসেবে চিহ্নিত করে প্রাচীনকালের মধ্যপ্রাচ্য বা চীনে। বাণিজ্যিকভাবে প্রথম মাটি খুঁড়ে তেল বার করা হয় ১৮৫০ সাল নাগাদ। পেনসিলভেনিয়ার টাইটাসভিলে ১৮৫৯ সালে কর্ণেল ড্রেক যে বিখ্যাত কূপটি খোঁড়েন তা ছিল মাত্র ৭০ ফুট গভীর। কয়েক বছরের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তেল উৎপাদনকারী দেশ হয়ে ওঠে। তেলের খনিগুলি ছিল মূলত টেক্সাস এবং লুইসিয়ানাতে। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠল শোধনাগার। পিছিয়ে থাকেনি ভারতও। ১৮৬০ নাগাদই অসমে তেল পাওয়া যায় এবং ১৮৮৯ থেকেই বাড়তে থাকে উৎপাদন। ১৯০১-এ ডিগবয়তে গড়ে ওঠে শোধনাগার, যার দৈনিক তেল শোধনের ক্ষমতা ছিল ৫০০ ব্যারেল। আজকের নিরিখে বিচার করলে এই ক্ষমতা খুবই সামান্য কারণ মথুরার শোধনাগারেই এখন প্রতিদিন এক লক্ষ ষাট হাজার ব্যারেল তেল শোধন করা হয়। গোড়ার দিকে শোধনাগার থেকে পাওয়া যেত কেবল কেরোসিন, যা আলো জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হত। অত্যাশ্চর্য এই তরল ছিল তিমি মাছের তেলের থেকে অনেক কমদামি। আজ আর আলো জ্বালানোর জন্য তিমি শিকারের প্রয়োজন পড়ে না। তবে, তিমি মাছকে আজও মারা হয়, রসনাতৃপ্তির জন্য। জাপানের স্কুলপড়ুয়াদের স্যান্ডউইচের অন্যতম প্রিয় উপকরণ নাকি এই মাছ।

আসল ঘটনার সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষভাগে, যখন অন্তর্দহন ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়। বদ্ধ সিলিন্ডারের মধ্যে তরল জ্বালানির দহন ঘটিয়ে তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করে এই ইঞ্জিন। দেখা গেল, এই ইঞ্জিন চালাতে পেট্রোল বা ডিজেলের থেকে ভাল জ্বালানি আর নেই। সেই সময়, কয়লা ব্যবহার হত পরিবহনের কাজে— জাহাজ এবং রেলের ইঞ্জিন চালাতে। কয়লার ইঞ্জিনের জন্য বড় চুল্লিতে প্রচুর পরিমাণ কয়লা পুড়িয়ে বয়লারে জল ফুটিয়ে বাষ্পে পরিণত করা হয়। সেই বাষ্পই প্রসারিত হয়ে পিস্টন চালায়। কয়লার দহন যেহেতু মূল যন্ত্রের বাইরে হয়, তাই একে বহির্দহন যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রের সমস্যা হল, বয়লার থেকে যন্ত্র পর্যন্ত পৌঁছতে বেশ খানিকটা তাপ কমে যায়, তার ফলে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতাও হয়ে যায় সীমিত। অন্তর্দহন ইঞ্জিনের এই বর্ধিত কর্মদক্ষতা পরিবহনের জগতে এক বিপ্লব নিয়ে আসে। যানবাহনের গতিবেগ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। মোটরগাড়ির সংখ্যা বেড়ে ১৯১৫ তে পৌঁছায় ১০ লক্ষে। জাহাজ দ্রুতগামী হওয়ায় আরও বেশি এলাকা চলে আসে নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। কয়েক বছরের মধ্যেই বিমান

ওড়াতে শুরু করেন রাইট ভাইরা। ১৯১১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম এয়ারমেল পাঠানো হয় এলাহবাদ থেকে নৈনিতে। ১৯১৭ সালে একটি একক বিমানে আটলান্টিক সাগর পার হন লিন্ডবার্গ। যে অত্যাধুনিক ও গতিময় পৃথিবীকে আজ আমরা দেখছি, তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। তবে কয়লার আধিপত্য একদিনেই শেষ হয়ে যায়নি, তেলের ব্যবহার কয়লাকে ছাড়িয়ে যায় ১৯৫৮ সালের পর।

৩.২। তেলশোধন ●

অশোধিত তেল মূলত বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোকারবন দিয়ে তৈরি। শোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই হাইড্রোকারবনগুলিকে আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে ভাগ করে ফেলা হয়, যা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন পেট্রোল, ডিজেল বা কোরোসিন। গোড়াতে ছিল কেরোসিন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোধনপ্রক্রিয়া যত উন্নত হয়েছে, পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্যের তালিকা ততই দীর্ঘ হয়েছে। আজ বিশ্বের শোধনাগারগুলিতে প্রায় দু'হাজার রকমের জ্বালানি উৎপাদিত হয়। এরমধ্যে নিত্য ব্যবহার্য জ্বালানিগুলির মধ্যে আছে এল পি জি বা রান্নার গ্যাস, পেট্রোল বা গ্যাসোলিন, ন্যাফথা, ডিজেল, কেরোসিন, বিমানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি বা এ টি এফ, বিটুমেন, লুব্রিকেটিং অয়েল ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটিরই আবার প্রকারভেদ আছে। যেমন ৪০ রকমের পেট্রোল আর ২৭ রকমের ডিজেল পাওয়া যায়। এ টি এফ অনেকটা কেরোসিনের মতো। কেরোসিন আবার রকেট চালাবার কাজেও ব্যবহার করা হয়েছে। ফুয়েল অয়েল বা ফারনেস অয়েল, অ্যাসফল্ট এবং পেট্রোলিয়ম কোক — এগুলির ওজন এবং ঘনত্ব বেশি। বিশেষ কয়েকধরনের অশোধিত তেলের থেকেই লুব্রিকেটিং অয়েল তৈরি হয়।

অশোধিত তেলে কিছু প্রাকৃতিক গ্যাস মিশে থাকে। এই গ্যাসে রয়েছে মূলত মিথেন (CH_4) এবং কিছু অংশে ইথেন (C_2H_6) প্রোপেন (C_3H_8) এবং বিউটেন (C_4H_{10})। খনি থেকে বার হওয়া মাত্রই এই গ্যাস তেল থেকে আলাদা করে পৃথক পাইপলাইনের মাধ্যমে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে, প্রোপেন এবং বিউটেন-এর সবটাই কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায় না; কিছুটা থেকে যায় তেলের সঙ্গে। অশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস — এই দুইয়ের থেকেই পাওয়া প্রোপেন ও বিউটনের আধা-আধি মিশ্রণেই আমাদের দেশে তৈরি হয় এল পি জি। ২০০৮ সালের যে অলিম্পিক মশাল মাউন্ট এভারেস্টের নিকটবর্তী চরম আবহাওয়াতেও স্থিরভাবে জ্বলেছিল, তার জ্বালানি ছিল বিউটেন। মিথেন বা ইথেনের মতো হাইড্রোকারবনকে অ্যালকেন বা প্যারাফিন বলা হয়। অশোধিত তেল-এর অপেক্ষাকৃত হালকা অংশের বেশিরভাগটাই অ্যালকেন, ভারি অংশে অ্যালকেনের সঙ্গে থাকে ন্যাফথিন এবং অ্যারোম্যাটিকস।

যে সব হাইড্রোকারবনে পাঁচ থেকে বারোটি কারবন পরমাণু থাকে তা পেট্রলের উপাংশ। এই শ্রেণীর সব থেকে পরিচিত অ্যালকেন হল অকটেন, যাতে আটটি কারবন পরমাণু আছে। ডিজেল আরও ভারি। এতে পনেরো থেকে আঠারোটি পর্যন্ত কারবন পরমাণু যুক্ত হাইড্রোকারবন আছে। এরমধ্যে আছে সিটেন। এটি ষোলটি কারবন পরমাণু যুক্ত হাইড্রোকারবন। এরপরে আছে অন্যান্য জ্বালানি তেল, বিটুমেন এবং অ্যাসফল্ট। মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত পেট্রোল এবং ডিজেলের চাহিদাই সর্বাধিক। তাই যেসব তেল থেকে এগুলি বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, তার বাজারদরও তুলনামূলকভাবে ভাল। এগুলি অপেক্ষাকৃত হালকা তেল। ভারি তেল শোধন করে বেশি মাত্রায় পাওয়া যায় বিটুমেন এবং অন্যান্য জ্বালানি তেল।

যে কোনো শোধনাগারের মূল কাজ দু'ভাগে ভাগ করা যায়— পাতন ও শোধন। মূল যন্ত্রই হল একটি বিশেষ ধরনের পাতন যন্ত্র। স্তম্ভের আকারের এই যন্ত্রের একেবারে নিচে অশোধিত তেল গরম করা হয়। সবচেয়ে হালকা উপাংশ এল পি জি—এই স্তম্ভের সবথেকে উপরে উঠে আসে। অন্যান্য উপাংশগুলি ওঠে বিভিন্ন উচ্চতায় । কাজেই, এগুলিকে আলাদা করে স্তম্ভ থেকে বের করে আনা যায়। পাতন-প্রণালী এখানেই সম্পূর্ণ। প্রত্যেক ধরণের অশোধিত তেলেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তার উপরেই নির্ভর করে উৎপন্ন জ্বালানির পরিমাণ ও চরিত্র। পাতনযন্ত্রের সঙ্গে থাকে শোধনের অন্যান্য যন্ত্র— যার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত ভারি পাতক শোধন করে হালকা জ্বালানিতে পরিণত করা হয়। পাতনের পরে যে পরিমাণ পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি পাওয়া যায়, শোধনের পর এসবের পরিমাণ অনেকটাই আলাদা। শোধনের পরে উচ্চমানের জ্বালানির উৎপাদন বেশি হয়, কিন্তু তা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। ইচ্ছামতো তার পরিমানের হেরফের করা যায় না।

শোধনের কাজ করা হয় এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে, যাকে বলা হয় 'ক্র্যাকিং'। এই 'ক্র্যাকিং'-এরও রকমফের আছে — তাপীয় বা থারমাল 'ক্র্যাকিং', অণুঘটকীয় বা ক্যাটালিটিক ক্র্যাকিং এবং হাইড্রোক্র্যাকিং। বিভিন্ন শোধনাগারে ব্যবহৃত পাতনযন্ত্রে বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও শোধনের প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকতে পারে। শোধনের কাজে ব্যবহৃত অণুঘটক ঠিক ততটাই অপরিহার্য যতটা শোধনাগারের পাইপ বা আধার। গোটা বিশ্বে মাত্র কয়েকজন উৎপাদকের হাতেই রয়েছে এই অণুঘটকের বাজার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর, জাপান এবং সাম্প্রতিককালে ভারতই হল সারা বিশ্বে তেল শোধনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বিশ্বজুড়ে তেল শোধনের মিলিত ক্ষমতা প্রতিদিন নয় কোটি ব্যারেল। আটের দশকে, প্রয়োজনের তুলনায় শোধনাগারের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বেশি। কিন্তু ১৯৮১ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা গত কুড়ি বছরে ইউরোপে কোনও নতুন শোধনাগার তৈরি হয়নি। শোধনাগারের এই বাড়তি ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে গেছে। এর

পিছনে কারণ আছে অনেকগুলি। পরিবেশ রক্ষার্থে আইন এখন আরও কঠোর, তাই নতুন শোধনাগার তৈরি করতে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং সেই মূলধন থেকে লাভের মুখ দেখতে অনেক সময় লাগে। অশোধিত তেলের দাম এতই বেড়ে গেছে যে ভবিষ্যতে তেলের চাহিদা কতটা থাকবে তা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে বড়সড় লগ্নি পাওয়া আরও সঙ্কটের। ভারত অবশ্য এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। অতীতে, ভারতের শোধনাগারগুলি শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করত। কিন্তু এখন গোটা এশিয়ার ক্রমবর্ধমান চাহিদার একটা বড় অংশ মিটছে ভারতীয় শোধনাগারের মাধ্যমে।

২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অশোধিত তেলের দাম নিয়মিত বেড়েছে। যুক্তির দিক থেকে শোধনাগার থেকে লাভের অঙ্ক এই সময়ে কমে যাওয়ারই কথা। কিন্তু বাস্তবে ঘটল অন্যরকম। ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সেই তুলনায় সীমিত উৎপাদনক্ষমতার ফলে শোধনাগারের মুনাফা বেড়েই চলল। পরিশুদ্ধ তেলের বাজারদর থেকে অশোধিত তেলের দাম বাদ দিলে যে অঙ্কটি থাকে, তাকে বলা হয় 'রিফাইনারি স্প্রেড' বা 'ক্র্যাক স্প্রেড'। ১৯৯০ এর সময় এই স্প্রেড ছিল ব্যারেল পিছু চার থেকে পাঁচ ডলার। ক্রমে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ থেকে ১৫ ডলারে। ২০০৮ সালের পর চাহিদা কমে যায় বহুলাংশে; আর এই স্প্রেডও কমে তার পুরনো অঙ্কে চলে যায়।

৩.৩। অনুসন্ধান ও উৎপাদন ●

শোধনাগার থেকে উৎপাদিত তেল বা অন্যান্য পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্য সারা পৃথিবীর ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানো দরকার। বিশ্বের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে শোধনাগার থাকার ফলে তেলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম শর্তই হল উপযুক্ত ট্যাঙ্কার, পাইপলাইন এবং বন্দরের সুবিধা। দেশের মধ্যে এই ধরণের দ্রব্য পরিবহনের জন্য সড়ক, রেল অথবা পাইপলাইন ব্যবহার করা হয়। এরমধ্যে পাইপলাইনের কতকগুলি সুবিধা আছে — যেমন এটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন এবং খুব বেশি খরচসাপেক্ষও নয়। তাই যেখানেই সম্ভব, নতুন পাইপলাইন তৈরি করা হয়েছে। গোটা দেশ জুড়ে গড়ে ওঠা মজুতভান্ডার এবং খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে এই পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি ক্রেতাদের সরবরাহ করা হয়। ভারতে প্রায় ৪০ হাজার খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র বা পেট্রোল পাম্পের মাধ্যমে বছরে এক কোটি ২০ লক্ষ টন পেট্রোল এবং পাঁচ কোটি টন ডিজেল বিক্রি করা হয়। তুলনামূলকভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোল পাম্পের সংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ। শোধনাগার এবং তেলের বন্টন বা বিক্রয়ব্যবস্থাকে বলা হয় পেট্রোলিয়ম শিল্পের নিম্নভাগ বা ডাউনস্ট্রিম। উপরিভাগ বা আপস্ট্রিমে রয়েছে তেলের অনুসন্ধান এবং অশোধিত তেলের উৎপাদন। এই অধ্যায়ের গোড়ায় উল্লিখিত সমস্যা দু'টি বুঝতে হলে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে উপরিভাগে।

পেট্রোলিয়মের উদ্ভব বা উৎস সম্পর্কে দু'রকমের তত্ত্ব আছে। অধিক প্রচলিত তত্ত্ব অনুযায়ী পেট্রোলিয়মের উৎস হল সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ। এই দেহাবশেষ সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে। ক্রমে তার উপর পলি পড়েছে, মাটির গভীরের উষ্ণতা ও চাপের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে তা পেট্রোলিয়মে পরিণত হয়েছে। ঠিক একইভাবে উদ্ভিদ থেকে তৈরি হয়েছে কয়লা। কয়লায় হাইড্রোজেনের পরিমাণ কম। জীবদেহের অধিক স্নেহপদার্থই পেট্রোলিয়মে হাইড্রোজেনের উৎস। শুধু তাই নয়, এরফলে পেট্রোলিয়মের শক্তির ঘনত্ব বেশি এবং তা গতিময় বা সচল। একবার পাললিক শিলার ভিতরে তৈরি হলে পেট্রোলিয়াম সেই উৎস শিলার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। ফাঁকফোকর দিয়ে তা নানাদিকে প্রবাহিত হতে থাকে। তবে, এই গতি মাপা হয় ভূতাত্ত্বিক সময়কালের হিসাবে, আমাদের ঘড়ির ঘন্টা-মিনিট-সেকেন্ডের মতো দ্রুতগতির হিসাবে নয়। তাই, মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়ম অদূর ভবিষ্যতে ভারতে চলে আসবে—এমন সম্ভাবনা কিন্তু নেই।

তুলনামূলকভাবে কম প্রচলিত তত্ত্ব অনুযায়ী পেট্রোলিয়ম উৎসগতভাবে অজৈব। জৈব পেট্রোলিয়ম হল অনেক পরবর্তী সংযোজন। এই তত্ত্ব বলে, পেট্রোলিয়ম তৈরি হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক এক শিলার ভিতরে। তৈরি হয়েছিল বললে ভুল হবে। বলা যায়, এখনও তৈরি হয়ে চলেছে। পঞ্চান্ন কোটি বছর আগে তৈরি হওয়া এই শিলার নাম ক্যামব্রিয়ান রক।

পেট্রোলিয়মের উদ্ভব যদি এতটাই প্রাচীন হয়, তাহলে তাতে প্রাণীর দেহাবশেষ নেই। তার মানে একাধিক অজৈব খনিজের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পেট্রোলিয়ম তৈরি হয়েছে। এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, এই রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং, মাটির গভীরে পেট্রোলিয়ম হয়তো এখনও তৈরি হয়ে চলেছে। এই তত্ত্বের সবথেকে বড় সুবিধা হল, এই তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীতে পেট্রোলিয়মের ভান্ডার হয়ত অপরিসীম। আমরা এই মতবাদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করব না। তবে আপাতত আমরা জৈবিক মতবাদ মেনে নিয়েই এগোব।

শিলার গভীরে তৈরি হওয়া পেট্রোলিয়মের কিছুটা ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে আসতে আসতে নিম্নচাপে বাষ্পীভূত হয় এবং বাতাসে মিশে যায়। বাকিটা অপ্রবেশ্য শিলা বা শিলার মধ্যে জমে থাকা নুনের আস্তরণের মধ্যে আটকা পড়ে— অনেকটা ফাঁদে পড়ার মতো। পেট্রোলিয়ম অনুসন্ধানের প্রথম ধাপই হল এই ফাঁদগুলিকে খুঁজে বার করা। ভূকম্পীয় নিরীক্ষণের মাধ্যমেই এই অনুসন্ধান চালানো হয়। মাটির নিচে কোনো একটি স্থানে ডায়নামাইটের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটালে সেখান থেকে শকওয়েভ (শব্দতরঙ্গ) ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। নির্দিষ্ট স্থানে মাইক্রোফোন লাগিয়ে সেই তরঙ্গ পরীক্ষা করা যায়। পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে এই তরঙ্গ কোনো অপ্রবেশ্য শীলা অথবা নুনের আস্তরণ পার হয়ে এসেছে কিনা এবং এই শব্দতরঙ্গের সঙ্কেত বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় এই ফাঁদ কোথায় কোথায় রয়েছে। এইভাবে পাললিক শিলার একটি উপত্যকায় কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে খোঁজা হয় তেলের আধার।

ভূকম্পীয় নিরীক্ষণে শিলার ভিতরকার অপ্রবেশ্য অংশ বা চলতি কথায় তেলের ফাঁদ আছে কিনা তা দেখা যায়। কিন্তু সত্যিই তেল আছে কিনা তা জানতে গেলে মাটি খুঁড়ে দেখতে হবে। এই কাজ যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। তাই, এই কূপ খননের আগে ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখে নিতে হবে, যাতে এর থেকে নিশ্চিতভাবে তেল পাওয়া যায়। তেল পাওয়া গেলে আশেপাশে আরও কূপ খনন করা হয় যাতে তেলের ভান্ডারের বিস্তৃতি এবং পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ভূগর্ভে তেল আছে কিনা তা জানার জন্য যে খননকার্য, তা হল আবিষ্কার বা অনুসন্ধানমূলক খনন। আর তেলের ভান্ডারের ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কে জানতে যে খননকার্য চালানো হয় তা হল উন্নয়নমূলক খনন। তেল শিল্পের আয়-ব্যয়ের তথ্যে 'অনুসন্ধান ও উন্নয়ন' খাতে যে খরচ দেখানো হয়, তা আসলে এই দুই খননকার্যের মিলিত অঙ্ক। মধ্যপ্রাচ্যে ব্যারেল প্রতি তেলের জন্য এই খরচ ছিল মাত্র দেড় ডলার। এখন, তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন ডলারে। সাইবেরিয়া বা গভীর সমুদ্রের মতো দুর্গম অঞ্চলে অবশ্যই এই খরচ অনেক বেশি।

একটি খনি অঞ্চল থেকে যে পরিমাণ তেল পাওয়া যাবে বলে হিসাব করা হয়, সেটি হল সেই অঞ্চলের 'প্রমাণিত' বা নিশ্চিত মজুত। অর্থাৎ গ্রহণসাধ্য প্রযুক্তি এবং সঙ্গত দামে যে পরিমাণ তেল সেই অঞ্চল থেকে পাওয়া যাবে। তবে, যে কোনও অঞ্চলের ক্ষেত্রেই তেলের মজুত ক্রমাগত বদলাতে থাকে। কারণ, একদিকে নতুন অনুসন্ধান যেমন এই ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে, অন্যদিকে তেলের উৎপাদন আবার মজুতকে কমিয়েও দেয়। পূর্বতন ব্রিটিশ পেট্রোলিয়মের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৯ সালের শেষে গোটা বিশ্বের তেলের প্রমাণিত মজুত ছিল এক লক্ষ ৬০০ কোটি ব্যারেল। ২০০৯ সালে এই মজুত বেড়ে হয় এক লক্ষ ৩৩ হাজার ৩০০ কোটি ব্যারেল। ক্রমবর্ধমান এই সংখ্যাই প্রমাণ করে যে এই দু'দশকে যতখানি তেল বার কার আনা হয়েছে তারও বেশি তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। ২০০৯ সালে তেলের উৎপাদন ছিল দৈনিক আট কোটি ব্যারেল অথবা প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার কোটি ব্যারেল । উৎপাদনের বর্তমান হার অনুযায়ী এক লক্ষ ৩৩ হাজার ৩০০ কোটি ব্যারেলের মজুত চলবে আরও ৪৪ বছর। অন্যভাবে বলতে গেলে ২০০৯ সালে মজুত ও উৎপাদনের অনুপাত ছিল ৪৪ বছর।

মজুত ও উৎপাদনের অনুপাত ৪৪ বছর — মানে কিন্তু এই নয় যে ৪৪ বছর পরে আমরা আর তেল পাব না। গত ৪০ বছর ধরেই এই অনুপাত রয়েছে ৪০ বছরের কাছাকাছি এবং পৃথিবী তেলশূন্য হয়ে যায় নি। আসলে, তেলের উৎস অনুসন্ধানের কাজ এখন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে কেননা বর্তমানে তেলের উৎস রয়েছে দুর্গম অঞ্চলে অথবা সমুদ্রের গভীরে; কাস্পিয়ান সাগরের তলদেশে, সাইবেরিয়ায়, সুমেরু প্রদেশ বা আন্টার্কটিকায়। সমুদ্রের নিচের তেল অনুসন্ধানকারী জাহাজের দৈনিক ভাড়াই হতে পারে প্রায় দু'লক্ষ ডলার। এই অঞ্চলের একটি কূপ খননের খরচও হতে পারে ১০ কোটি ডলারেরও বেশি। তেল উৎপাদকরা মজুত ও উৎপাদনের অনুপাত বৃদ্ধি করার জন্য এত

বেশি লগ্নি করবেন না, যদি না মজুত তেলের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। যতক্ষণ তা ৪০ বছরের কাছাকাছি রয়েছে, ততক্ষণ শিল্পমহল সন্তুষ্টই থাকবে এবং এই অনুপাত বজায় রাখার চেষ্টা করবে। অ্যাডেলম্যানের কথা অনুযায়ী 'প্রমাণিত মজুত' হল তেল উৎপাদকদের কাছে শিল্পের কাঁচামাল। কোনও একটি মোটরগাড়ির কারখানায় গিয়ে হয়ত দেখা গেল, সেখানে আগামী ২০ দিন কাজ চলার মতো ইস্পাতের পাত রয়েছে। তার মানে এই নয় যে ২০ দিন পরে সেখানে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে বরং তার মানে এই যে, যখনই প্রয়োজন হবে, তখনই তারা আরও ইস্পাত জোগাড় করে নেবে।

তবে একথা নিশ্চিত যে আমরা আমাদের ইচ্ছা এবং প্রয়োজনমতো তেল খুঁজে বার করতে পারি না, কারণ পৃথিবীর বুকে তেলের পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং হয় আজ নয় কাল— মজুত ও উৎপাদনের এই অনুপাত কমতে বাধ্য। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তেলের মজুত বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বেড়েছে। ওই বছরই মজুতের পরিমাণ ৬০০০ কোটি ব্যারেল বেড়ে যায়। তুলনামূলকভাবে দেখা যাচ্ছে এই মজুত ২০০০ সালের পর থেকে মাত্র ১০ হাজার কোটি ব্যারেল বেড়েছে। ৩০০০ থেকে ৫০০০ কোটি ব্যারেল তেল রয়েছে এমন খনি অঞ্চলগুলির অধিকাংশই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে সাতের দশকে। ২০০০ সালের পর মাত্র দু'টি এইরকম উর্বর খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। গত কয়েকবছরে তেল আবিষ্কার হয়েছে উৎপাদনের তুলনায় বেশ খানিকটা কম হারে।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, তেল আবিষ্কারের হার কমতে কমতে একদিন শূন্যে নেমে যাবে। ততদিনে কত পরিমান তেল পাওয়া যাবে তার কি কোনও হিসাব করা যায়? এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি আনুমানিক হিসাব আছে। অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক তথ্য এবং তেল সমৃদ্ধ অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে করা এই আনুমানিক হিসাব হল এক লক্ষ থেকে দু' লক্ষ কোটি ব্যারেল। অনুমান নির্ভর এই হিসাবের থেকে আমরা অবশ্যই বেশি গুরুত্ব দিই 'প্রমাণিত' মজুতের পরিমাণকে। তবে, এই হিসাব আমাদের তেল অনুসন্ধান প্রকল্পকে সঠিক পথ দেখায়। সেই সঙ্গে আমাদের বলে দেয় কোন অঞ্চলে তেলের অনুসন্ধান করা যেতে পারে এবং কত পরিমাণে তেল আশা করা যেতে পারে।

৩.৪। উৎপাদনের শীর্ষবিন্দু ●

কোনো খনি থেকে তেল তুলে নেওয়া হলে, তার অভ্যন্তরীণ চাপ কমতে থাকে। একটা সময়ের পর, তেলের প্রবাহ কমতে শুরু করে। শুরু হয় খনির 'নিম্নগামী' পর্যায়। স্বাভাবিকভাবেই, একটি অঞ্চলের পুরনো খনিগুলির মজুত নিম্নগামী হলেও অপেক্ষাকৃত নতুন আবিষ্কৃত খনি থেকে উৎপাদনের হার বাড়তে থাকে। মোট উৎপন্ন তেলের প্রবাহ বাড়বে না কমবে তা নির্ভর করে খনিগুলি কত পুরানো তার উপরে। বিশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক কিং হাবার্ট দেখিয়েছেন যে কোনো বৃহৎ খনি অঞ্চলে মোট মজুত তেলের অর্ধেক খরচ

হয়ে গেলে তেল উৎপাদনের পরিমাণ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। এর পর থেকেই উৎপাদনের হার কমতে থাকে। 'অর্ধেক পরিমাণ তেল'—বলতে শুধু আবিষ্কৃত তেল বোঝায় না, আরও যে পরিমাণ তেল সেই অঞ্চল থেকে পাওয়া যেতে পারে, তাও ধরা থাকে এই হিসাবের মধ্যে।

তেল সমৃদ্ধ এমন অনেক অঞ্চলই আছে যেগুলি তাদের উৎপাদনের সর্বোচ্চ সীমা বা শীর্ষবিন্দু পেরিয়ে গেছে অতীতেই। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল উৎপাদন সর্বোচ্চ ছিল ১৯৭০ নাগাদ। সম্প্রতি বৃটেনের নর্থ সি তে তেল উৎপাদন সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে এখন কমতে শুরু করেছে। এই সব অঞ্চলে তেলের উৎপাদনের হার কমে গেলেও অন্যান্য অঞ্চলে এই হার উর্ধ্বমুখী হওয়ায় মোট উৎপাদনে বিশেষ হেরফের হয় নি। কিন্তু গোটা বিশ্বেই যখন উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমা পেরিয়ে যাবে তখন কী হবে? তেলের সর্বোচ্চ সীমা বা 'পিক অয়েল' সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুযায়ী এই সময় থেকেই তেলের দাম দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকবে। সেইজন্যই কোথায় এই সর্বোচ্চ সীমা এবং কবে আমরা সেখানে পৌঁছাব তার আগাম আভাস এত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৯৮ সালে 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকায় ক্যাম্পবেল ও ল্যাহেরেয়ার এর লেখা 'সস্তা তেলের সমাপ্তি' (The End of Cheap Oil) শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তখনও পর্যন্ত উৎপন্ন তেলের পরিমাণ ছিল ৮০ হাজার কোটি ব্যারেল, মাটির নিচে ছিল ৮৫ হাজার কোটি ব্যারেল এবং আরও ১ লক্ষ কোটি ব্যারেল তেল আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, উৎপাদনের হার প্রতি বছর দুই শতাংশ করে বৃদ্ধি পাবে। গত শতাব্দীর নয়ের দশক পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার কার্যকরও ছিল। এইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সারা বিশ্ব তেল উৎপাদনের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে।

এই অনুমান কি সঠিক ছিল? উত্তর হল— না। আজকের তারিখে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে উক্ত প্রবন্ধকাররা ছিলেন মাত্রাতিরিক্ত নৈরাশ্যবাদী। গত দশকে তেলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঝে মাঝে তা কমলেও খুব শীঘ্রই আবার বেড়েছে। তেলের সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ কতটা হতে পারে, সে বিষয়ে ক্যাম্পবেল কোনও হিসাব দেন নি। দিলে, বর্তমান উৎপাদনের পরিমানের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা যেত।

পিটার ওডেল সহ অন্যান্য অনেক লেখকই মনে করেন যে শীর্ষবিন্দু সম্পর্কে দেওয়া যে কোনও পূর্বাভাসই ভুল হয়; কারণ মজুত তেলের পরিমাণ সবসময়েই পরিবর্তনশীল। প্রযুক্তি যত উন্নত হয়েছে, ভূগর্ভস্থ তেলের আবিষ্কার ততই বেড়েছে। শুধু তাই নয়, কোনো একটি আবিষ্কৃত খনিতে কত তেল আছে তার অনুমানও বেড়েছে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে।

১৯৬০ সাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত খনিগুলিতে মজুত তেলের পরিমাণ প্রথমে হিসাব করা হয়েছিল ২০ হাজার কোটি ব্যারেল। ১৯৭০ নাগাদ তা সংশোধন করে হয় ৩০ হাজার

কোটি ব্যারেল। ১৯৯৫ নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩ হাজার কোটি ব্যারেল। ক্যাম্পবেল ধরে নিয়েছিলেন, আমরা ভবিষ্যতে আরও এক লক্ষ কোটি ব্যারেল তেল আবিষ্কার করতে পারব; আজকের প্রচলিত হিসাব মত তা বেড়ে হয়েছে এক লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি ব্যারেল। ওডেলের হিসাব অনুযায়ী চূড়ান্ত মজুত তেলের পরিমাণ ৩ লক্ষ কোটি ব্যারেল এবং তাঁর এই হিসাব শেল (SHELL) এবং ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভের দেওয়া হিসাবের কাছাকাছি। উৎপাদনের বৃদ্ধির হার কম ধরে নিয়ে ওডেল বলেছেন সর্বোচ্চ উৎপাদনের সময় আসবে ২০৩০ সাল নাগাদ। সেই সময়ের মধ্যে যদি কানাডার আলকাতরা মিশ্রিত বালুকা এবং ভেনেজুয়েলার ওরিনোকো অঞ্চল থেকে আরও ৩ লক্ষ কোটি ব্যারেল অপ্রচলিত তেল পাওয়া যায়, তাহলে সর্বোচ্চ উৎপাদনের সময়কে পিছিয়ে দেওয়া যাবে ২০৮০ সাল পর্যন্ত। ওপেক (OPEC) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি যদি তাদের উৎপাদন সীমিত রাখে, তাহলে এই সময় আরও পিছোবে। তাই, ওডেলের মতে, উৎপাদনের শীর্ষবিন্দু নিয়ে চিন্তিত হওয়ার সময় এখনও আসেনি।

৩.৫। তেলের দাম ●

সাতের দশক পর্যন্ত তেলের অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং দাম নিয়ন্ত্রণ করত কয়েকটি নির্দিষ্ট বহুজাতিক সংস্থা, যাদের বলা হত 'সেভেন সিস্টার্স'। এদের মধ্যে চারটি সংস্থা এখনও এই ক্ষেত্রে টিকে রয়েছে। এরা হল - শেল, বিপি, এক্সন মবিল এবং শেভরণ। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিযোগ ছিল। তারা মনে করত, যেসব দেশ তেলের বড় ক্রেতা, তাদের ইচ্ছায় এবং সুবিধার্থে তেলের দাম কমিয়ে রাখা হচ্ছে এবং তাতে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির লোকসান হচ্ছে। ১৯৫১ সালে ইরানে তেল শিল্পের জাতীয়করণ হলেও তাতে বহুজাতিক তেল সংস্থাগুলির আধিপত্য কমে নি। ১৯৬০ সালে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব এবং ভেনেজুয়েলা মিলিতভাবে একটি সংগঠন তৈরি করে যার নাম ওপেক (অরগানাইজেশন অফ দ্য পেট্রোলিয়ম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ)। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল, তেল কোম্পানিগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করা। পরে আরও ন'টি দেশ এই সংগঠনে যোগ দেয়। সাতের দশকে এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশে তেল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হয় । ১৯৭৩ সালে ইয়ম কিপ্পর যুদ্ধের পরে ওপেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি তেলের দাম ব্যারেলপিছু তিন ডলার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ ডলার এবং পরে ১২ ডলার করে। এরপর থেকেই তেলের দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বহুজাতিক তেল সংস্থার পরিবর্তে ওপেক-এর হাতেই চলে আসে। ১৯৭৯ সালে ইরানের শাসক শাহ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেই তেল সরবরাহে বেশ খানিকটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ফলে তেলের দাম বেড়ে ব্যারেলপিছু ৪০ ডলারও অতিক্রম করে যায়। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধি চলে

এবং তারপর ঘটে পতন। কমতে কমতে ১৯৯৯ সালে ব্যারেলপিছু তেলের দাম হয় ৯ ডলার। এরপরই শুরু হয় ঘুরে দাঁড়ানোর পালা।

১৯৭৩ সালের পরে তেল ব্যবহাকারী উন্নত দেশগুলি মরিয়া হয়ে উঠেছিল মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য । যেসব দেশ ও অঞ্চলকে তেলসমৃদ্ধ মনে করা হত না সেইসব জায়গাতে এবার শুরু হল জোরদার অনুসন্ধান । মূলত এই প্রবল উদ্যোগের জন্যই ওপেক দেশগুলির বাইরে আরও বেশি পরিমাণ তেলের সন্ধান পাওয়া যেতে লাগল। এর ফলে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার কথা, কারণ ওপেক দেশগুলির হাতে ছিল সবথেকে উর্বর এবং সুলভ তেলের ভান্ডার। নতুন উদ্যোগে তেল পাওয়া যাচ্ছিল ছোট ছোট খনি, গভীর সমুদ্রতল এবং সাইবেরিয়ার মতো দুর্গম অঞ্চল থেকে—তাই তেল সরবরাহের খরচ বেড়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সুখের কথা, বাস্তবে দেখা গেল তুলনামূলকভাবে তেলের দাম বিংশ শতকের গোড়ায় যা ছিল, শেষভাগেও কিন্তু তাই রইল। প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান আধুনিকীকরণই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছে।

বহুজাতিক তেল সংস্থার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বড় অভিযোগ রয়েছে। যেমন, এরা সংগঠিতভাবে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে বিরোধের বীজ বুনেছে এবং উৎপাদনকারী দেশগুলির স্বার্থ রক্ষা করেনি। এমনকি পরিবেশ রক্ষা অথবা সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারেও তারা যথেষ্ট দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়নি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রযুক্তির আকাশছোঁয়া অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। আটের দশকে জন ব্রাউনের নেতৃত্বে বি পি'র মালিকানায় আসে বৃটেনের নর্থ সি তে অবস্থিত তেলের খনি। তৎকালীন দামে এমন প্রতিকূল পরিবেশ থেকে যে তেল উৎপাদন করা যাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। এর পিছনে ছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং অসম্ভব দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা। চতুর্মাত্রিক (Four dimensional) ভূকম্পীয় নিরীক্ষণ এবং আরও বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আমরা আরও ভালভাবে শিখেছি খনির গভীরে থাকা তেলের চরিত্র। খননপ্রক্রিয়ায় উন্নতির ফলে তেল অনুসন্ধান এবং উৎপাদনের খরচও কমেছে। গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে তেল উৎপাদনের প্রযুক্তিও তৈরি হয়েছে। বিস্তারিত এবং সুচিন্তিত এই গবেষণার গরিষ্ঠাংশ ব্যয়ভারও বহন করেছে এই সংস্থাগুলিই। সরকারি তহবিল থেকে খরচ হয়েছে নামমাত্র।

প্রকৃতপক্ষে, এক শতক ধরে মুদ্রাস্ফীতি বাদ দিলে তেলের দাম প্রায় অপরিবর্তিতই ছিল। কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকেই হঠাৎ এই তেলের দাম বাড়তে থাকে । ২০০৮ সালে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। ১৯৮০ সালের পরই বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এই দামের পূর্বাভাস দেন, কিন্তু তাঁরা ভেবেছিলেন এই দাম আসবে ১৯৯৯-২০০০ নাগাদ। এই ভবিষ্যৎবাণী সঠিক প্রমাণিত না হলেও, যতবারই তেলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, ততবারই এই 'ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার' দামের আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়েছে। ২০০৫ সালে গোল্ডম্যান স্যাকস-এর ভবিষ্যতবাণী ছিল —

প্রতি ব্যারেল তেলের দাম বেড়ে হবে ১০৫ ডলার। এই পূর্বাভাসও সত্যি হয়নি। ২০০৬ সালের আগস্টে দাম বেড়ে হয় ৭৮ ডলার প্রতি ব্যারেল, কিন্তু তারপরই কমতে কমতে সেই বছরেরই ডিসেম্বরে তা নেমে যায় ৫৬ ডলারে। ২০০৭ সালে তেলের দাম ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। ২০০৮ সালের ৬ জুন, ইজরায়েলের এক সরকারি মুখপাত্র হুমকি দেন যে, ইরানের পরমাণু কেন্দ্রগুলি বোমা মেরে ধ্বংস করে দেবে ইজরায়েল। এরপরই তেলের দাম উঠে যায় ১৪৭ ডলার প্রতি ব্যারেল, তবে ক্রমে তা আবার কমতেও থাকে।

ভবিষ্যতে তেলের দাম কত হবে তা বলা যেমন কঠিন,ঠিক তেমনই অতীতের সঠিক দাম বলাও ততটাই কঠিন। সারা বিশ্বে বিভিন্ন শোধনাগার এবং ব্যবসায়ীদের কাছে যে অশোধিত তেল বিক্রি হয়, তার কোনও নির্দিষ্ট দাম নেই। একেকটি সংস্থার ক্ষেত্রে তা একেকরকম। বেচা-কেনার এই চুক্তিও থাকে গোপন। কিছু ক্রেতা এবং বিক্রেতা স্বেচ্ছায় 'প্ল্যাটস' (Platts)-এর মত সংস্থার কাছে তাদের দামের কথা জানায়। 'প্ল্যাটস' এইসব দাম বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে একটা গড় দাম নির্ধারণ করে। এই সংস্থা দৈনিকভাবে এই দাম প্রকাশ করে যা আমরা জানতে পারি। কিন্তু এই পর্যালোচিত দামও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। সৌভাগ্যবশত, এই পর্যলোচনা এবং হিসাব সব অশোধিত তেলের ক্ষেত্রে আলাদা করে করা প্রয়োজনীয় নয়। বেশিরভাগ অশোধিত তেলের দামই ধার্য করা হয় তিন ধরনের তেলের মাপকাঠিতে। এগুলি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট বা ডব্লিউ টি আই, ব্রিটেনের নর্থ সি-র ব্রেন্ট এবং দুবাই-এর অশোধিত তেল।

দাম নির্ধারণে যতই অনিশ্চয়তা থাকুক না কেন একটা ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই। তা'হল ২০০০ সালের পর থেকে তেলের দাম ক্রমাগত বেড়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে চাহিদা ও যোগানের মৌলিক তত্ত্বগুলি। যে কোনো দেশের তেলের চাহিদা বাড়ে তার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সঙ্গেই। একুশ শতকে মার্কিন অর্থনীতির সাম্প্রতিক সঙ্কটের আগে পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। জাপান সহ ও ই সি ডি গোষ্ঠীর দেশগুলির অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। ভারত ও চীন সহ বি আর আই সি (BRIC) দেশগুলিতেও উৎপাদনের হার বাড়ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে— তাই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তেলের চাহিদাও। তেলের দৈনিক চাহিদা বছরে ১৫ লক্ষ ব্যারেল করে বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যারেল। সারা বছরের মধ্যে গ্রীষ্মকালে তেলের চাহিদা বাড়ে কারণ লম্বা পথ পেরিয়ে ছুটি কাটানোর জন্য বেরিয়ে পড়েন অনেকেই। আবার, প্রবল ঠান্ডায় গরম থাকার জন্যও প্রয়োজন তেলের। চাহিদার এই মরশুমি পরিবর্তনের সঙ্গে তেলের দামও ওঠা-নামা করতে থাকে। গোটা বিশ্বে উৎপাদিত তেলের এক চতুর্থাংশই খরচ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাই ঋতুনির্ভর বা দীর্ঘকালীন — সেদেশে চাহিদার গতি সবসময়েই তেলের দামের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। যে কোনো বিপর্যয়ের কারণে এই চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে যাতে তেলের দাম

বাড়িয়ে না দেয় তার জন্য মার্কিন সরকার ৫৮ কোটি ব্যারেলের একটি ভাণ্ডার তৈরি করেছেন। মার্কিন দেশ এই ভান্ডার থেকে খরচ করলে আন্তর্জাতিক বাজারের ঊর্ধ্বমুখী গতিকে কিছুটা শান্ত করে। ২০০৫ সালে বিধ্বংসী ঝড় 'ক্যাটরিনা'র ফলে যখন মেক্সিকো উপসাগরে তেলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল,তখন এই ভান্ডার থেকে জমা তেল ব্যবহার করা হয়েছিল। আবার, ২০১০ সালে মিশরের রাজনৈতিক সঙ্কটের সময়েও তা ব্যবহার করা হয়। তবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তেল সরবরাহের সমস্যার মোকাবিলা করতেই এই জমা তেল খরচ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারকে প্রভাবিত করতে অথবা ওপেক দেশগুলির আধিপত্য বন্ধ করতে এই তেল কখনও ব্যবহৃত হয়নি।

তেলের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত তেলের যোগান হচ্ছে না কেন? ওপেক দেশগুলি স্বেচ্ছায় তাদের উৎপাদনকে লাভজনক একটি মাত্রায় নির্দিষ্ট করে রেখেছে। ওপেক গোষ্ঠীর বাইরের দেশগুলির ক্ষেত্রে তেল অনুসন্ধান ও উৎপাদনের পথে অনেকগুলি বাধা। যেমন - বহু ব্যবহৃত খনিগুলি থেকে উৎপাদন কমে যাওয়া, পরিবেশ রক্ষার কঠোর আইনের ফলে নতুন খনি অনুসন্ধানে বাধা এবং সমুদ্রের গভীরে অথবা অন্যান্য দুর্গম অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের অসুবিধা। এরমধ্যে ব্যতিক্রম শুধু রাশিয়া ও ব্রাজিল। সাম্প্রতিককালে রাশিয়া ও ব্রাজিলের উৎপাদন অনেকখানি বেড়েছে।

নয়ের দশকে, বাড়তি উৎপাদনের ক্ষমতাই তেলের দাম নিয়ন্ত্রিত রাখতে সাহায্য করেছে। এখন আর সেই অবস্থা নেই, যার ফলে যে কোনও সঙ্কটেই তেলের দাম বেড়ে যায়। অশোধিত তেলের ৫০ শতাংশই আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি হয়। আন্তর্জাতিক জলপথ বা পাইপলাইনে যে তেল সরবরাহ হয়, তা যে কোনও সঙ্কট বা সংঘাতেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। গত কয়েকবছরে আফগানিস্তান, ইরাক, নাইজিরিয়া, ইয়েমেন এবং লেবাননের রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে তেলের দাম বেড়েছে বহুবার। কুর্দ এবং তুর্কিদের মধ্যে সংঘাত, বাকু-জেহান পাইপলাইনে আক্রমণের আশঙ্কা এবং ইরানের উপর মার্কিন বোমার রক্তচক্ষু — এইসব আন্তর্জাতিক অস্থিরতা প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে তেলের দামে। ২০০৯ সালের মন্দার প্রভাবকে মুছে দিয়েছে মিশর, সিরিয়া এবং লিবিয়ার রাজনৈতিক সঙ্কট।

৩.৬। আগামীকালের বাজার ●

আগের আলোচনাতে তেলের আগাম বাজার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয় নি। কিন্তু তেলের দাম সম্পর্কে কোনও পর্যালোচনা করতে হলে, সম্ভবত আগাম বাজারের কথা মাথায় রাখা উচিত। এই বাজার যাতে শুধু তেল উৎপাদক এবং ক্রেতাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তা দেখার দায়িত্ব রেগুলেটরের। ২০০৬ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বাজারের অনেকটাই চলে যায় রেগুলেটরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই সময় বেশ কিছু পেনশন ফাণ্ড এবং অন্যান্য ফাটকাবাজ এই বাজারে প্রবেশ করে এই বাজারকে নিজেদের মুনাফার

জন্য ব্যবহার করতে থাকে। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, ফাটকাবাজির জন্যই তেলের এই নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধি। তা না হলে, কেবল চাহিদা ও যোগানের সাধারণ অঙ্কে এত কম সময়ে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৫০-৬০ ডলার থেকে বেড়ে ১৪৭ ডলার হতে পারে না। ২০০৮ সালে দেওয়া এক বিবৃতিতে ভারতের পেট্রোলিয়ম সচিব বলেন, আগামবাজারের ফাটকাবাজির জন্য ব্যারেল প্রতি তেলের দাম কমপক্ষে ৬০ ডলার বেড়েছে। তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, ঠিক যেমন রয়েছে ভারতের চাল-ডাল-তেলের আগাম বাজারের বিষয়ে।

বর্তমানের এই মূল্যবৃদ্ধি কি সাময়িক, না কি এই ধারাই চলবে? তেলের উৎপাদন এখনও শীর্ষে পৌঁছায়নি—কাজেই আজকের মূল্যবৃদ্ধি সে কারণে নয়। এই কিছুদিন আগেও ওপেক দেশগুলির ঘোষিত লক্ষ্য ছিল তেলের দাম ২২ থেকে ২৮ ডলার প্রতি ব্যারেল রাখা। তার আগে ধরা হত, দূর ভবিষ্যতে তেলের দাম হবে ১৮ থেকে ২০ ডলার প্রতি ব্যারেল। বর্তমানে আগাম বাজারের দূর ভবিষ্যতের দাম হল ব্যারেল পিছু ৬০ ডলারের কাছাকাছি। তা হলে ব্যারেল পিছু ৫০-৬০ ডলার দামেই কি স্থিতীশীল হবে তেল শিল্প?

যে দামে অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় তেল সরবরাহ করা যাবে, তাকেই স্থিতিশীল দাম বলা যায়। বর্তমানে তেলের চাহিদা দৈনিক ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যারেল। ২০৩০ সাল নাগাদ তা বেড়ে সাড়ে এগারো কোটিতে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করতে বছরে আনুমানিক ৮ হাজার থেকে ৯ হাজার কোটি ডলার লগ্নি প্রয়োজন। ব্যারেলপিছু ৫০ থেকে ৬০ ডলার দাম পাওয়া গেলেই এই বিনিয়োগ সম্ভব। ওপেক গোষ্ঠীর দেশগুলি এবং বেশ কয়েকটি উৎপাদক সংস্থা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার কাজ শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও সম্প্রসারিত করার কথাও বলেছে। এইসব প্রকল্পের প্রত্যাশিত উৎপাদন হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্টই আশাপ্রদ। তবে এইসব প্রকল্পের কাজ সময়মতো সম্পূর্ণ হওয়া এবং তাদের প্রত্যাশিত উৎপাদনক্ষমতা অর্জন করার ব্যাপারে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রয়েছে। প্রকল্পগুলির কাজ যদি শেষ না হয়, অথবা তাতে দেরি হয়, তাহলে তেলের দাম বাড়বে, যতক্ষণ না কোনও বিকল্প শক্তি সাধারণের ব্যবহারযোগ্য হয়ে বাজারে আসে।

৩.৭। তেলের রাজনীতি ●

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, উৎপাদন ও সরবরাহের নানারকম অসুবিধা অথবা বাজারের নানা ঘোর-প্যাঁচ সত্ত্বেও তেল শিল্পের অগ্রগতি কিন্তু যথেষ্ট সন্তোষজনক। ২০০৯ সালে প্রতিদিন প্রায় আট কোটি ব্যারেল তেল উৎপন্ন হত। এরমধ্যে মধ্যপ্রাচ্য উৎপাদন করত দু'কোটি ৪০ লক্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৭০ লক্ষ, ইউরোপ এক কোটি ৭০ লক্ষ, যার মধ্যে রাশিয়া একাই উৎপাদন করত এক কোটি ব্যারেল। বৃটেনের নর্থ সির খনিগুলি থেকে আগে দৈনিক ২৬ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদন হত। বর্তমানে তা কমে ১৪ লক্ষ ব্যারেলে

পৌঁছেছে। সারা বিশ্বে রপ্তানির পরিমাণ দৈনিক তিন কোটি ব্যারেল। এর গরিষ্ঠাংশই আমদানি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— দৈনিক এক কোটি দশ লক্ষ ব্যারেল। ক্রেতার তালিকায় এরপরেই আসে ইউরোপ। এখানে আমদানি হয় মূলত সাবেক সোভিয়েত ইউইনয়নের দেশগুলি এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে। অশোধিত তেল ছাড়াও অন্যান্য পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্যের দৈনিক বাজার এক কোটি ৫০ লক্ষ ব্যারেল। ক্রেতাদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ। রপ্তানিকারী দেশগুলির অন্যতম হল মধ্যপ্রাচ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলি এবং সিঙ্গাপুর।

তেল সরবরাহের আধার বা বাহকও আছে নানা মাপের। বৃহত্তম আধার বা আল্ট্রা লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার (ULCC) একসঙ্গে ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল বহন করতে পারে। এর পরেই আছে ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার (VLCC) যা ১০ থেকে ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল বহন করতে পারে। পেট্রোল-ডিজেল বা কেরোসিন বহনের জন্য রয়েছে ছোট জাহাজ যেমন প্যানাম্যাক্স, সুয়েজম্যাক্স ইত্যাদি যারা এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ ব্যারেল বহন করে। সবে মিলে প্রতিদিন পাঁচ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যারেল অশোধিত তেল এবং পেট্রোল ও পেট্রোলিয়মজাত নানা পণ্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সরবরাহ করে। তেলের বাজার চায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে—চায় না কোনো দেশ রাজনৈতিক কারণে তেলের উৎপাদন, বেচা-কেনা বা পরিবহনে কোনো বাধা দিক অথবা তেলবাহী জাহাজের গতিবিধির উপর কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুক। তেলের বাজার শুধু একটিই গতিসূত্র মেনে চলতে চায় — তেল সেখানেই যাবে, যেখানে তার দাম সবথেকে বেশি।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই বাজারের ভিত্তি সেই রাষ্ট্রক্ষমতারই উপর। তেলের আন্তর্জাতিক বাজার বেশিদিন তার স্বাভাবিক ছন্দে চলতে পারত না, যদি না মার্কিন নৌবাহিনীর বিশ্বব্যাপী টহলদারি থাকত। তেলবাহী জাহাজের জন্য গোটা বিশ্বকে নিরাপদ এবং অনুকূল রাখার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান অনস্বীকার্য। মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে সে দেশের তেল কোম্পানিগুলির বিশেষ সুবিধা হয়েছে একথা যেমন সত্যি, তার সঙ্গে এটাও সত্যি যে এতে সামগ্রিকভাবে তেল শিল্পও উপকৃত হয়েছে। তেলের ভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব থাকার জন্যই দু'টি বিশ্বযুদ্ধেই জয়ী হতে পেরেছে মিত্রশক্তি। ব্রিটেনের তৎকালীন বিদেশ সচিব লর্ড কার্জন (আমাদের অতি পরিচিত লর্ড কার্জন) যথার্থই বলেছিলেন 'তেল তরঙ্গেই মিত্রশক্তির জয়।' ("The Allies floated to victory on a wave of oil") দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন দ্রুততার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সীমানার পুনর্বিন্যাস করে তাদের সমৃদ্ধ তেলের ভান্ডারের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। পরে, মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি ব্রিটিশ কোম্পানিকে হটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তেল উৎপাদন শুরু করে।

আধিপত্যের এই বাণিজ্যে প্রথম আঘাত আসে ১৯৫১ সালে। অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসে ইরান। তার পরিণতি

অবশ্য সুখের হয়নি। ১৯৫৩ সালে সি আই এর মদতপুষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদেগ। এরপর রাজার পদে বসানো হয় বন্ধুপ্রতিম শাহকে। পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ভান্ডারে মার্কিন 'ক্ষমতা' কায়েম রাখতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ইজরায়েল, ইরান এবং সৌদি আরব। তবে, তেল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলিকে তাতে পুরোপুরি দমিয়ে রাখা যায়নি। আমরা আগেই দেখেছি, ১৯৬০ সালে আরব দেশগুলি সম্মিলিতভাব ওপেক নামের সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯৭৩ সালে ইয়ম কিপ্পর যুদ্ধের পরে, ইজরায়েলকে সাহায্য করার প্রতিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডসে তেল সরবরাহে উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ওপেক। সেই প্রথম, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পেট্রোলিয়মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে, তেলের বাজারে এক মৌলিক পরিবর্তন আসে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমি দুনিয়ার শিল্পোন্নত দেশগুলি সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হয়। অন্তত একবার, যুদ্ধের পথে পা না বাড়িয়ে তারা বাধ্য হয় 'নৈতিক' পথের সন্ধান করতে। প্রেসিডেন্ট কার্টারের ভাষায়, এ হল দ্য মরাল ইক্যুইভ্যালেন্ট অফ ওয়ার। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে শিল্পে প্রয়োজনীয় শক্তির ব্যবহার কমিয়ে আনা, অন্যত্র তেলের অনুসন্ধান আর বিকল্পশক্তির বিকাশের উপর জোর দেওয়ার সূচনা। বদলাতে থাকে বিশ্বজুড়ে তেল ব্যবহারের মানচিত্র।

ভারত এবং এই নিষেধাজ্ঞা ●

ওপেক দেশগুলির এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় কি ভারতও ছিল? এও কি সম্ভব ? প্রকাশ কারাতও হয়তো ১৯৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতকে এক পঙক্তিতে বসাতেন না!

আমাদের দেশের এক অবসরপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট সচিব এস এস খেরা তাঁর 'অয়েল রিচ ম্যান পুওর ম্যান' বইতে লিখেছেন, ভারতকে এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতায় এই সিদ্ধান্ত বদলায়। এর মূলে কি ছিল ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধ? এর বিশদ ব্যাখা খেরা সাহেব দেন নি।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সঙ্কটের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে ইরানের শাহ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে মার্কিন বিরোধী হয়ে ওঠে ইরান। অতঃপর ইরানকে সংযত রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মদত দিতে শুরু করে ইরাকের সাদ্দাম হুসেনকে। ১৯৯১ সালে সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ করেন। কুয়েতের বিশাল তেলের ভাণ্ডার ছাড়াও সৌদি আরবের দিকেও তার নজর ছিল। সাদ্দামকে অবশ্য ঠিক সময়ে প্রতিহত করেছিল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর টেলিভিশনের পর্দায় সেই যুদ্ধ আমরা দেখেওছি। বিশ্বের প্রথম পরিবেশিত সেই 'টেলিভিশন যুদ্ধ'-এর খরচ জুগিয়েছিল সৌদি আরব। দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধের সময় তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ জরুরি ছিল যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করতে, জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে। পারসিং ও ক্রুজ মিসাইলের যুগে সে প্রয়োজন কমেছে; তেল এখন কাজে লাগে এস ইউ ভির চাকা সচল রাখতে। তেলের জন্য যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি, সহজে শেষ হবেও না।

১৯৯১ সালের মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের পর এক দশক ধরে তেলের দাম কম ছিল। বাজার চলছিল 'আদর্শ' পথে। নাম করা পত্র-পত্রিকায় শক্তি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রবন্ধ বা রচনার সংখ্যা কমছিল উল্লেখযোগ্যভাবে। রাজনীতির কূটকৌশলের থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল অর্থনীতি। আরব নয়—ভর্তুকিকেই মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছিল। ভর্তুকির সঙ্গে লড়াইয়ে নৌবাহিনী অসহায়, এই দায়িত্ব দেওয়া হল আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলিকে যারা প্রবর্তন করলেন সেই উদারনীতি—অর্থনীতিবিদ জন উইলিয়ামসন যাকে ওয়াশিংটন কনসেনসাস নামে অভিহিত করেন।

২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দেয় আল কায়দা। এর পরবর্তী পর্যায়ে তেলের দাম প্রথমে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় এবং তারপরই বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্য গতিতে। তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি অতীতের সব রেকর্ডই ছাপিয়ে যায়। এই লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির অন্তত একটি লাভের দিক হল, এর ফলে তেল অনুসন্ধান এবং উৎপাদনে লগ্নির পরিমাণ বাড়ল উল্লেখযোগ্যভাবে। আর ক্ষতির দিক হল, এর ফলে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত দেশগুলির হাতে পোঁছে গেল আরও বেশি অর্থ। আবার তলব হল নৌবাহিনীর!

২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মূল উদ্দেশ্য ছিল সে দেশের তেলের ভান্ডার অধিকার করা। ইরাকে যদি বন্ধু সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা হলে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলি সেখানে তেল উৎপাদন করবার সুযোগ পাবে। হিসাব কষা হয়েছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই দৈনিক ৭০ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদন করা যাবে। ওপেক দেশগুলির নিয়ন্ত্রণের বাইরে এত পরিমাণ তেল উৎপাদন হলে তা ওপেকের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। বিশেষজ্ঞরা মনে করেছিলেন, তেলের দাম কমে ব্যারেলপ্রতি ১৪ ডলার হয়ে যাবে। বাস্তবে কিন্তু আমেরিকাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দীর্ঘ ন'বছর পর এখন মনে হচ্ছে, আমেরিকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে চলেছে।

তেল-রাজনীতি নিয়ে কোনও আলোচনাই সম্পূর্ণ হবে না রাশিয়ার পশ্চাদবর্তী দেশগুলির উল্লেখ না করলে। কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান এবং আজারবাইজানে প্রচুর পরিমাণ তেল এবং গ্যাস মজুত আছে। এইসব সম্পদ

চাপা পড়ে গেছে ইরান এবং বৃহত্তর রাশিয়ার সম্পদের আড়ালে। এই অঞ্চলকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি। তুলনামূলক এই অনুন্নয়নের পিছনে রয়েছে এই অঞ্চলের অবস্থানগত সীমাবদ্ধতা। এই অঞ্চলের চর্তুদিকেই রয়েছে স্থলভাগ। তাই এখান থেকে তেল পরিবহন করতে হলে এমন পাইপলাইনের প্রয়োজন যা বিভিন্ন উপদ্রুত অঞ্চল অথবা দেশের মধ্য দিয়ে যাবে। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও, এই অঞ্চলকে মধ্যপ্রাচ্যের বিকল্প এক তেলসমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। ফলে, তেলের সঙ্কটের পর এই এলাকার গুরুত্বও বেড়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই শেভরন এবং এক্সন সংস্থা এই অঞ্চলে অনুসন্ধান ও উৎপাদনের কাজ শুরু করেছে। কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি বছরের অনুসন্ধানের পরেও কেউ একথা বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে এই অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্যের মতো সমৃদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের ৭৫,০০০ কোটি ব্যারেলের প্রমাণিত মজুতের তুলনায়, এখানকার প্রমাণিত মজুত ২০,০০০ কোটি ব্যারেল হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

রাশিয়া সবসময়েই মনে করেছে এই অঞ্চলের সম্পদ তাদের নিজস্ব। কিন্তু মার্কিন সংস্থাগুলি এখানে সেদেশের কর্তৃত্ব কায়েম করতে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে। কাস্পিয়ান অঞ্চলে প্রাপ্ত তেল পরিবহন করতে হলে রাশিয়া অথবা ইরানের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তথ্য প্রমাণ করতে বাকু-বিলিসি-জেহান পাইপলাইন নির্মাণে সহায়তা করেছে। চারশ কোটি ডলার খরচ করে এই পাইপলাইন নির্মাণ করেছে বি পি। বর্তমানে এর মাধ্যমে প্রতিদিন ১০ লক্ষ ব্যারেল তেল পরিবহন করা হচ্ছে। পরে এই পরিমাণ আরও বাড়ানো যাবে যদি কাজাখস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান এই পাইপলাইন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। তেল পরিবহনের জন্য জর্জিয়াকে চড়া হারে শুল্ক দেওয়ার ফলে জার্জিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং রাশিয়ার সঙ্গে জর্জিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতের এটি একটি অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

তেলের উৎপাদন শীর্ষে পৌঁছলে কি তেলের খনি দখল এবং নিজেদের জন্য তেল সংরক্ষণ নিয়ে ক্ষমতাধর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে লড়াই শুরু হবে? অনেক বিশেষজ্ঞই এই ধরনের যুদ্ধের ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। কিন্তু এই পরিণতি যে অবশ্যম্ভাবী তা বলা যায় না। যুযুধান যে কোনও দেশ যদি যুদ্ধের দ্রুত অবসান চায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে তেলসম্পদ দখল করে তাকে শত্রুর নাগালের বাইরে রাখতে চাইবে। কিন্তু শান্তির সময়ে যে কোনও দেশই দীর্ঘকালীন লাভ ক্ষতির হিসাব করে। তাই তখন এই তেলসম্পদ দখল করার বিষয়টি অর্থহীন। বিশ্বের কোনও দেশই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। যে কোনও দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে তার বাণিজ্যিক সহযোগী অপর দেশগুলির সমৃদ্ধির উপর। আবার সেই সহযোগী দেশের সমৃদ্ধিও নির্ভর করে অন্য আর একটি বা একাধিক দেশের উপর। এইভাবেই তৈরী হয় পারস্পারিক নির্ভরতার বৃত্ত। উদাহরণ হিসাবে বলা

যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি শুধু সে দেশে আসা তেলের পরিমাণের উপরেই নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার দেড় লক্ষ কোটি ডলারের বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখার উপরেও। যদি কোনো কারণে আমদানিকারী দেশগুলি মার্কিন পণ্য এবং পরিষেবা কিনতে অক্ষম হয়, তাহলে লক্ষ লক্ষ মার্কিনি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে। নড়ে যাবে মার্কিন অর্থনীতির ভিত।

তেলসম্পদ ও তার বিতরণের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্বল্প সময়ের জন্য কার্যকর হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সক্রিয় রাখতে হবে তেলের বাজার। এক দেশের তেলসম্পদের উপর অন্য আর একটি দেশের আধিপত্যের ফলে কয়েকটি তেল কোম্পানি লাভবান হতে পারে, কিন্তু উৎপাদিত তেল সেখানেই যাবে যেখানে ক্রয়ক্ষমতা আছে। এই কারণেই ইরাকে মার্কিন হস্তক্ষেপের পিছনে সমস্ত তেল ব্যবহারকারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল। আর এই কারণেই হয় তো এ'টি ভবিষ্যতের জন্য একটি মডেল হয়ে রইল। কোনো দেশ যদি তার তেলের সম্পদ 'বিশ্বের' জন্য উন্মুক্ত করতে অস্বীকার করে, 'বিশ্বশক্তিরা' চাঁদা তুলে তার মোকাবিলা করতে পারেন—নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন।

৩.৮। তেল ও পরিবেশ ●

তেলের উৎপাদন, শোধন, পরিবহন ও ব্যবহার যাতে পরিবেশের ক্ষতি না করে, তার জন্য প্রথমেই চাই সুরক্ষা। অর্থাৎ তেলের খনি বা শোধনাগার, বড় ট্যাঙ্কার বা পাইপলাইনকে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচানো। আমাদের দেশের মথুরা শোধনাগারের কথাই ধরা যাক। এখানে বছরে ৮০ লক্ষ টন অশোধিত তেল শোধন করা হয়। এই মাপের একটি শোধনাগারে যে কোনও সময়েই বেশ কয়েক লক্ষ টন অশোধিত পেট্রোলিয়ম এবং পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্য মজুত থাকে। এইরকম একটি শোধনাগারে আগুন লাগলে তা বিধ্বংসী হতে পারে আর কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে পরিবেশ দূষিত হতে পারে। তেলবাহী জাহাজ বা ট্যাঙ্কার থেকে তেল পড়ে তা সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে গেলে পরিবেশের ক্ষতি ভয়াবহ। ১৯৮৯ সালে এক্সন ভ্যালডেজ নামে এক তেলবাহী জাহাজ আলাস্কার কাছে ডুবে যাওয়ায় জাহাজ থেকে সাড়ে সাত লক্ষ ব্যারেল তেল ছড়িয়ে যায় সমুদ্রের জলে। এর ফলে, বহু সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণীর মৃত্যু হয়। বেশ কয়েক বছর এই বিষের প্রভাব ছিল। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে মেক্সিকোর উপসাগরে বি পি-র এক তেলের খনিতে বিস্ফোরণ ঘটে এবং ৫০ লক্ষ ব্যারেল তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে তেলও ছড়িয়ে যায় কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং প্রাণ হারায় লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক প্রাণী ও মাছ। সেই তেল

পরিষ্কার করা এবং ক্ষতিপূরণ খাতে কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয়েছে।

শোধনাগারে আগুন বা তেল ছড়িয়ে পড়ায় পরিবেশ যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি করে পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্যের ক্রমাগত উৎপাদন ও ব্যবহার। এ ব্যাপারেও মথুরার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এখান থেকে নির্গত সালফার অক্সাইড তাজমহলের ক্ষতি করছে এই অভিযোগ করেছিলেন পরিবেশবিদরা। নয়ের দশকের মধ্যভাগের পর থেকে এই অভিযোগ আর ওঠেনি; কারণ, বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে নিষ্কাশনের জন্য সুচিন্তিত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিল শোধনাগার কর্তৃপক্ষ। অথবা ধরা যেতে পারে গাড়ির ইঞ্জিনের কথা। অন্তর্দহন ইঞ্জিনকে উন্নত করে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে — স্পার্ক ইগনিশন এবং কমপ্রেশন ইগনিশন। সহজভাষায় বলতে গেলে পেট্রোল ইঞ্জিন এবং ডিজেল ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের চাহিদা অনুযায়ী অশোধিত পেট্রোলিয়ম থেকে উৎপন্ন হল — পেট্রোল এবং ডিজেল। ডিজেল ইঞ্জিনের সুবিধা হল, এটি অন্য ধরনের খনিজ এবং উদ্ভিজ তেলেও চলে। কিন্তু পেট্রোল ইঞ্জিনের জন্য হালকা এবং উদ্বায়ী তেলই প্রয়োজন। ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে পেট্রোল ইঞ্জিনের দু' দশক পরে; এটি আরও শক্তিশালী ও দক্ষ। পেট্রোল ইঞ্জিনের শক্তি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে হাত লাগিয়ে বিশেষজ্ঞরা দেখলেন, এর জন্য যন্ত্রের নকশা এবং জ্বালানির মান দুইই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেইমত, শোধনাগারগুলিতেও আরও উন্নতমানের পেট্রোল তৈরির ব্যবস্থা শুরু হল যাতে তা আধুনিক মানের ইঞ্জিনে ব্যবহার করা যায়। উচ্চমানের এই পেট্রোল তৈরিতে যে সব রাসায়নিক যোগ করা হল তাতে ফের বাড়তে শুরু হল পরিবেশ দূষণ। তবে, উন্নতমানের নতুন এই পেট্রোল যাতে পরিবেশ-বান্ধব হয়ে ওঠে সে ব্যাপারে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে।

গাড়ি, বাস অথবা ট্রাকের ধোঁয়াই শহরাঞ্চলে বায়ুদূষণের প্রধান উৎস। বিভিন্ন দেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তাই এ ব্যাপারে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। বিশেষ করে গাড়ির ধোঁয়ায় ক্ষতিকর রাসায়নিকের অনুমোদনযোগ্য পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য আরোপ করা হয়েছে কঠিন আইন। ক্ষতিকর এই রাসায়নিকের মধ্যে আছে কারবন মনোক্সাইড, বেনজিন, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং অ্যালডিহাইড। আধুনিক গাড়ির ইঞ্জিনে 'ক্যাটালিটিক কনভার্টার' অনুঘটকের সাহায্যে এই ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থগুলিকে বাইরে বেরোবার আগেই বদলে দেয়। অনুঘটক হিসেবে যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, তা আবার সিসা এবং সালফারের সংস্পর্শে এলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগে সিসার একটি যৌগ পেট্রোলের সঙ্গে যোগ করা হত। কিন্তু এখন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই তা নিষিদ্ধ। ভারতে সিসার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে ১৯৯৫ সালে। বর্তমানে ভারতের চারটি মহানগরী এবং অন্যান্য বড় শহরে ইউরো ৪ মানের

এবং দেশের বাকি অংশে ইউরো ৩ মানের পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়।

পরিচ্ছন্নতা অথবা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কোনটি বেশি উপযোগী—পেট্রোল না ডিজেল? ডিজেল গাড়ির নির্মাতারা বলেন কর্মদক্ষতায় ডিজেল ইঞ্জিন এগিয়ে, তাই পরিবেশদূষণও কম। ডিজেলের ধোঁয়ায় বেনজিনের মতো সাইক্লিক হাইড্রোকারবন নেই, কিন্তু পেট্রোলের ধোঁয়ায় তা আছে। অন্যদিকে, ডিজেলের ধোঁয়ায় অধিক পরিমাণে থাকে NOx এবং বিশেষ ধরনের কিছু অণু যা ফুসফুসের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই নিউইয়র্কে ডিজেল বাসের বিরুদ্ধে শুরু হল প্রচার। মজার সেই বিজ্ঞাপনের প্রতিপাদ্য ছিল—ডিজেল বাসের সামনে থাকলে চাপা নাও পড়তে পারেন, পিছনে থাকলে কিন্তু শ্বাসকষ্টে মারা যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। এই প্রচারে সি এন জি বা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়তে থাকে। বিশ্বের শহরগুলির মধ্যে নয়াদিল্লিতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রাকৃতিক গ্যাস-চালিত বাস আছে।

৩.৯। ভারতীয় প্রেক্ষাপট ●

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ভারতে তেলের খনি ছিল শুধুমাত্র অসমে এবং দেশের একমাত্র শোধনাগারটি ছিল ডিগবয়তে। স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অঞ্চলে তেলের অনুসন্ধান এবং নতুন শোধনাগার গড়ে তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হল। দুটির ক্ষেত্রেই বিদেশি কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন ছিল এবং তাই ভারতের পক্ষ থেকে পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছেও সাহায্য চাওয়া হয়। পশ্চিমের দেশগুলি এতে বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। নতুন শোধনাগার গড়ে তোলার পক্ষে ভারতীয় বাজারকে যথেষ্ট বড় বলে মনে করেনি মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি। শেষে, অনেক আলোচনা-পরামর্শ এবং আবেদনের পর পাঁচের দশকে এসো (ESSO), বার্মা শেল (Burmah Shell) এবং ক্যালটেক্স (Caltex) মুম্বইতে দুটি এবং বিশাখাপত্তনমে একটি শোধনাগার গড়ে তোলে। যেহেতু ইরানে তেলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পরেই এই শোধনাগারেগুলি গড়ে ওঠে, তাই ভারত সরকারকে আশ্বাস দিতে হয় যে, পরবর্তী ২৫ বছরে ভারতে তেলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হবে না। যদিও এই নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরোবার আগেই ভারতে তেলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হয়, কিন্তু তা হয় 'বন্ধুত্বপূর্ণভাবে'। প্রথম তৈরি হওয়া সেই শোধনাগারগুলির মধ্যে বর্তমানে দুটি রয়েছে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়মের এবং একটি ভারত পেট্রোলিয়মের হাতে।

এর পরে, ভারত সরকার গঠিত ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন বিভিন্ন জায়গায় শোধনাগার গড়ে তোলে। যেমন গুয়াহাটি, বরোনি, হলদিয়া, পানিপথ, মথুরা এবং

কোয়ালি। এর মধ্যে দুটি শোধনাগার তৈরি করতে সাহায্য করেছিল রোমানিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর পরে শোধনাগার তৈরির জন্য ভারতের নিজস্ব দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল। নয়ের দশকের আগে পর্যন্ত ভারতে কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকেই শোধনাগার তৈরি করার অনুমোদন দেওয়া হত। কিন্তু পেট্রোল এবং পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় শোধনাগারের সংখ্যা বাড়েনি। তাই নয়ের দশকের মাঝামাঝি, বেসরকারি উ্যদ্যোগে শোধনাগার গড়ে তোলার অনুমোদন দেয় ভারত সরকার। এই সিদ্ধান্ত সব দিক থেকেই যে ফলপ্রসূ হয়েছে তার প্রমাণ বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বৃহৎ ক্ষমতাসম্পন্ন শোধনাগারগুলি। ফলে, বেড়েছে ভারতের উৎপাদন ক্ষমতাও। জামনগরে বিশ্বের বৃহত্তম শোধনাগার গড়ে তুলেছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। এর ক্ষমতা বছরে ছয় কোটি টন। হাজিরাতে এক কোটি ৪০ লক্ষ টন ক্ষমতাসম্পন্ন এক শোধনাগার গড়ে তুলেছে এসার গ্রুপ। ভাটিন্ডাতে মিত্তল গোষ্ঠী এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়মের যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে ৯০ লক্ষ টন ক্ষমতাসম্পন্ন এক শোধনাগার। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিও তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। ফলে দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতা পৌঁছেছে ১৮ কোটি টনে। কিছুদিনের মধ্যেই তা ২৪ কোটি টনে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমানে ভারতের শোধনাগারের ক্ষমতা দেশের চাহিদাকেও ছাপিয়ে গেছে। আমাদের প্রয়োজন ১৫ কোটি টন পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্য। এর মধ্যে সবথেকে বেশি চাহিদা ডিজেলের, যার পরিমাণ পাঁচ কোটি টনেরও বেশি। তার মূল কারণ হল আমাদের দেশে ডিজেলের দাম কিছুটা কম রাখা হয়, যেহেতু ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি মন্দা ডেকে আনতে পারে। আমাদের পেট্রোল খরচ হয় এক কোটি ২০ লক্ষ টন। যদিও বর্তমানে চার চাকা ও দু' চাকার গাড়ির জ্বালানি হিসাবে সি এন জি এবং এল পি জি-র চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু সেইসঙ্গে পেট্রোলের চাহিদাও বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে আলো জ্বালানোর জন্য কেরোসিন ব্যবহার হত। কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিকরণের জন্য কেরোসিনের ব্যবহার খানিকটা কমেছে। এল পি জি বা রান্নার গ্যাসের চাহিদা বেড়ে হয়েছে এক কোটি ২০ লক্ষ টন, কারণ গোটা দেশে ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১ কোটির বেশি। আগাম হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫ সালে এই সংখ্যা ১৫ কোটি ছুঁয়ে যাবে। রান্নার গ্যাস আমদানি করে সরকার এবং তাতে ভর্তুকি দিয়েও এর ব্যবহারকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে কারণ জ্বালানি হিসেবে এটি অত্যন্ত পরিবেশ বান্ধব।

শোধনাগারের এই অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার ফলে ভারত এখন পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্যের এক অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক। আশ্চর্যের বিষয় হল, পেট্রোল, ডিজেল, ন্যাফথা বা এল পি জি-র মতো বেশ কয়েকটি পণ্য ভারত একই সঙ্গে আমদানি এবং

রপ্তানি দুই-ই করে। এর কারণ আছে। আমদানিকারীরা এইসব পণ্যের যে মান চায়, তা ভারতে তৈরি হয় না। রপ্তানির কারণ আলাদা। ডিজেল, কেরোসিন এবং এল পি জি-র উপর জাতীয় বাজারে ভর্তুকি দেওয়া হয়— কিন্তু যেসব বেসরকারি সংস্থা এগুলি উৎপাদন করে, তারা এই ভর্তুকির সুবিধা পায় না বলেই আন্তর্জাতিক বাজারে তা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এশিয়ার বাজার এখন ক্রমবর্ধমান। ফলে, ভারতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত পণ্য এই বাজারেই বিক্রি হয়ে যাবে।

ভারতীয় ভূবিজ্ঞানীরা তেলের সন্ধানে ভূকম্পীয় পরীক্ষা শুরু করেন ছয়ের দশকের গোড়ার দিকে। ও এন জি সি এবং ও আই এল এইভাবে ভারতের ২৬টি পাললিক অববাহিকার অধিকাংশকেই পরীক্ষা করে দেখেছে। গুজরাত ও অসমে উপকূল বা স্থলভাগে তেলের অনুসন্ধানে খননকার্যও শুরু হয় ছয়ের দশকে। প্রথম শোধনাগার তৈরির মতো, খননকার্যেও আমাদের সহায়তা করে রোমানিয়া। গোড়ার দিকে এইসব অনুসন্ধান খুব একটা ফলপ্রদ হয়নি। সেই কারণেই তৎকালীন পেট্রোলিয়ম মন্ত্রী কে ডি মালব্যকে অনুসন্ধান প্রকল্প চালু রাখতে যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। স্থলভাগে প্রথম কূপটি খোঁড়া হয়েছিল ১৯৭০ সালে। কিন্তু সেখান থেকে তেল পাওয়া যায়নি। বড়সড় সাফল্য আসে ১৯৭৪ সালে, যখন বম্বে হাই আবিষ্কৃত হয়। মালব্য আবার তখন পেট্রোলিয়ম মন্ত্রী হয়েছেন। তাঁকে যথোচিত সমর্থন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

তেল-শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারত প্রথম থেকেই নির্ভর করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির উপর। আই ও সি, বি পি সি এবং এইচ পি সি র হাতে দেওয়া হয়েছিল বিপণনের ভার। অপরদিকে অনুসন্ধান এবং উৎপাদনের দায়িত্বে ছিল ও এন জি সি এবং ও আই এল। তেল-শিল্পে বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশি সংস্থাগুলিকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় ১৯৯০ এর পরে। অনুসন্ধান সংক্রান্ত নতুন লাইসেন্স নীতি (NELP) অনুসারে প্রকাশ্য টেন্ডারের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলকে অনুসন্ধানের জন্য বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি মাঝারি ও ছোটমাপের তেলের খনিও বেসরকারি সংস্থার হাতে দেওয়া হয়েছে। এমনই একটি খনি হল—রাভা। অন্ধ্রের উপকূলসংলগ্ন সাগরের এই খনিটির দায়িত্ব নেয় কেয়ার্নস নামক সংস্থা। পরে তারা ভারতে বেশ কয়েকটি তেল ও গ্যাসের খনি আবিষ্কার করে।

আন্তর্জাতিক বৃহৎ তেল সংস্থাগুলি ভারতের এই নতুন লাইসেন্স নীতিতে সাড়া না দিলেও এই উদ্যোগ কিন্তু যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। ভারতের প্রমাণিত তেলের মজুত বেড়ে হয়েছে দু'শ কোটি টন। বহু বছর ধরে তিন কোটি টনে আটকে থাকার পর

ভারতের তেল উৎপাদনের পরিমাণ হয়েছে তিন কোটি ৫০ লক্ষ টন। বৃহত্তম উৎপাদনক্ষেত্র বোম্বে হাই। তারপরেই আছে অসম এবং গুজরাতের খনিগুলি। যৌথ উদ্যোগ এবং বেসরকারি সংস্থার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টন। এরমধ্যে কেয়ার্নসের রাজস্থানের খনিগুলিও আছে। দেশের বাজারে বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ জানাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকেও বিদেশে বিনিয়োগের সুবিধা করে দিয়েছে। ফলে, বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া থেকে ভেনেজুয়েলা পর্যন্ত বিশ্বের ১৪টি দেশে আমাদের তেল ও গ্যাসের খনি রয়েছে। এদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৮০ লক্ষ টনেরও বেশি।

দেশের বিভিন্ন খনি থেকে তোলা এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা ১৫ কোটি টন অশোধিত তেল শোধনের জন্য ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা শোধনাগারে যায়। এখান থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য এবার বিপণনের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দেশের সর্বত্র অবস্থিত ৪০ হাজার খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়। তেল পরিবহন পদ্ধতি দিনে দিনে আরও উন্নত এবং নিরাপদ হয়ে উঠছে, কারণ সড়ক অথবা রেলপথের পরিবর্তে দূরপাল্লার পাইপলাইনের সাহায্যেই এখন বাহিত হয় বেশিরভাগ তেল। যদিও এতবড় বন্টনব্যবস্থা পরিচালনা সহজ-সাধ্য নয়, কিন্তু আমাদের তেল কোম্পানিগুলি তা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই করছে।

বর্তমানে ভারতের পেট্রোলিয়ম ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি আলোচিত প্রশ্ন হল - আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারত কি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়াবে? যদি বাড়ায়ও, তাহলে তা কত পর্যন্ত? দেশের পেট্রোলিয়মজাত পণ্যের চাহিদা মেটাতে ভারতকে প্রতি বছর প্রায় ১২ কোটি টন অশোধিত তেল আমদানি করতে হয়। এই বিপুল পরিমাণ আমদানির পরে, মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করা আর সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই গত কয়েকবছরে, আন্তর্জাতিক বাজারে যেমন অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ৩০-৪০ ডলার থেকে বেড়ে ১৩০ ডলার হয়েছে, তেমনই আমাদের দেশেও পেট্রোলিয়মজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বহুবার।

এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বহু যুক্তি পেশ করা হয়। ডিজেল হল পরিবহনের প্রধান জ্বালানি। তাই ডিজেলের দাম বাড়া মানে বেশিরভাগ জিনিসেরই দাম বাড়া। খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে এবং প্রান্তিক লগ্নিও মার খায়। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্ররা। যেসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে সেচের কাজ হয় ডিজেল চালিত পাম্প দিয়ে। তাই ডিজেলের দাম বাড়লে চাষ করা জমির পরিমাণও কমে। আবার,

পেট্রোলের দাম বাড়লে মধ্যবিত্তের হাতে টাকা কমে এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও কমে। এরফলে কর্মহীন হয় বহু মানুষ। এইসব সমালোচনার মুখে পড়ে ডিজেল, কেরোসিন এবং এল পি জি তে সরকার ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি পেট্রোলের উপর ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে আর ডিজেল ও এলপিজির উপর ভর্তুকি অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের বর্ধিত দামের ধাক্কা সামলাতে ভারত সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলিকে কিছু পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছে এবং কর ও শুল্কের হার কমাতেও সম্মত হয়েছে। লোকসানের বাকি অংশটুকুর ভার জনগণকেই বহন করতে হয়, মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে। কিন্তু এই ত্রিপাক্ষিক ভাগ কোনও পক্ষকেই খুশি করেনি। সরকারকে দু'ভাবেই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথমত মূল্যবৃদ্ধির জন্য এবং একই সঙ্গে যথোচিত মূল্যবৃদ্ধি না করার জন্য।

তেল উৎপাদক সংস্থাগুলির লোকসান হোক, এটা কোনওভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু কম আদায় (under recovery) আর লোকসান কিন্তু এক নয়। পেট্রোল উৎপাদনে যদি খরচ হয় ৯০ টাকা আর ন্যায্য লাভ যদি হয় ১০ টাকা, তা হলে দাম হওয়া উচিত ১০০ টাকা। পেট্রোলের ন্যায্য দাম কিন্তু এখন আর উৎপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত নয়। এর কিছু অংশ যুক্ত আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে। এইভাবে ঠিক করা 'ন্যায্য' দাম হতে পারে ১২০ টাকা। তেল কোম্পানি যদি বাধ্য হয় সেই পেট্রোল ১১০ টাকায় বিক্রি করতে তা হলে ১০ টাকা কম-আদায় হলেও লাভ হয় ২০ টাকা। সে কারণেই দেখা যায়, তেল সংস্থার কোনো এক উচ্চ-পদস্থ আধিকারিক আর্থিক বছরের প্রতি চতুর্থাংশের শেষেই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সারা বিশ্বকে জানাচ্ছেন, তারা কত হাজার কোটি টাকা লাভ করেছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির মিলিত লাভ বছরে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। তা হলে প্রশ্ন উঠতেই পারে--এত মুনাফার কী প্রয়োজন?

লগ্নির পরিমাণ বেশি হওয়ার ফলে তেল কোম্পানিগুলির অস্তিত্বরক্ষার জন্য মোটা অঙ্কের মুনাফা প্রয়োজন। অনুসন্ধানই হোক অথবা উৎপাদন কিংবা বিপণন — সর্বত্রই প্রয়োজন বিশাল লগ্নি, যা সবসময় লাভজনক নাও হতে পারে। এছাড়াও উৎপাদনের মান উন্নত করতেও ক্রমাগত লগ্নি প্রয়োজন। এত বড় মাপের লগ্নি করতে হলে লাভও হতে হবে সেইমত! কিন্তু এই লাভের পরিমাণ ঠিক কত হওয়া উচিত তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তাছাড়া, ভারত সরকার পেট্রলিয়ম শিল্প থেকে বছরে প্রায় এক লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করে বিভিন্ন খাতে। এর সবটাই কি উন্নয়নের কাজে লাগে? মূল্যবৃদ্ধি রুখতে না পারলে এই উন্নয়নে কি গরিব লোকেরা উপকৃত হবেন? এই রাজস্বের অর্ধেক ছেড়ে দিলে ডিজেলের দাম কমে লিটারে ১০ টাকারও বেশি। তাহলে সরকারের কোনটা

করা উচিত—ডিজেলের দাম কমানো না উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রকল্পে খরচ বাড়ানো?

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি যে পেট্রোল-ডিজেল ইত্যাদি উৎপন্ন করে তার দাম চিরকালই ঠিক করেছে ভারত সরকার। তবে, এই দাম নির্ধারণের নীতি বদলেছে অনেকবার। বর্তমান নীতি অনুযায়ী, দাম নির্ধারণ হয় অনেকটা এইভাবে—প্রথমে নেওয়া হয় সিঙ্গাপুরে সেই পণ্যের (ধরা যাক পেট্রোল) দাম। এর সঙ্গে যোগ করা হয় মুম্বাই পর্যন্ত জাহাজ-ভাড়া, বীমার খরচ, বন্দরের ব্যয়, আমদানি শুল্ক এবং শোধনাগার পর্যন্ত বহনের খরচ। এই সব মিলে যা হয়, তাকে বলা হয়, শোধনাগার-গেটের দাম (Refinery Gate Price)। ২০০১ সাল পর্যন্ত শোধনাগার গেটের দাম ঠিক হত অন্য ভাবে। শুরু করা হত, মধ্যপ্রাচ্যে অশোধিত তেলের দাম নিয়ে। যোগ হত, এই তেল শোধনাগার পর্যন্ত আনার খরচ এবং পাতন ও শোধনের ব্যয়। আমাদের শোধনাগার যদি সিঙ্গাপুরের শোধানগারের সমান দক্ষ হয় তা হলে এই দুই দাম হওয়া উচিত প্রায় সমান। নতুন ফর্মুলার সুবিধা হল এই যে, এতে আমাদের শোধনাগার বাধ্য হবে সেই দক্ষতা অর্জন করতে। দাম নির্ধারণের পুরানো নীতিকে বলা হত অ্যাডমিনিস্টার্ড প্রাইসিং; নতুন নীতিকে বলা হয় ইমপোর্ট প্যারিটি প্রাইসিং । শোধনাগার থেকে পেট্রোল যায় ডিপোতে—হয় রোড বা রেল-ট্যাঙ্কারে অথবা পাইপলাইনে। ডিপো থেকে পেট্রোল-পাম্পে যাওয়ার একমাত্র উপায় রোড-ট্যাঙ্কার। শোধনাগার গেটের দামে যোগ করা হয় পাম্প পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সব খরচ এবং পাইপলাইন, স্টোরেজ-ট্যাঙ্ক ইত্যাদি সম্পদের উপর ধার্য ন্যায্য লাভ। এইভাবে আমরা পাই পেট্রোলের খুচরো দাম বা রিটেল প্রাইস।

নয়া নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। পেট্রোল যদি আদৌ আমদানি না করা হয়, তা হলে তার দামে আমদানি-শুল্ক কেন থাকবে? সমুদ্রপথে বীমার খরচ বাড়লেও পেট্রোলের দামের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়? শুধু তাই নয়, জাহাজে যেটুকু পেট্রোল বাষ্প হয়ে উড়ে যায় (Ocean loss) তার দামও কেন ধরা থাকবে শোধনাগার গেটের দামে?

এসব প্রশ্নের উত্তর এই দেওয়া হয়ে থাকে যে, ক্রেতা যদি দেশজ পেট্রোল না কিনে নিজেই আমদানি করেন, তা হলে তাকে এই খরচগুলি বহন করতে হবে। এই জটিল প্রশ্নে সহজে ঐকমত্য হওয়ার নয়। কাজেই দাম নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক থেকেই গেছে।

সিঙ্গাপুরে পেট্রোল আর ডিজেলের দাম প্রায় সমান। এই পণ্যগুলির বিতরণ এবং বিপণনও হয় একসঙ্গে, এবং বিপণনের খরচও প্রায় সমান। তাহলে ভারতীয় বাজারে এই দুই জ্বালানির দামের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? এর কারণ হল, তেল কোম্পানিগুলি এখন পেট্রোলের সম্পূর্ণ খরচই উসুল করতে পারে— কিন্তু ডিজেলের ক্ষেত্রে সরকার তা করতে দেয় না। কেরোসিনের ক্ষেত্রেও একই নীতি কার্যকর থাকে, কারণ তা গরিব মানুষের জ্বালানি। সেইসঙ্গে রয়েছে এল পি জি—পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে সরকার যার প্রচার ও প্রসার চাইছে। এইসব ক্ষেত্রে দামের যে পার্থক্য তৈরি হয়, সরকারের পক্ষ থেকে তেল কোম্পানিগুলিকে তা দিয়ে দেওয়া হয়।

এই নীতি বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। পেট্রোল এবং ডিজেল বিক্রির জন্য রিলায়েন্স ও এসার বহু খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র খুলেছিল। কিন্তু এগুলিতে তেল সরবরাহ করা যায়নি, কারণ এই বেসরকারি সংস্থাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কম দামের তেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি।

আমরা দাম নির্ধারণের নয়া নীতি চালু করেছিলাম বেসরকারি শোধনাগার বসানোর স্বার্থে। শোধনক্ষমতা বহুলাংশে বেড়েছে এবং নতুন শোধনাগার বসাবার আশু প্রয়োজন আর নেই। তা হলে কি আমরা ক্রেতাদের স্বার্থে পুরানো নীতিতে ফিরে যেতে পারি? ২০০৮ সালে যখন অশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ১৪০ ডলার হয়ে গিয়েছিল, তখন অনেকেই এই প্রস্তাব দেন। একথাও বলেন যে, আন্তর্জাতিক বাজার-প্রভাবিত পণ্যের দাম কি আমাদের শোধনাগারের 'স্বনির্ভরতা' কে বিদ্রুপ করে না? অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের দামেই যদি পেট্রোল কিনব তা হলে এতগুলি শোধনাগার বসালামই বা কেন? যাঁরা এই মতের পক্ষে, তাঁরা ভুলে যান যে, দেশের শোধনাগারগুলি কর্মসংস্থান, গবেষণা, উন্নয়ন ইত্যাদিরও সহায়ক। তাঁরা একথাও ভুলে যান যে, আমাদের শোধন ক্ষমতা আরও অনেক বেশি বাড়াতে হবে। হাইড্রোকারবন ভিশন ২০২৫-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে আমাদের শোধনাগারের উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫ কোটি টন হলে ভাল। তাড়াহুড়ো করে স্বনির্ভরতা ভাঙিয়ে খেতে চাইলে আবার হয়ত আমাদের আমদানির উপরই নির্ভর করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারের থেকে কম দামে তেল বিক্রি করে আমরা রাষ্টায়ত্ত তেল সংস্থাগুলিকে লোকসান করতে বাধ্য করিয়েছি। সেইসঙ্গে বেসরকারি সংস্থাগুলিরও দেশের বাজারে ব্যবসা করার পথ বন্ধ করে দিয়েছি। বাধ্য হয়ে, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের বেশিরভাগই রপ্তানি করতে শুরু করে। গত এক দশকে অবশ্য তেলের বাজারে চাহিদাও ছিল যথেষ্ট ভাল; ফলে রপ্তানিকারী সংস্থাগুলি ভাল মুনাফাও করে। তা হলে ছবিটা দাঁড়ালো, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি যখন লোকসান করতে বাধ্য হচ্ছে ঠিক তখনই বেসরকারি সংস্থাগুলি বাধ্য হয়েছে লাভের মুখ দেখতে। অপ্রত্যাশিত এই লাভের জন্য তাদের উপর বাড়তি কর (Windfall Tax) চাপানো হোক — এই দাবিও উঠেছিল। কিন্তু এ দাবি ছিল একান্তই অযৌক্তিক। কোনো একটি শোধনাগারে লাভের কোন অংশ দক্ষ পরিচালন এবং আগ্রাসী বিপণনের ফল, আর কতটা অপ্রত্যাশিত লাভ —তা পৃথক করা সম্ভব নয়।

তেলের ক্রমবর্ধমান দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে কি করা উচিত — এ ব্যাপারে ঐকমত্যে আসা অত্যন্ত জরুরি। একথা বেশিরভাগ মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, আকাশছোঁয়া এই দামের বোঝা সরকার, তেল উৎপাদনকারী সংস্থা এবং ক্রেতাদের মধ্যে ভাগ হওয়া উচিত। কিন্তু, কর কাঠামো অথবা মুনাফার পরিমাণ নিয়ে এখনও কোনও ঐকমত্য হয়নি। তেলের দাম যদি ব্যারেল প্রতি ২০০ ডলারে পৌঁছায়, তাহলে

এই তেভাগা ব্যবস্থা টিকবে কিনা বলা দায়। তেলের এই চড়া দাম মোকাবিলা করার সব থেকে ভাল উপায় হল বিকল্প শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আরও বেশি বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধান। পর্যাপ্ত সময় দিলে এই সমস্যার সমাধান নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ততদিন কী হবে? তেলের দাম বাড়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত অসন্তোষ, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সামাল দেওয়া যাবে কি না তা নির্ভর করবে ক্ষমতায় থাকা সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও শক্তির উপর। ■

চতুর্থ অধ্যায় **প্রাকৃতিক গ্যাস**

৪.১। গ্যাস-শিল্পের বিকাশ ●

প্রাকৃতিক গ্যাস হল মূলত মিথেন। সবচেয়ে হালকা এই হাইড্রোকারবনের প্রতিটি অণুতে মাত্র একটি কারবন পরমাণু এবং চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু। প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় দু'ভাবে—অবিমিশ্র অবস্থায় অথবা অশোধিত তেলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। প্রথমটিকে বলা হয় 'মুক্ত গ্যাস' বা ইংরেজিতে 'ফ্রি গ্যাস' (এই 'ফ্রি' শব্দটি থেকে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, কেন তা সহজেই অনুমান করা যায়) এবং দ্বিতীয়টিকে 'যুক্ত গ্যাস' বা 'অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস'। তেলের অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে হঠাৎই এই গ্যাস আবিষ্কৃত হয়। প্রথম দিকে এই গ্যাস নিয়ে কি করা হবে সে ব্যাপারে কারোরই কোনও ধারণা ছিল না, তেলের সঙ্গে বেরিয়ে আসা এই গ্যাস হাওয়ায় মিশিয়ে দেওয়া হত। পরে দেখা গেল, এই গ্যাস যথেষ্ট বিপজ্জনক। কারণ, এর থেকে বিস্ফোরণের আশঙ্কা রয়েছে। তাই, একে বেরোনোমাত্র জ্বালিয়ে ফেলা হত। মুক্ত বা অবিমিশ্র গ্যাসকে জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল না—রেখে দেওয়া হত খনির মধ্যেই। তেল কোম্পানিগুলি এই গ্যাস আবিষ্কারের তথ্য অনেকসময়েই প্রকাশ করত না। কারণ, এটি দিয়ে যে ঠিক কি করা যেতে পারে তাই তারা বুঝে উঠতে পারে নি।

এর ফলে, পেট্রোলের তুলনায় গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয় অনেকটা দেরিতে। ১৯৫০-এর সময়ে, যখন মোট শক্তির ৫০ শতাংশেরও বেশি চলে গেছে তেলের দখলে, তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের কয়েকটি বড় শহরের বাইরে প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা কেউ জানতই না। ১৯৭৩-৭৪ সালে তেলের সঙ্কটের পরেই বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব এবং ব্যবহার নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। সেই সময়ের মধ্যে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস পরিবহন যথেষ্টই সস্তা হয়ে গেছে। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা লিকুইফাইড ন্যাচরাল গ্যাস (এল এন জি) এর বাণিজ্য শুরু হয়ে যায় ছয়ের দশকেই। তখনই জাপানের মতো দূরদেশেও এই গ্যাস পরিবহন করা শুরু হয়। গ্যাসের অন্যতম সুবিধা হল এর থেকে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা নেই। সাতের দশকের গোড়ার দিক থেকে তেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে গ্যাসের প্রমাণিত মজুত এবং ১৯৭০ থেকে ২০০০ সালে সব জ্বালানির মধ্যে গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধির হারই সর্বোচ্চ। ২০০০ সালের মধ্যে, মোট শক্তির ২৪ শতাংশ চলে আসে গ্যাসের দখলে। গ্যাসের প্রমাণিত মজুতের পরিমাণ ১৭৭ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার। বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ তিন হাজার বিলিয়ন কিউবিক মিটার (বি সি এম) এবং

মজুত ও উৎপাদনের অনুপাত ৬০ বছর, যা তেলের থেকে অনেক বেশি। তাই, গ্যাস অভিষিক্ত হল একুশ শতকের জ্বালানি হিসেবে। গাড়ির অন্তর্দহন ইঞ্জিনের পরিবর্তে যদি 'জ্বালানি সেল' ব্যবহার করা যায়, তাহলে প্রাকৃতিক গ্যাসও একুশ শতকে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে, যতটা বিংশ শতাব্দীতে পেট্রোল করেছিল।

তেলের মত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারেও পথিকৃৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখানেই প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুল ব্যবহার শুরু হয়। এর আগে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হত কয়লার গ্যাস। এবার তার জায়গা নিল প্রাকৃতিক গ্যাস। কয়লার গ্যাসের জন্য যে পাইপলাইন ছিল তাতেই সরবরাহ করা শুরু হল প্রাকৃতিক গ্যাস। কয়লার গ্যাসের ধোঁয়ায় ছিল অস্বস্তিকর এক গন্ধ এবং ঝুল-কালির অপরিচ্ছন্নতা। প্রাকৃতিক গ্যাস সেখানে পরিচ্ছন্ন এবং অধিক তাপ উৎপাদনকারী। অল্পদিনের মধ্যেই এই সুবিধাজনক দিকটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। গৃহস্থালিতে কয়লার গ্যাসের বিকল্প হয়ে ওঠার পর ক্রমে কল-কারখানাতেও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বেড়ে যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয় অনেক পরে। কয়লা চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদনের দক্ষতা যেখানে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ, সেখানে এখন গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদনের দক্ষতা ৬০ শতাংশের কাছাকাছি। জ্বালানি ছাড়াও সার ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস। সার শিল্পে ন্যাফথার পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাসের মিথেন ব্যবহার করলে তার কার্যকারিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। পেট্রোকেমিক্যালে ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাসের অপেক্ষাকৃত ভারী উপাদান ইথেন এবং প্রোপেন। যেসব প্রাকৃতিক গ্যাসে ভারী উপাদানই বেশি তাদের বলা হয় 'সমৃদ্ধ গ্যাস' বা 'রিচ গ্যাস'। আর যেসব প্রাকৃতিক গ্যাস-এ মূলত মিথেনই থাকে, তাদের বলা হয় 'নির্মেদ গ্যাস' বা 'লিন গ্যাস'।

প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ মাপার দুটি প্রচলিত ইউনিট হল 'মিলিয়ন কিউবিক মিটারস পার ডে (mmcmd) অথবা বিলিয়ন কিউবিক মিটার (bcm)। তাপমাত্রার হিসাবে এক বি সি এম গ্যাস এক মিলিয়ন টন অশোধিত তেলের সমান। বর্তমানে বিশ্বের ৭০টি দেশে প্রতিবছর প্রায় ৩০০০ বি সি এম প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এরমধ্যে ৬৫০ বি সি এম ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১০০০ বি সি এম ইউরোপ, জাপান ৯০ বি সি এম, ভারত ৫০ বি সি এম এবং বাকিটা বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি। প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত সীমাবদ্ধ গুটিকয় দেশেই। মোট মজুতের ৬৫ শতাংশই আছে রাশিয়া ও ইরানে। কাতারের নর্থ ফিল্ড হল প্রাকৃতিক গ্যাসের বৃহত্তম খনি। পারসিয়ান গাল্ফের নিচে অবস্থিত এই খনিতে ২৫ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস মজুত আছে। একই খনির ইরানি অংশ 'সাউথ-পার্স' এ রয়েছে আরও ১৪ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে এত অগ্রগতি সত্ত্বেও গোটা বিশ্বে

প্রতিদিন প্রায় ১৪০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস ব্যবহার না করেই জ্বালিয়ে ফেলা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কয়লার গ্যাসের ব্যবহার চলছে। জ্বলন্ত কয়লার উপর বাষ্প প্রবাহিত করে উৎপন্ন করা হত এই গ্যাস। শহরাঞ্চলের বাণিজ্যিক সংস্থা এই গ্যাস উৎপাদন করে পাইপলাইনের মাধ্যমে তা ক্রেতাদের সরবরাহ করত। ১৮০২ সালে প্রথম এই গ্যাসের সাহায্যে পরীক্ষামূলকভাবে আলো জ্বালানো হয়। ১৮১৭ সালে বল্টিমোর গ্যাস লাইট কোম্পানি গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে শহরের পথকে প্রথম আলোকিত করে। অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা এই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকে এবং ১৮৫০ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টিরও বেশি শহরে কয়লার গ্যাস উৎপন্ন হতে থাকে। শীর্ষস্থানে ছিল নিউইয়র্ক এবং তারপরেই ফিলাডেলফিয়া। কয়লার গ্যাস ব্যবহৃত হত পথঘাট এবং দোকানপাটে আলো জ্বালানোর কাজে। গৃহস্থের পক্ষে এই গ্যাস ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তাই সেখানে তখনও তিমিমাছের তেল বা অন্যকোনও পশুর চর্বি দিয়েই কাজ চলত। ১৮৮০-র পর বিদ্যুতের আলো এসে সকলকেই টেক্কা দেয়। রান্না এবং তাপ নিয়ন্ত্রণের কাজে অবশ্য কয়লার গ্যাসের ব্যবহারই চলতে থাকে। প্রায় সেই সময়েই অনেক জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ায় তা কয়লার গ্যাসের পরিবর্ত হিসেবে কাজে লাগল। গোড়ার দিকে গ্যাসের উৎস বা খনির কাছাকাছি অবস্থিত শহরেই প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হত। কিন্তু ১৯২০-র পরবর্তী সময়ে, ইস্পাতের সহজলভ্যতা এবং ঝালাই-এর প্রযুক্তি উন্নত হওয়ার ফলে দূরপাল্লার পাইপলাইন তৈরি করা সহজ হয়ে যায়। সেই সময়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে গ্যাসের পাইপলাইন তৈরি করে উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিকে যুক্ত করে ফেলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী অঞ্চলের সঙ্গে।

ইউরোপে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক পরে। তবে তাদেরও সেই একই পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। মার্কিন দেশের মত ইউরোপেও প্রথমে কয়লার গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। জার্মানি, ফ্রান্স বা ইতালির মত দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও কয়লার গ্যাসের ব্যবহার চলতে থাকে, কারণ বড় বড় শহরগুলির চাহিদা মেটানোর পক্ষে এই ভান্ডার যথেষ্ট নয় বলে মনে করা হচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল না। তারা প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত গড়ে তোলা এবং পাইপলাইন নির্মাণের কাজ জোরকদমে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এই প্রবল উদ্যোগেই গত ত্রিশ বছরে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহকারী দেশ হিসেবে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে নেদারল্যান্ডস এর সমুদ্রে আবিষ্কৃত হয় গ্রোনিংগেন এর বৃহৎ গ্যাস ভান্ডার। এই গ্যাসকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। ছয়ের দশকেই এই খনি থেকে বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানিতে গ্যাস সরবরাহের কাজ শুরু হয়ে যায়। নর্থ সি তে

গ্যাস অনুসন্ধান করে সমৃদ্ধ হয় ব্রিটেন এবং নরওয়ে। ছয়ের দশকে গ্যাস সরবরাহের জন্য এক জাতীয় সংযোগ ব্যবস্থা তৈরি করে ব্রিটেন। বিশ্বজুড়ে এতগুলি উদ্যোগের ফলে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই গৃহস্থালির জ্বালানি হিসেবে এর চাহিদা বাড়তেই থাকে।

ভারতে গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয় ছয়ের দশকের গোড়ায় অসমে। অয়েল ইন্ডিয়ার গেলেকি এবং মোরানের খনিতে উৎপন্ন গ্যাস-এর ব্যবহার শুরু করে শিবসাগর অঞ্চলের চা-বাগানগুলি। প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে নামরূপে একটি ইউরিয়ার কারখানা তৈরি করে হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন। অসমের পরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর এক রাজ্য ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার আরম্ভ হয়। প্রায় একই সময়ে গুজরাতের দু'টি জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় — উত্তরে মেহসানা এবং দক্ষিণে আংকলেশ্বরে। স্থানীয় শিল্পাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য দুটি পৃথক সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে ও এন জি সি। এই গ্যাসের সবচেয়ে পুরানো ক্রেতাদের মধ্যে ছিল অ্যালেম্বিক কেমিক্যালস এবং সারাভাই ইন্ডাস্ট্রিজ। আটের দশকের গোড়ার দিকে গ্যাস উৎপাদন শুরু করে বম্বে হাই। এখান থেকে মুম্বাই-এর নিকটবর্তী উরান-এ গ্যাস নিয়ে এসে আশেপাশের শিল্পকেন্দ্রে তা সরবরাহ করা হয়। ঠাল ও ট্রম্বেতে দুটি সারের কারখানা, মহারাষ্ট্র রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও রিলায়েন্সের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, দুটি স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা এবং আই পি সি এল, নাগোথানে ছিল এই গ্যাসের অন্যতম ক্রেতা।

বম্বে হাই-এর কাছে দক্ষিণ বাসীন নামে প্রাকৃতিক গ্যাসের এক বিশাল ভান্ডার পাওয়া যেতেই ভারতে গ্যাসের উৎপাদনের মাত্রা একলাফে অনেকটা বেড়ে যায়। বম্বে হাইতে তেলের সঙ্গে গ্যাস পাওয়া যেত। দক্ষিণ বাসীনে পাওয়া গেল মুক্ত গ্যাস। উচ্চমাত্রায় সালফার যুক্ত এই গ্যাসকে শিল্পমহলে বলা হয় অম্ল গ্যাস। সমুদ্রবর্তী পাইপের সাহায্যে এই গ্যাস গুজরাতের হাজিরায় নিয়ে এসে তার রাসায়নিক শুদ্ধিকরণের পর হাজিরা-বিজয়পুর-জগদীশপুর (এইচ ভি জে) পাইপলাইন দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দিল্লি পর্যন্ত। ১৯৮৭ সালে তৈরি এই পাইপলাইন ১৯৯৬ সালে সম্প্রসারিত হয়ে দৈনিক তিন কোটি ৩৪ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস সরবরাহের ক্ষমতা অর্জন করে। এই পাইপলাইন নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য গঠন করা হয় গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (গেইল) নামে এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। হাজিরা, কোটা এবং জগদীশপুরের সার কারখানা ছাড়াও এই পাইপলাইন থেকে কাওয়াস, গান্ধার,আউরাইয়া, দাদরি এবং দিল্লির বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। আরম্ভ হয় এল পি জির উৎপাদন বিজয়পুর এবং ভাগোরিয়াতে। এইচ ভি জে-র অন্যতম বৃহৎ ক্রেতাদের মধ্যে আছে পাটার চার লক্ষ টন ক্ষমতাসম্পন্ন পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনকেন্দ্র, মথুরার শোধনাগার

এবং মারুতি গাড়ির কারখানা। তাজমহল সংরক্ষণের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নয়ের দশকের মধ্যভাগেই মথুরার শোধনাগার প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়।

পশ্চিম ভারতের গ্যাস ভান্ডার শুধুই উত্তর ভারতের শিল্পাঞ্চলকে সমৃদ্ধ করবে —এই যুক্তি দক্ষিণ ভারত মেনে নিতে পারেনি। তাই দক্ষিণ ভারতের জন্য পৃথক সরবরাহ ব্যবস্থার দাবি ক্রমাগতই জোরাল হতে থাকে। বম্বে হাই-এর খানিকটা গ্যাস বাধ্য হয়েই জ্বালিয়ে ফেলতে হয়। আর তাতেই বেড়ে যায় দক্ষিণের রোষ। দক্ষিণ ভারতকে দেওয়ার বদলে গ্যাসকে জ্বালিয়ে দিতেও প্রস্তুত ও এন জি সি — এই ছিল তাদের ধারণা। সুখের কথা, অন্ধ্র উপকূলে রিলায়েন্স-এর গ্যাসের খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দক্ষিণ ভারতের গ্যাসভান্ডার আজ অনেক সমৃদ্ধ। এছাড়াও খুব শীঘ্রই কোচিতে এল এন জি-র আমদানি শুরু হতে পারে। দক্ষিণ ভারতে গ্যাসের ব্যবহার কিছুদিনের মধ্যেই বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

বিশালকায় বম্বে-হাই আর দক্ষিণ বাসীন ছাড়াও আবিষ্কৃত হয় সমুদ্রস্থ কয়েকটি ছোট খনি অঞ্চল। এগুলি থেকে তেল বা গ্যাস উৎপাদনের প্রযুক্তি সরকারি সংস্থার কাছে না থাকায়, ৯০-এর দশকে সিদ্ধান্ত হয় এগুলি বেসরকারি উদ্যোগের হাতে দেওয়া হবে। বম্বে-হাই-এর কাছাকাছি পান্না, মুক্তা এবং তাপ্তি অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিখ্যাত সংস্থা এনরন-এর হাতে। সহযোগী হিসেবে ছিল রিলায়েন্স এবং ও এন জি সি। এনরন-এর পতনের পর তার দায়িত্ব এবং অংশিদারী গ্রহণ করে ব্রিটিশ গ্যাস। খনিগুলি থেকে গ্যাস আনা হয় হাজিরায়। অন্ধ্র উপকূলবর্তী সাগরে রাভার গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রটি চালু হয় কেয়ার্নস ইন্ডিয়া এবং ও এন জি সি-র যৌথ উদ্যোগে। নতুন লাইসেন্স নীতিতে অনুসন্ধানের কাজে বেসরকারি ক্ষেত্রকে যুক্ত করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এখনও পর্যন্ত তা তেলের থেকে গ্যাসের অনুসন্ধানে অনেক বেশি কার্যকর। রিলায়েন্স-এর উদ্যোগে কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকা সন্নিহিত সমুদ্র-এলাকায় (কে জি অফশোর) গ্যাস উৎপাদনের দুটি বৃহৎ কেন্দ্র ছাড়াও বেশ কয়েকটি ছোট কেন্দ্র চালু হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত এবং রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্যাসের ভান্ডার খুঁজে পেয়েছে কেয়ার্নস।

বেসরকারি উদ্যোগে গ্যাস উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে গুজরাত। এখানকার স্থলভূমিতে বেশ কয়েকটি অগভীর খনির সন্ধান পেয়েছে কেয়ার্নস। অপরদিকে, জি এস পি সি এবং কানাডার সংস্থা নিকো গুজরাতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ছোটমাপের খনি আবিষ্কার করেছে এবং সেগুলি থেকে গ্যাস উৎপাদনও করছে। ও এন জি সি-র সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে এখান থেকে উৎপাদিত গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না। তাই এই গ্যাস সরবরাহের জন্য গুজরাত পেট্রোনেট এক

নতুন সংযোগ ব্যবস্থা তৈরি করে। এই গ্যাস ব্যবহার হয় বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রের নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। ডিজেল এবং ন্যাফথার মত মূল্যবান জ্বালানির পরিবর্ত হিসাবে এই গ্যাস ব্যবহৃত হওয়ায় ফলে দামও পাওয়া যায় যথেষ্ট ভাল। বহুবছর ধরে অপরিবর্তিত থাকার পর, সম্প্রতি অসম ও ত্রিপুরায় গ্যাস উৎপাদনের হার বেড়েছে। ২০০৯-১০ সালে ভারতের মোট উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ছিল ৫০ বি সি এম। এর মধ্যে একক বৃহত্তম উৎপাদক হল কে-জি অফশোরের রিলায়েন্সের এক বিশাল খনি। এ পর্যন্ত গ্যাস মজুতের যা হিসাব পাওয়া গেছে, তা পর্যালোচনা করে বলা যায় ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে উৎপন্ন গ্যাসের পরিমাণ বর্তমানের দ্বিগুণ হবে।

ভান্ডার শূণ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তেলের মত গ্যাস শিল্পকেও ক্রমাগতই ভীত করেছে। নয়ের দশকের আগে পর্যন্ত বিশ্বের অনেক দেশেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হত না। এক্ষেত্রে ভারত অবশ্য অন্যদের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে ছিল। এইচ ভি জে-এর মাধ্যমে সরবরাহ করা গ্যাস প্রথমে শুধুই ইউরিয়া তৈরির কাজে ব্যবহার করা হত। ক্রমে গ্যাসের যোগান বাড়তেই সরকার তাকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ১৯৮৭ সালে বরদারাজন কমিটি সুপারিশ করে, যেসব ক্ষেত্রে গ্যাসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়, সেইসব ক্ষেত্রেই আরও বেশি গ্যাস ব্যবহার করা হোক। অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কয়লাখনির দূরবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সার উৎপাদনকেই। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ১৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এবং দুই কোটি টন ইউরিয়া তৈরি হয়।

ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও উন্নত বাজারে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ গ্যাস ব্যবহৃত হয় গৃহস্থালির জ্বালানি হিসাবে। কারণ, এইসব শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখার জন্য প্রচুর জ্বালানি প্রয়োজন। শহরের ঘরে ঘরে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অবশ্য ভারতের ক্ষেত্রে তেমন লাভজনক ছিল না, কারণ এই গ্যাস শুধুই রান্নার কাজে ব্যবহার হয়— যার চাহিদা খুব সামান্য। এল পি জি এবং পেট্রোলের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে রান্নার এবং গাড়ির জ্বালানি হিসেবে সি এন জি-র চাহিদা এখন অনেক বেড়েছে। শহরে গ্যাস সরবরাহের প্রকল্প প্রথম কার্যকর হয় মুম্বাইতে। গেইল এবং ব্রিটিস গ্যাস-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত সংস্থা মহানগর গ্যাস এই প্রকল্প রূপায়ণ করে। এর পরে, দিল্লিতে এই প্রকল্প চালু করে ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস লিমিটেড। প্রায় ৪০টি শহরে গ্যাস সরবরাহের লাইসেন্স ইতমধ্যেই দেওয়া হয়েছে এবং ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৫০টি শহরে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা আছে। বর্তমানে আট লক্ষ বাড়ি এবং সাত লক্ষ যানবাহনে গ্যাস ব্যবহার হয়। আগেই বলা হয়েছে, বিশ্বের শহরগুলির মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক সি এন জি বাস চলে দিল্লিতে।

৪.২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ●

প্রাকৃতিক গ্যাসের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূচনা হয় ছয়ের দশকের গোড়ার দিকে। তখন হল্যান্ড-এর গ্যাস রপ্তানি শুরু হয় জার্মানিতে। এর কিছুদিন পরেই আলজিরিয়া এল এন জি রপ্তানি আরম্ভ করে ব্রিটেনে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ৮৮০ বি সি এম গ্যাস রপ্তানি হয়। এরমধ্যে ৬৪০ বি সি এম পাইপলাইনের মাধ্যমে এবং ২৪০ বি সি এম তরলীকৃত অবস্থায়, অর্থাৎ এল এন জি হিসেবে। হল্যান্ডের পরেই গ্যাস রপ্তানি শুরু করে নরওয়ে। কারণ, নর্থ সি থেকে পাওয়া গ্যাস-এর কোনও অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল না। অতএব রপ্তানিই ছিল একমাত্র পথ। সাতের দশকের শেষদিকে, এখানকার ইকোফিস্ক খনিকে জার্মানির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯৮০ সালের পর গ্যাসের অন্যতম সরবরাহকারী দেশ হিসেবে উঠে আসে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এইসময় নাগাদ এল এন জি-র সঙ্গে সঙ্গে পাইপলাইনের গ্যাসও সরবরাহ করে আলজিরিয়া। ১৯৭৩ সালে তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে ইউরোপিয় দেশগুলি বুঝতে পারে যে তেলের তুলনায় গ্যাস দামেও কম এবং অনেকবেশি নির্ভরযোগ্যও। আটের দশকের গোড়ার দিকে শক্তির উৎস হিসেবে পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিল ইউরোপ। কিন্তু ১৯৮৬ সালে, চেরনোবিল দুর্ঘটনার পরে ইউরোপের ধারণা কিছুটা বদলাতে থাকে। এইসব ঘটনার ফলে আটের দশকের শেষভাগে ইউরোপে গ্যাসের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং নিয়মিত সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস ব্যবহারের সূচনা হয়। গড়ে উঠতে থাকে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন উৎপাদন কেন্দ্রও।

আটের দশকের প্রথমদিকে, গ্যাস সরবরাহের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ইউরোপ। এর বিরোধিতা করে ইউরোপের উপর চাপও সৃষ্টি করতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের যুক্তি ছিল, শক্তির অন্যতম উৎসের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর এতখানি নির্ভরশীল হলে ইউরোপের বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতি প্রভাবিত হতে পারে। ইউরোপ অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে ততটা গুরুত্ব দিতে রাজি ছিল না। কারণ, তাদের কাছে গ্যাস পাওয়ার অন্য উৎসও ছিল। যোগান ব্যবস্থায় কোনওরকম ঘাটতি দেখা দিলেই তাদের হাতে ছিল গ্রোনিংগেন-এর মজুতভান্ডার। তাই মার্কিন বিরোধিতার তোয়াক্কা না করেই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে গ্যাস আমদানি করার দিকেই ইউরোপ ঝোঁকে। এর থেকে আমরা কি কোনও শিক্ষা নিতে পারি?

ইউরোপ কি গ্যাসের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে ইরানের কথা ভেবেছিল? অবশ্যই। সাতের দশকে তুরস্কের মধ্য দিয়ে বসানো পাইপলাইনের মাধ্যমে ইরান থেকে গ্যাস আমদানি সংক্রান্ত দুটি প্রকল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল। তবে, পরবর্তী সময়ে এই দুটি

প্রকল্পই বাতিল হয়ে যায়। এই উদ্যোগ বানচাল হওয়ার পিছনে সোভিয়েত ইউনিয়নের কি ভূমিকা ছিল তা নিয়ে আজ পর্যন্ত বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় নি। তাই এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য না করাই শ্রেয়। সম্প্রতি, রাশিয়া থেকে গ্যাস সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় ইরান থেকে ইউরোপে গ্যাস আমদানির বিষয়টি আবার খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গ্যাস রপ্তানিকারী দেশের সংগঠন কি সম্ভব? ●

গ্যাস রপ্তানিকারী দেশগুলি একজোট হয়ে ওপেক-এর মত কোনও সংগঠন গড়ে তুলতে পারে কি? ২০০১ সালে গ্যাস রপ্তানিকারী সব দেশের এক ফোরাম গঠিত হয়। রাশিয়া ও কাতার সহ মোট ১৬টি দেশ এই ফোরামের সদস্য। সদস্য দেশগুলি তাদের পারস্পরিক সুবিধার দিকগুলি খতিয়ে দেখতে নিয়মিত বৈঠকে বসে। কিন্তু ওপেক-এর মতো সংগঠন তৈরি করার অনেকগুলি অসুবিধা রয়েছে। প্রথমত গ্যাস রপ্তানিকারী দেশগুলি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে, যার ফলে তারা তাদের সুবিধামতো গ্যাসের দাম বাড়াতে পারে না। তেলের সঙ্গে গ্যাসের একটি মূলগত পার্থক্য হল, গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি খুব সহজেই পাওয়া যায়, যা তেলের ক্ষেত্রে তত সহজ নয়। তাছাড়া, গ্যাসের বাজার অসংগঠিত এবং গ্যাস রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা অনেক তীব্র। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম সরাসরিভাবে তেলের দামের সঙ্গে যুক্ত। তাই পৃথক সংগঠনের ঝুঁকি নেওয়ার বদলে গ্যাস রপ্তানিকারী দেশগুলি ওপেক-এর উপরেই দাম নিয়ন্ত্রণের ভার চাপিয়ে রেখেছে।

৪.৩। ভারতে আমদানি ●

আটের দশক থেকেই গ্যাস আমদানির সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখছে ভারত। পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস আমদানির বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ছিল ইরান-পাকিস্তান-ভারত পাইপলাইন প্রকল্প। আটের দশকে গ্যাস ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে ভারত তেমন উল্লেখযোগ্য নাম না হলেও ইরান এদেশে গ্যাস রপ্তানি করতে উৎসাহী ছিল। কারণ হল, সেইসময় ইউরোপে গ্যাস রপ্তানি করায় ইরানের অসুবিধা। দুর্ভাগ্য, ইরান-পাকিস্তান-ভারত পাইপলাইনের কাজে বিশেষ অগ্রগতি হয় নি, তা আলাপ আলোচনার স্তরেই রয়ে গেছে তিন দেশের মধ্যে। অন্যান্য যেসব প্রকল্প নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে তা হল, পূর্বে বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং পশ্চিমে ওমান, কাতার এবং তুর্কমেনিস্তান থেকে গ্যাস আমদানি।

সরকারিভাবে, বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস-ভাণ্ডার রাশিয়াতে। আর তারপরেই রয়েছে ইরান, যার মজুত গ্যাসের পরিমাণ ২৮ হাজার বি সি এম—অর্থাৎ ভারতের মজুতের ২৫ গুণ। অনেক বিশেষজ্ঞই অবশ্য ইরানের এই মজুত সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন। গ্যাস রপ্তানির আলাপ-আলোচনা বা চুক্তির ক্ষেত্রে ইরান এত বেশি সময় নেয়, যে তাতে এই সংশয় দৃঢ় হয়। সেইসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ইরান তার গ্যাসের বৃহৎ খনিগুলি থেকে উৎপাদনের বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেয় নি। দক্ষিণ পারস-এর খনির কিছু অংশ থেকে গ্যাস উৎপাদন ও বিপণনের জন্য ফ্রান্সের টোটাল বা ব্রিটেনের বিপির মতো বহুজাতিক সংস্থাকে বরাত দেওয়ার উদ্যোগ নিলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ইরানে কতটা গ্যাস মজুত আছে তা নিয়ে অবশ্য ভারতের কোনও চিন্তা নেই। পাকিস্তানের উপর দিয়ে টানা পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ হওয়া গ্যাসের নিরাপত্তার বিষয়টিই ভারতের কাছে উদ্বেগের।

ইরান থেকে আমদানি তখনই লাভজনক হতে পারে যদি তা পরিমাণে বেশি হয়। আমাদের প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ ইরান থেকে আমদানি করা যেতে পারে। ইরান থেকে আসা পাইপলাইন পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিবাদ বা সংঘর্ষ থাকলে গ্যাস সরবরাহও বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি পারস্পরিক শান্তির সময়েও পাইপলাইনে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের আশঙ্কা থেকেই যায়। বেশি পরিমাণ গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনওরকম বাধা এলে তা যথেষ্ট সমস্যা ডেকে আনতে পারে। ভারতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তার কিছু অংশ পাকিস্তানকে সরবরাহ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যাতে ভারতে গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে পাকিস্তান বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ইরান এবং পাকিস্তান এই পাইপলাইন এবং ভারতের গ্যাস-সংক্রান্ত প্রকল্পে বিনিয়োগ করুক—এমন প্রস্তাবও করা হয়েছিল। তার বিনিময়ে তারা বিদ্যুৎ পেতে পারে। আন্তর্জাতিক এই সমঝোতায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিশ্বব্যাঙ্কের নামও প্রস্তাব করা হয়।

আর একটি উদ্ভাবনী প্রস্তাব ছিল, ইরান থেকে পাকিস্তান হয়ে ভারতে আসা এই পাইপলাইন বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত করা হোক। সে ক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করবে চীনও। আপাতভাবে লাভজনক এই প্রস্তাবের এক বড়রকমের ত্রুটি হল—চীনের পক্ষে এটি সব দিক থেকেই লোকসানের। দীর্ঘ এই পাইপলাইনের শেষপ্রান্তে থাকা চীনকে একদিকে যেমন গ্যাসের জন্য বেশি দাম দিতে হবে, অন্যদিকে গ্যাস সরবরাহে বাধা এলে তাদের ঝুঁকিই সব থেকে বেশি। ভারতকে সমস্যামুক্ত করতে চীন এতখানি ঝুঁকি ও লোকসানের এক চুক্তি করবে — এমন আশা করা নেহাতই বাতুলতা। ইরানের গ্যাস পেতে চীন যদি সত্যিই আগ্রহী হত, তাহলে তারা হয়তো কোনও এল এন জি প্রকল্পে লগ্নি করত। এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ পারস-এর খনির

কোনও অংশে লগ্নি করতেও উৎসাহ দেখায়নি চীন।

ইরান-ভারত পাইপলাইনের ক্ষেত্রে আসল অন্তরায় কি নিরাপত্তার অভাব? না কি মার্কিন বিরোধিতা? দুটির ব্যাপারেই আমাদের মনে রাখতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপের মধ্যে পাইপলাইনের কথা, যা গত ৩০ বছর ধরে গ্যাস সরবরাহ করছে। এই উদাহরণ আমাদের এক মোক্ষম শিক্ষা দেয়। তা হল — সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়ার অপেক্ষা না করাই শ্রেয়, কারণ তা কখনই বাস্তবসম্মত হয় না। এর থেকে আমরা আরও একটি শিক্ষা পাই—মার্কিন বিরোধিতাই শেষ কথা নয়। সোভিয়েত-ইউরোপ পাইপলাইনের ঘোর বিরোধী ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউরোপের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরান-ভারত পাইপলাইন কাগজ-কলমে থেকে গেলেও ইরান-পাকিস্তান পাইপলাইনের কাজে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেমন জোরালো প্রতিবাদ জানায় নি।

ভারতে দৈনিক ৬০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস সরবরাহ করলে ইরানের দৈনিক আয় হবে ৪০ লক্ষ ডলার। দৈনিক ৪০ লক্ষ ব্যারেল পেট্রোল রপ্তানি করে ইরান যে ৩০ কোটি ডলার আয় করে, তার সঙ্গে তুলনায় গ্যাস রপ্তানির আয় সামান্য। তাই এই প্রকল্পে মার্কিন বিরোধিতা খুব যুক্তিযুক্ত ছিলনা এবং আমাদের উচিত ছিল এই বাধা কাটিয়ে ওঠা। এখন অবশ্য পরিস্থিতি জটিল। শুধু গ্যাসই নয়, ইরান থেকে তেলের আমদানির উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ইরান-ভারত গ্যাস পাইপলাইন নিয়ে কোনো উদ্যোগ নেবার উপযুক্ত সময় এখন নয়।

১৯৯৩ সালে গভীর সমুদ্রের মধ্য দিয়ে পাইপলাইনের যে প্রস্তাব ওমান দিয়েছিল তার বড় সুবিধা হল, কোনওভাবেই এই পাইপলাইন পাক-এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না। মাসকাট থেকে গুজরাত পর্যন্ত বিস্তৃত এই পাইপলাইনের বেশিরভাগ অংশই পাতার পরিকল্পনা ছিল তিন হাজার মিটার অথবা তারও বেশি সমুদ্রের গভীরে, যেখানে কোনও হামলাকারীর পক্ষে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই প্রস্তাব বাস্তবের মুখ দেখেনি—সমুদ্রের অত গভীরে পাইপলাইন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তৈরি করতে পারেনি ওমান। তাছাড়া ওমানের গ্যাসভান্ডার সম্পর্কে ভারতের বিশেষ আস্থা ছিল না। তাই কিছুদিন আলাপ আলোচনার পরেই এই প্রকল্পের কাজ স্থগিত হয়ে যায়।

এ ডি বি-র সহায়তায় ভারতের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আসে। এই প্রস্তাব ছিল তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান পাইপলাইনের ভারত পর্যন্ত সম্প্রসারণ। আফগান সীমান্তের কাছে দৌলতাবাদ খনিতে তুর্কমেনিস্তানের এক বিশাল গ্যাসের ভান্ডার আছে। ইউনোকল এবং আর্জেন্টিনার ব্রিডাস সংস্থা এই খনি থেকে গ্যাস উৎপাদনে উৎসাহী ছিল। কিন্তু ১৯৯৯ সালে আফগানিস্তানের উপর মার্কিন হামলার পর এই সংস্থাগুলি তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে, ফের তিন

দেশের সরকার মিলিতভাবে এই প্রকল্প রূপায়ণের কাজ করছে। আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাইপলাইন গেলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে মার্কিন মদতের অন্যতম কারণ হল, ইরানের গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হতে পারে এই গ্যাস।

বাংলাদেশ থেকে গ্যাস আমদানি করার ব্যাপারে ভারত আগ্রহী হলেও বাংলাদেশ সম্মত হয় নি এই যুক্তিতে যে তাদের গ্যাসের ভান্ডার নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন। এমনকি, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে মায়ানমারের পাইপলাইন যেতে দিতেও আপত্তি জানিয়েছে তারা। সেই কারণেই মায়ানমার থেকে সমুদ্রের গভীরে পাতা অথবা বাংলাদেশকে এড়িয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়ে পাইপলাইন তৈরির কথা ভারত ভেবেছে—কিন্তু এক্ষেত্রেও বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। পূর্ব এবং পশ্চিম—দুদিকেই পাইপলাইন সঙ্কটে এল এন জি আমদানির দিকেই ঝুঁকেছে ভারত। ২০০৪ সাল থেকেই শুরু হয়েছে কাতার থেকে এল এন জি আমদানি।

ভারতে গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব নাকচ করে বাংলাদেশ কি ঠিক করেছিল? গ্যাস উৎপাদক যেসব দেশের হাতে মজুত গ্যাস প্রচুর আছে, রপ্তানির ক্ষেত্রে তাদের কোনও সমস্যা থাকে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় রাশিয়া, নরওয়ে অথবা কাতারের কথা। অপরদিকে আলজিরিয়া এবং বলিভিয়ার কিন্তু রপ্তানিতে সমস্যা ছিল। ছয়ের দশকে আলজিরিয়াই ছিল গ্যাস রপ্তানিকারী প্রথম দেশ। রপ্তানি হত ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সাতের দশকে রপ্তানির পরিমাণ কমিয়ে এই গ্যাস নিজের দেশের শিল্প-বিকাশে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয় আলজিরিয়া। সেই কারণেই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে রদবদল করতে চায় এবং তা অবশ্যম্ভাবীভাবে পারস্পারিক তিক্ততার কারণ হয়ে ওঠে। বলিভিয়া তার নিজস্ব গ্যাসের ভান্ডার থেকে উৎপাদনের জন্য বহুজাতিক সংস্থার সহায়তা নেয়। এই প্রকল্পের সর্বোচ্চ অংশীদার ছিল ব্রাজিলের পেট্রোব্রাস সংস্থা এবং এদের উৎপাদন রপ্তানি হত ব্রাজিলেই। ২০০৫ সালে এই রপ্তানি নীতির বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ হয় এবং ২০০৬ সালে দেশের নবনির্বাচিত সরকার সব ধরণের রপ্তানি-চুক্তি পুনর্বিন্যাসের উপর জোর দেয়। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াও গ্যাস রপ্তানি কমিয়ে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আরও বেশি গ্যাস ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে।

সহজভাবে দেখতে গেলে সমস্যাটি এইরকম। প্রাকৃতিক গ্যাসের মত সম্পদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা যদি যথেষ্ট না থাকে, তাহলে কি এই সম্পদ রপ্তানি করে তার থেকে দ্রুত আয়ের পথে যাওয়া উচিত? না কি ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য একে সঞ্চয় করে রাখা বিধেয়? সাধারণভাবে, বর্তমানের রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয়, ভবিষ্যতের ব্যয় সঙ্কোচের থেকে বেশি। কিন্তু তা নির্ভর করে ব্যবহারের ক্ষেত্র অথবা ভবিষ্যতের চাহিদা বৃদ্ধির হিসাবের উপর। অর্থনীতি নয়, এক্ষেত্রে রাজনীতিই হয় প্রধান

নির্ধারক শক্তি। আমাদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তাকে 'ভারতবিরোধ' বা 'অকৃতজ্ঞতা'র নামান্তর বলতে পারেন। কিন্তু, তা হবে অতি সরলীকরণ। সমস্যাটা ঠিক বাংলাদেশ বা তৃতীয় বিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়—ডাচ সরকারও এখন তাদের গ্যাস রপ্তানির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে।

৪.৪। লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস (এল এন জি) ●

প্রাকৃতিক গ্যাসকে তরলীকৃত করা যথেষ্ট কঠিন। গ্যাসকে মাইনাস ১৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ঠান্ডা করলে তা তরল হয় এবং ৬০০ কিউবিক মিটার গ্যাস সঙ্কুচিত হয়ে এক কিউবিক মিটার এল এন জিতে পরিণত হয়। এর ফলে গ্যাসের মজুত ও পরিবহনের কাজ সহজ হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি ট্যাঙ্কারে মেক্সিকো উপসাগর থেকে ইংল্যান্ডে এল এন জি পরিবহন করা হয়। এই প্রকল্পের সাফল্যই দূরপাল্লার এই পরিবহন ব্যবস্থার পথ দেখায়। এল এন জি রপ্তানির শর্ত হল, রপ্তানিকারী দেশে তরলীকরণের জন্য একটি কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে, আমদানিকারী দেশেও তরলীকৃত গ্যাসকে পুরনো অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পুনর্গ্যাসীকরণের কেন্দ্র থাকা চাই। এই ব্যবস্থা কিন্তু যথেষ্ট ব্যয়বহুল। মাঝারি মাপের একটি প্রকল্পের জন্যও ২০০ কোটি ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। এত বড় লগ্নির অন্যতম শর্ত হল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি—সাধারণভাবে ২০ বছরের। চুক্তির সময়ের মধ্যে এল এন জি-র দাম অপরিবর্তিত রাখার শর্ত থাকে না, অশোধিত তেলের চালু বাজারদরের সঙ্গে ওঠা-পড়া করে এই দাম।

১৯৬৪ সালে দেশের বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য এল এন জি আমদানি শুরু করে ব্রিটেন। পরে, যখন নর্থ সি থেকে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস পাওয়া গেল, তখন এল এন জি-র আমদানি বন্ধ করলেও মজুত ঠিক রাখার স্বার্থে এল এন জি-র ব্যবহার বহাল রাখল ব্রিটেন। নর্থ সি থেকে গ্যাস আসে সেন্ট ফার্গাস এবং ব্যাকটন উপকূলে এবং সেখান থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে যায় চাহিদার প্রাণকেন্দ্র লন্ডনে। সারা বছরের মধ্যে গ্যাসের সর্বাধিক চাহিদা থাকে শীতকালে। এই সময়কার ব্যাপক চাহিদা অনুসারে যদি পাইপলাইনের আয়তন বাড়ানো হয় তা হলে বছরের বাকি সময় তা প্রায় অকেজোই পড়ে থাকে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচের উপায় ছিল মাঝারি মাপের পাইপলাইন তৈরি করে বছরভর সরবরাহ হওয়া গ্যাস তরলীকৃত করে সঞ্চয় করে রাখা এবং তা শীতকালে ব্যবহার করা। দীর্ঘ এই পাইপলাইনের শেষ প্রান্তটুকুই ছিল

আয়তনে বড়, যা শীতকালের বেশি গ্যাস-এর প্রয়োজন মেটাত। বর্তমানে নর্থ সি থেকে পাওয়া গ্যাসের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ইউ কে আবার এল এন জি-র আমদানি শুরু করেছে।

ব্রিটেনের পর আলজিরিয়া থেকে এল এন জি আমদানি শুরু করে ফ্রান্স। ১৯৬৯ সালে টোকিও পাওয়ার কোম্পানিকে এল এন জি সরবরাহ শুরু করে আলাস্কা। ১৯৭২ সালে ব্রুনেইও এই বাণিজ্যে যোগদান করে। প্রথমে স্পেন, পরে ইতালির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় লিবিয়া। ১৯৭২ সালে আলজিরিয়া থেকে এল এন জি আমদানি শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ১৯৭৯ সালে এই চুক্তি নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। আটের দশকে মালয়েশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া গ্যাস-তরলীকরণের কেন্দ্র তৈরি করে। জাপান ছিল তাদের প্রধান ক্রেতা। নয়ের দশকে এল এন জি-র রপ্তানি শুরু করে কাতার, নাইজিরিয়া এবং ত্রিনিদাদ। ২০০০ সাল থেকে কোরিয়াকে এল এন জি সরবরাহ শুরু করে ওমান। বর্তমানে বাণিজ্যের বার্ষিক পরিমাণ ২০ কোটি টন, অর্থাৎ ২৪০ বি সি এম গ্যাস। বছরে মোট আট কোটি টন আমদানি করে আমদানিকারী দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে জাপান। সাম্প্রতিককালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ২০০০ সাল থেকে গ্যাসের দামের অতিরিক্ত বৃদ্ধির দরুণ সারা বিশ্বে এল এন জি-র চাহিদা বেড়েছে।

এল এন জি ব্যবহারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পথিকৃৎ হলেও আট ও নয়ের দশকে গ্যাসের দাম কম থাকার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এল এন জি-র বাজার মন্দাই ছিল। এক দিকে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্য দিকে ত্রিনিদাদে এল এন জি-র প্রথম উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে ওঠা—এই দুটি ঘটনার ফলে এল এন জি-র চাহিদা আবার বাড়ে। ১৯৭৯ থেকে অকেজো হয়ে পড়ে থাকা দুটি এল এন জি-র গ্রহণকেন্দ্র ফের চালু করা হয়। বেশ কয়েকটি নতুন এল এন জি আমদানি প্রকল্পের কাজও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু একই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যায় শেল গ্যাসের উৎপাদন। তাই, এল এন জি আমদানি করার প্রয়োজন ফুরালো। শুধু তাই নয়, এল এন জি রপ্তানি করার সম্ভাবনাও তৈরি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে!

গত এক দশকে সারা বিশ্বে এল এন জি-র উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়েছে বহুলাংশে। বর্তমানে এই ক্ষমতা ৩৭০ বি সি এম। মোট নটি প্রকল্পের কাজ চলছে। ২০১৬ সালে এগুলির কাজ শেষ হলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে আরও ৮০ বি সি এম। এল এন জি-র অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারী দেশ হিসাবে খুব শীঘ্রই উঠে আসবে অস্ট্রেলিয়া।

এই বাড়তি উৎপাদন কাজে লাগল এল এন জির তাৎক্ষণিক বা সাময়িক বাজার তৈরি হওয়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও এল এন জি-র বাণিজ্য হয় ২০ বা ২৫ বছরের চুক্তির ভিত্তিতে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় ১৫ শতাংশ বিক্রি হয় তাৎক্ষণিক বাজারে। গত

কুড়ি বছরে তরলীকরণ ও পুনর্গ্যাসীকরণের খরচ এবং এল এন জি ট্যাঙ্কারের দাম ৫০ শতাংশেরও বেশি কমেছে। এর ফলে এল এন জির বাজারে এক মৌলিক পরবির্তন এসেছে। যখন এই খরচ বেশি ছিল, তখন তরলীকরণের ক্ষমতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারের কথা ভেবেই চুক্তি হত দীর্ঘমেয়াদি। এখন খরচ কমে যাওয়াতে, উৎপাদনকারীরা চুক্তির বাইরেও অতিরিক্ত ক্ষমতার প্ল্যান্ট বসাতে পারে। চুক্তি ছাড়াই ট্যাঙ্কার তৈরি ও বিক্রি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের পরিবর্তনশীল দামের ফলে চুক্তি বর্হিভূত ট্যাঙ্কারের সংখ্যা বাড়ে এবং চাঙ্গা হয়ে ওঠে তাৎক্ষণিক বাজার। আবার এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি এল এন জি চুক্তির বিধি-নিষেধও অনেকটাই শিথিল হয়। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় নতুন করে যেসব চুক্তি হচ্ছে, তাতে কয়েকবছর অন্তরই দামের পুনর্বিন্যাসের উল্লেখ থাকছে।

নয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে এল এন জি-কে মনে করা হত অত্যন্ত ব্যয়বহুল। নয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অশোধিত তেলের দাম কমে ব্যারেলপিছু নয় ডলার হয়ে যাওয়ায় এল এন জি-র দামও কমে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কাতারের সঙ্গে ভারত দ্রুত এক চুক্তি করে। ২০০৪ সালে দহেজ-এর গ্রহণকেন্দ্রে সরবরাহ শুরু হয়ে যায়। এরপরে ব্রিটেনের শেল কোম্পানি একটি ছোট গ্রহণকেন্দ্র তৈরি করে হাজিরায়। মহারাষ্ট্রের দাভোল-এ নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য একটি এল এন জি টার্মিনাল তৈরি করে এনরন। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয় এবং পরে এনরন দেউলিয়া হয়ে যায়। গেইল এবং এন টি পি সি যৌথভাবে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং এল এন জি টার্মিনালটি আবার চালু করেছে। ম্যাঙ্গালোর, কোচি এবং এন্নোরে এল এন জি টার্মিনাল সম্ভব বলে মনে করা হয়। এখনও পর্যন্ত একমাত্র কোচির টার্মিনালের ব্যাপারেই সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বা অস্ট্রেলিয়া থেকে এল এন জি আমদানির জন্য আদর্শ। তবে পূর্ব উপকূলে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের ভান্ডার আবিষ্কৃত হওয়ায় পূর্ব ভারতে এল এন জি আমদানির পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

৪.৫। দাম ও নিয়ন্ত্রণ ●

তেলজাত দ্রব্য সহজেই নিয়ে যাওয়া যায় সড়ক, রেলপথ বা পাইপলাইনের মাধ্যমে এবং শোধনাগার, পেট্রোল পাম্প, গাড়ির ট্যাঙ্ক,এমনকি বাড়িতেও রাখা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস কিন্তু শুধুমাত্র পাইপলাইনের মাধ্যমেই পরিবহন করা সম্ভব এবং একে মজুত করা যথেষ্ট কঠিন। সিলিন্ডার এবং গাড়িতে মজুত রাখা যায় সি এন জি, কিন্তু তার জন্য উচ্চচাপের প্রয়োজন (২০০ অ্যাটমসফিয়ার)। পরিবহন ও মজুতের উদ্দেশ্যই হল গ্যাসকে খনি থেকে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। প্রথমত, এই গ্যাস বিশালায়তন

এবং দীর্ঘ পাইপলাইনে খনি থেকে শহরে আনা হয়। শহরের মধ্যে গৃহস্থালি, রেস্তরাঁ বা ছোটখাট হোটেলে গ্যাস সরবরাহ করা হয় ছোটমাপের পাইপ ব্যবহার করে। এই বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা আসা কঠিন। প্রথমত, পাইপলাইন বসানো খুবই ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, নতুন পাইপলাইন বসানোর খরচ বেশি; পুরোনো পাইপ লাইনের সম্প্রসারণের খরচ কম। কাজেই যে জায়গায় একটি পাইপলাইন আছে সেখানে অন্য কেউ চট করে নতুন পাইপলাইন বসাবে না। তাই পাইপলাইন পরিবহনকে বলা হয় natural monopoly। এই ব্যবসা স্বাভাবিকভাবেই একচেটিয়া। শুধু তাই নয়, পাইপলাইনের মালিক গ্যাস বিক্রেতা ও ক্রেতাদের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে ধরে রাখে যাতে তারা প্রতিযোগী কোনো পাইপলাইন অপারেটরের কাছে যেতে না পারে। অন্য কোনও গ্যাস বিক্রেতা হয়ত বিকল্প কোনও পাইপলাইনে কম দামে যোগান দিতে পারে, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ ক্রেতা এই কম দামের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের দায়ে তাঁকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সাত ও আটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক এই ব্যবস্থাই কায়েম ছিল। এই বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করতে তখন মার্কিন গ্যাস-নিয়ন্ত্রক বা রেগুলেটর বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল, পাইপলাইনের অবাধ ব্যবহার। পাইপলাইনের মালিক যেই হোক না কেন, যে কোনো গ্যাস বিক্রেতা বা ক্রেতাকে অধিকার দেওয়া হল প্রয়োজনে সেই পাইপলাইন ব্যবহারের। এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল বৃহৎ কয়েকটি গ্যাস উৎপাদক সংস্থা বেশিরভাগ পাইপলাইন ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করে রেখেছিল। রেগুলেটরের নির্দেশে পাইপলাইন পরিচালনকারী সংস্থাগুলি মোটা অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে এই চুক্তিগুলি বাতিল করে। মার্কিন নিয়ন্ত্রক এই ক্ষতিপূরণ উসুল করার জন্য ক্রেতাদের কাছ থেকে টাকা তোলার অনুমতি দেয় কারণ শেষ পর্যন্ত এই পদক্ষেপে ক্রেতাদেরই সুবিধা হয়েছিল। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল, সরবরাহ এবং পরিবহনকে আলাদা করা। যার অর্থ, পাইপলাইন পরিচালক সংস্থা গ্যাস বিক্রি করতে পারবে না এবং গ্যাস বিক্রেতা পাইপলাইন বসাতে পারবে না। এই ব্যবস্থায় নিশ্চিত করা যায় যে, পাইপলাইন পরিচালকেরা গ্যাস বিক্রেতাদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকবে এবং সকলকেই পাইপলাইন ব্যবহারের সমান সুযোগ দেবে। এই দুটি পদক্ষেপের ফলে পাইপলাইনে যথার্থভাবে তৃতীয় পক্ষের প্রবেশাধিকার (third party access) দেওয়া হল। নিট ফল হল, উৎপাদকরা উন্নত পরিষেবার পাইপলাইন বেছে নেওয়া সুযোগ পেলেন, ক্রেতারা পেলেন কম দামে গ্যাস কেনার সুবিধা।

একই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরে ব্রিটেনেও নেওয়া হয়। আটের দশকের গোড়ার দিকেই নর্থ সি থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। তৎকালীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ব্রিটিশ গ্যাস প্রায় সব গ্যাসই কিনে নেওয়ার চুক্তি করে। সেইসঙ্গে তৈরি করে দেশজোড়া এক

পাইপলাইন গ্রিড যার মাধ্যমে এক কোটি আশি লক্ষ গৃহস্থালি সহ সমস্ত ক্রেতার কাছে গ্যাস সরবরাহ করা যেত। মার্কিন সংস্কারে প্রভাবিত হয়ে ব্রিটেনের সরকারও গ্যাসের বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৮৬ সালে ব্রিটিশ গ্যাস-এর বেসরকারিকরণ হয় এবং একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা নিয়ন্ত্রণের কার্যভার গ্রহণ করে। যেহেতু সব গ্যাসই ব্রিটিশ গ্যাস-এর মালিকানাধীন ছিল, তাই তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব ছিল নিছকই কাগজ কলমে। সরবরাহ করার মত কোনো গ্যাসই তাদের হাতে ছিল না। নতুন যে সব গ্যাসের খনি আবিষ্কৃত হল, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নয়া নির্দেশে ব্রিটিশ গ্যাস এবার কোনোভাবেই তার ৯০ শতাংশের বেশি কিনতে পারল না। 'গ্যাসের খোলা বাজার'—এই প্রকল্পের মাধ্যমেই ব্রিটেনের গ্যাসের বাজারে প্রতিযোগিতার সূচনা। বৃহৎ ক্রেতারাই প্রথমে পছন্দমতো সরবরাহকারীদের কাছ থেকে গ্যাস কিনতে পারত। ১৯৯৬ সাল থেকে সব ক্রেতাই এই সুবিধা পেতে শুরু করে।

সরবরাহ ও পরিবহন—এ দু'টিকে আলাদা করার প্রথম প্রয়াসে ব্রিটিশ গ্যাসের মধ্যেই বিক্রয় ও পরিবহনকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক করা হয়। পরে, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এই ব্যবস্থাটিকে আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গ্যাসকে বিভিন্ন সংস্থায় বিভক্ত করে। প্রত্যেকটি সংস্থার পরিষেবা পৃথক। পরিবহনের দায়িত্ব পেল ট্র্যান্সকো (বহু পুনর্বিন্যাসের পর বর্তমানে ন্যাশনাল গ্রিডগ্যাস)। ঠিক যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাইপলাইনের ভাড়া নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রক, তেমনই ট্র্যান্সকোর ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট অঙ্ক ধার্য করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাইপলাইন সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ট্র্যান্সকোই ছিল একমাত্র পরিবহনকারী সংস্থা। তাই, অনেক কঠিন ছিল এই মূল্য নির্ধারণ। এই অঙ্ক এমনভাবে ধার্য করা হয় , যাতে ট্র্যান্সকো তার সম্পদের উপর যুক্তিসঙ্গত হারে আয় করতে পারে। বছরে খুচরো দাম নির্দেশক যখন বাড়ত ৫%, এই দাম বাড়ানো হত ২% অথবা ৩% যাতে ট্র্যান্সকো বাধ্য হয় তার দক্ষতা বাড়াতে ।

নিয়ন্ত্রিত ভাড়া সবসময়েই এমন হওয়া উচিত, যা পরিবহনকারীকে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিষেবা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে। তবে, ভবিষ্যতের চাহিদার আগাম হিসাব করা খুব সহজ কাজ নয়। জাতীয় পরিবহন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে পরিবহন ক্ষমতার বড়রকমের ঘাটতি খুঁজে পায় ব্রিটেন। মোট বন্টনব্যবস্থা মসৃন রাখতে এই ঘাটতি নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন গ্যাস সরবরাহকারীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে তা ছ'মাসের নিলামের মাধ্যমে করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি নিলামের ব্যবস্থাও করা যায় যাতে পরিবহনকারীরা বুঝতে পারেন আগামীকালে তাঁদের কতখানি পরিবহন ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

ইউরোপ তাদের প্রয়োজনের গ্যাস পায় নর্থ সি-র নরওয়েজিয়ান খনি, রাশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে। এই গ্যাস আসে পাইপলাইনের মাধ্যমে এং এল এন জি হিসেবেও। দূরপাল্লার পাইপলাইন তৈরি করে গ্যাস আমদানি এবং গ্যাস উৎপাদকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি আন্তর্জাতিক চুক্তি করার ব্যাপারে ইউরোপ মূলত বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত অথবা বেসরকারি সংস্থাগুলির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। এই সংস্থাগুলি গ্যাস শিল্পে সংস্কার কার্যকর করতে যথেষ্ট বাধা দিলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্দেশিকার ফলে বাজার অনেকটাই প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে। ভারতে গ্যাস বিক্রি, পরিবহন এবং সরবরাহ—সবটাই সরকারি সংস্থার হাতে ছিল। বর্তমানে বেসরকারি সংস্থাকেও প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পেট্রোলিয়ম অ্যান্ড ন্যাচরাল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। সব বৃহৎ পাইপলাইনে তৃতীয় পক্ষের প্রবেশ ঘটলেও তা নতুন পাইপলাইনের তৈরির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। গ্যাস পাইপলাইন আর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ নেই। এক জাতীয় বন্টন ব্যবস্থা তৈরি হতে চলেছে।

গ্যাস সরবরাহকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা না থাকলে গ্যাসের দাম তুলনীয় হয় পরিবর্ত জ্বালানির দামের সঙ্গে। শিল্পের ক্ষেত্রে তা জ্বালানি তেল, পরিবহনের ক্ষেত্রে পেট্রোল বা ডিজেল, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলত কয়লা এবং কখনও ন্যাফথা। গৃহস্থালির ক্ষেত্রে কেরোসিন তেল বা রান্নার গ্যাস। যে গ্যাস উৎপাদক এই বিভিন্ন ধরনের ক্রেতাদের গ্যাস সরবরাহ করেন, তিনি পান একটা গড় দাম। পরিবহনের খরচ বাদ দিলে তার হাতে যা থাকে, তা হতে হবে উৎপাদনের খরচের তুলনায় বেশী। কিন্তু প্রশ্ন হল কতটা বেশী? ছয় এবং সাতের দশকে আমেরিকায় উৎপাদনের খরচ হিসাব করে খনিতে গ্যাসের দাম নির্ধারণ করার চেষ্টা করে মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এ চেষ্টা সফল হয়নি। সাতের দশকে এই প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে যায় এবং তৃতীয় পক্ষের প্রবেশাধিকার ও পরিবহন মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক করার চেষ্টা হয়। বৃদ্ধি পায় গ্যাসের উৎপাদন এবং দাম কমে। নয়ের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে গ্যাসের দাম সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে থাকে। এর ফলে অশোধিত তেল এবং গ্যাসের দামের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কিন্তু গত দশকে, তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে গ্যাসের দামেও তার প্রভাব পড়ে। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ শেল গ্যাস উৎপাদনের ফলে এই প্রভাব আবার কমে যায়।

গ্যাসের বাজার প্রতিযোগিতমূলক হওয়ায় ক্রেতারা দীর্ঘমেয়াদির বদলে স্বল্পমেয়াদি চুক্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়। তেলের মতই তাৎক্ষণিক বাজার এবং তাৎক্ষণিক দামও নির্ধারিত হয়। সেই সঙ্গে চলে আসে আগাম বাজারের আভাসও। অনেক পরে, এল

এন জি-র ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। তবে, ইউরোপে গ্যাস আমদানি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি অনুসারেই হতে থাকে। ক্রেতারা ডিজেলের ও পেট্রোলের দামের অনুপাতেই দাম দিতে থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস ব্যবহার শুরু হতেই কয়লার দামের প্রভাবও পড়তে থাকে গ্যাসের দামে।

ভারতে ও এন জি সি এবং অয়েল ইন্ডিয়ার গ্যাসের দাম নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই দাম নির্ভর করে উৎপাদন-ব্যয়ের উপর। ও এন জি সি বা ও আই এল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বলেই এটা সম্ভব। ক্রেতারা দাম দেয় জ্বালানি তেলের দামের অনুপাতে। সরকার নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে ক্রয়মূল্যের যে পার্থক্য, তা জমা হয় সম্মিলিত 'গ্যাস পুল অ্যাকাউন্টে'। বেসরকারি সংস্থার গ্যাসের দাম নির্ধারিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে তৈরি চুক্তির মাধ্যমে; তাই এক একটি অঞ্চলে গ্যাসের দাম এক এক রকম। আমদানি করা এল এন জি থেকে তৈরি গ্যাসের দাম সবচেয়ে বেশি। সমস্যা হল গ্যাসের জোগান বাড়াতে গেলে আমাদের আরও এল এন জি আমদানি করা প্রয়োজন। এল এন জি— গ্যাস চড়া দামে বিক্রি না করে যদি অন্য অপেক্ষাকৃত সস্তা গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করা যায় —ঠিক যে ভাবে সৌরবিদ্যুৎ কমদামি বিদ্যুতের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে—তাহলে তার বাজার বাড়ে এবং বেশি সংখ্যক ক্রেতার চাহিদা মেটানো যায়। এখনও কিন্তু এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ■

দ্বিতীয় ভাগ নবীকরণীয় শক্তি

- জলবিদ্যুৎ
- সৌরশক্তি
- বায়ুশক্তি
- জৈব পদার্থ থেকে শক্তি

পঞ্চম অধ্যায় জলবিদ্যুৎ

৫.১। গোড়াপত্তন ●

১৯৪৮ সালে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনকে গঠন করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি অথরিটির ধাঁচে। বহুমুখী এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল অনেকগুলি। যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, পর্যটন কেন্দ্র গঠন এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। দেশের প্রথম এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ইউরোপিয় উপদেষ্টার মত ছিল, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরি হোক মাটির উপরে। বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এই মতামত আর সেই সংক্রান্ত হিসাব খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেন, যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি মাটির নিচে হলেই ভাল। মেঘনাদ সাহার অভিমতকে সমর্থন করেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ১৯৫৩ সালে মাইথনে উদ্বোধন হয় এশিয়ার প্রথম ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের। তারপর পেরিয়ে গেছে প্রায় ৭০ বছর। আজ এখানকার ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সিমেন্সের তিনটি জেনারেটর মোট ৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। উৎপাদন হয় শুধু সন্ধ্যাবেলা, যখন বিদ্যুতের চাহিদা থাকে সবথেকে বেশি। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কন্ট্রোল রুম থেকে জেনারেটর চালু করার সঙ্কেত দেওয়া হয়। দুমিনিটের মধ্যেই অপারেটররা জেনারেটরকে সর্বোচ্চ উৎপাদন সীমায় নিয়ে যায়। একই সময়ে নিকটবর্তী কল্যাণেশ্বরী কালীমন্দিরে আলো জ্বালিয়ে ঘন্টাধ্বনি করে শুরু হয় সন্ধ্যারতি। আধুনিক ভারত এই দুই ধরনের মন্দিরই গ্রহণ করেছে সমান ভক্তি সহকারে।

স্বাধীনতার ঠিক পরেই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য অনেকগুলি জায়গা নির্বাচন করা হয়েছিল। দামোদর উপত্যকা ছিল তারই মধ্যে একটি। এছাড়া বিপাশা এবং শতদ্রু নদীর উপর বেশ কয়েকটি বাঁধ এবং বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল ভাকরা বাঁধ। ৭৬২ ফিট উচ্চতাসম্পন্ন কংক্রিটের এই বাঁধ বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম। এর দ্বারা চালিত দুটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের মোট উৎপাদনক্ষমতা ১০০০ মেগাওয়াট। এর পরে তৈরি হয়েছে হিরাকুদ, কোয়না এবং নাগার্জুনসাগর। ১৯৬২ সালের মধ্যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতা পৌঁছায় ৩০০০ মেগাওয়াটে, যা ছিল মোট উৎপাদনক্ষমতার ৫০ শতাংশ। এরপর জলবিদ্যুতের অনুপাত ক্রমেই কমতে থাকে এবং বর্তমানে তা মাত্র ২০ শতাংশ। অনেকেই মনে করেন যে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা

মেটাতে হলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হওয়া উচিত মোট উৎপাদনক্ষমতার ৪০ শতাংশ। কিন্তু, তা করতে হলে বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত এবং সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন।

পুকুর, নদী নালা, সমুদ্র বা মহাসাগর—জল যেখানেই থাকুক, সূর্যরশ্মির তাপে তা সবসময়েই বাষ্পে পরিণত হয়। উত্তপ্ত জল ও স্থলভূমি উপরিভাগের হাওয়াকে উত্তপ্ত করে একথা আমাদের জানা। এই গরম হাওয়া বাষ্পসহ উপরের দিকে উঠতে থাকে। উপরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে কিছু পরিমাণ বাষ্প আবার জলে পরিণত হয় এবং বৃষ্টির আকারে নিচে নেমে আসে। হিমালয়ের উপর বৃষ্টিপাত হলে, তার কিছুটা পর্বতের গা বেয়ে নদী হিসেবে নেমে আসে। উত্তর ও পূর্ব ভারতের অধিকাংশ নদীরই উৎপত্তিস্থল এই হিমালয়ে। মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির উৎপত্তি হয় বিন্ধ্য, নীলগিরি এবং পূর্ব ও পশ্চিম ঘাটে।

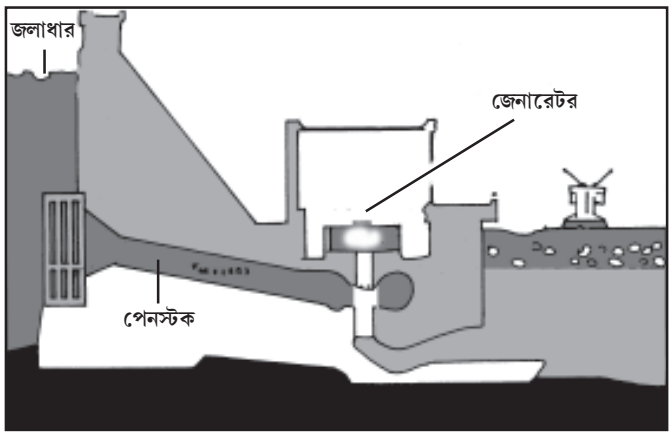

পেনস্টক। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে জল-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের এক ব্যবস্থা

পর্বতের গা বেয়ে জলের ধারা যত নিচে নেমে আসে, ততই তার গতিবেগ বাড়তে থাকে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় স্থৈতিক শক্তি, বা পোটেনশিয়াল এনার্জি ক্রমে পরিবর্তিত হয় গতিয় শক্তি বা কাইনেটিক এনার্জিতে। এই গতিয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘোরানো যায় ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। জল যাতে বিনা বাধায় উপর থেকে নিচে নেমে আসতে পারে, তাই নদীর উপর ও নিচের দিকের দুটি অংশকে মাটির নিচের সুড়ঙ্গ বা পাইপের সাহায্যে যুক্ত করা হয়। সুড়ঙ্গের নিচের দিকে বসানো হয় টারবাইন। উৎপাদনকেন্দ্রটি এমন জায়গায় বসানো হয়, যাতে ন্যূনতম দূরত্বে সর্বাধিক গতিবেগ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও একেকটি সুড়ঙ্গ ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘও হতে পারে।

বৃষ্টির জলে পুষ্ট যে কোনও মরসুমি নদীতে ভরা জল থাকে বছরে তিন থেকে

চার মাস। অথচ বিদ্যুতের প্রয়োজন বছরভর। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কোনও জায়গায় এক বিশাল কৃত্রিম জলাধার বানিয়ে জল সঞ্চয় করে রাখা হয়। ভাকরা বা মাইথনে এই ধরনের জলাধার আছে। এরজন্য উঁচু বাঁধ নির্মাণ করতে হয়। এইসব বাঁধ দিয়ে বয়ে যাওয়া বাড়তি জলের প্রবল উচ্ছ্বাস দেখতে খুব ভাল লাগে। তবে এই জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না। যে জলোচ্ছ্বাস টারবাইন ঘোরায়, তা নেমে আসে মাটির নিচে থাকা পাইপ বেয়ে, যার নাম পেনস্টক। ভূগর্ভে থাকার ফলে তা দৃশ্যমান হয় না।

যেসব জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে জলাধার এবং বাঁধ আছে, তাকে বলা হয় 'সঞ্চয়ী' বা 'স্টোরেজ টাইপ' প্রকল্প। যদিও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা হলেই আমাদের বাঁধের কথা মনে হয়, কিন্তু এই ধরনের প্রকল্পই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের একমাত্র উপায় নয়। তুষারগলা জলে পুষ্ট বারোমেসে নদীর ক্ষেত্রে জল সঞ্চয় করার প্রয়োজন হয় না। জলাধার ছাড়া এই ধরনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে বলা হয় 'রান অফ দ্য রিভার' প্রজেক্ট। উদাহরণ হিসাবে ভুটানের চুখা বা হিমাচল প্রদেশের নাথপা ঝাকরি নদীর প্রকল্পের নাম বলা যায়। এই প্রকল্পগুলিতে খানিকটা জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে, যাতে অত্যধিক চাহিদার সময় বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। আমাদের দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৬০ শতাংশই আসতে পারে এইরকম প্রকল্প থেকে। একই নদী থেকে ঝরনার মতো একাধিক 'রান অফ দ্য রিভার' প্রকল্প তৈরি করা যেতে পারে। ফলে উৎপাদনের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে অনেকগুণ।

আরও এক ধরনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে। তৃতীয় প্রকারের এই প্রকল্পকে বলা হয় 'পাম্পড স্টোরেজ' প্রজেক্ট। এই ধরনের প্রকল্পে উৎপাদন হয় একটু অন্য ভাবে। যে সময় বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকে, তখন বিদ্যুতের সাহায্যে পাম্প চালিয়ে নিচে তৈরি করা জলাধার থেকে উপরের জলাধারে জল তোলা হয়। আবার যখন চাহিদা বেশি থাকে, তখন উপরের জলাধার থেকে জল ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে এই রকম প্রকল্প যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৯৪০০০ মেগাওয়াট হতে পারে। তবে বর্তমানে প্রায় ৪০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গুটিকতক প্রকল্পই চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম সংযোজন হল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার একটি প্রকল্প। অযোধ্যা পাহাড়ের চূড়ার কাছে অবস্থিত একটি জলাধারে জল তোলার জন্য চারটি পাম্প ব্যবহৃত হয়। আবার যখন জলাধার থেকে জল নিচের দিকে পড়ে, তখন সেই পাম্পগুলিই জেনারেটরের কাজ করে। পাম্পগুলিতে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয়, আর জেনারেটর হিসেবে তারা উৎপাদন করে ৯০০ মেগাওয়াট। এক মিনিটের মধ্যে জেনারেটর চালু বা বন্ধ করা

যায়। আর জেনারেটর থেকে পাম্পে বা পাম্প থেকে জেনারেটরে পরিণত হতে সময় লাগে মাত্র ছ মিনিট।

এই ধরনের প্রকল্পের একটি সুবিধাজনক দিক হল, এখানে মাত্র দুই থেকে তিন দিনের মতো জল সঞ্চয় করলেই যথেষ্ট, যেখানে সঞ্চয়ী প্রকল্পের জলাধারগুলি এক বছরের জল সঞ্চয় করার মতো বিশালাকার হয়। তবে আমরা এই ধরনের প্রকল্প বেশি সংখ্যায় গড়ে তুলতে পারিনি, কেননা আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদার তুলনায় কম। তাই জল তোলার জন্য উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ কমই পাওয়া যায়।

পরিচ্ছন্ন এবং নবীকরণীয় উৎস হিসেবে জলবিদ্যুৎ গোটা পৃথিবীতেই খুব জনপ্রিয়। নবীকরণীয় উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৮০ শতাংশই বর্তমানে জলবিদ্যুতের দখলে। গোটা বিশ্বে জলবিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা হল প্রায় ৩৬০,০০০ মেগাওয়াট। উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে শীর্ষে আছে চীন, যার উৎপাদন ক্ষমতা ১১৫,০০০ মেগাওয়াট। এরপর আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ব্রাজিল। মনে করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে মোট ক্ষমতা আরও ৩৬০,০০০ মেগাওয়াট বাড়বে। পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও জলবিদ্যুতের আরও অনেক সুবিধা রয়েছে। ভারতের দুলহস্তি এবং বাসপায় সম্প্রতি চালু হওয়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মূলধনী ব্যয় ছিল ছয় থেকে সাত কোটি টাকা, যা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের তুলনায় সামান্যই বেশি। উপরন্তু এই প্রকল্প চালাতে কাঁচামালের খরচ নেই, তাই প্রকল্পের কার্যকালে বিদ্যুতের দাম কয়লা বিদ্যুতের তুলনায় কম। আমাদের দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রথম মূল্যায়ন হয়েছিল পাঁচের দশকে এবং তা ছিল ৪২০০০ মেগাওয়াট। আটের দশকে পুনর্মূল্যায়নের পর দেখা যায়, ৮৪৫টি কেন্দ্র থেকে মোট ৮৪০০০ মেগাওয়াট উৎপন্ন হতে পারে। এই হিসাব করা হয়েছে মোট ক্ষমতার ৬০ শতাংশ ব্যবহারের ভিত্তিতে। ভারত ও নেপাল যদি জলসম্পদ উন্নয়ন এবং জলবিদ্যুতের পারস্পরিক বিনিময়ের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে, তাহলে নেপালে অবস্থিত নদীগুলির থেকে আরও ৮০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে।

মাইথনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জলবিদ্যুতের সাহায্যে সন্ধ্যাবেলার অধিক চাহিদা পূরণ করা যায়। দিনের অন্য সময়ে প্রকল্পটি বন্ধ রাখলে শক্তিক্ষয়ও হয় না। অপরদিকে, কয়লাচালিত কোনও উৎপাদনকেন্দ্র যদি এই ভাবে বন্ধ করা হয়, তাহলে প্রচুর পরিমাণে উপযোগী তাপ নষ্ট হবে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে সহজে এবং অত্যন্ত দ্রুত বন্ধ বা চালু করা যায়। একটি শাটার নামালেই জল সরবরাহ বন্ধ করা দেওয়া যায়। তারপর দমকা হাওয়ায় টারবাইনও বন্ধ করে দেওয়া হয়। জলাধার ভিত্তিক প্রকল্পের সাহায্যে উৎপাদনকে বাড়ানো যায়, রান অফ দ্যা রিভার প্রজেক্টের সাহায্যে উৎপাদন কমানোও যায়। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এই দুই ধরনের প্রকল্পই অপরিহার্য।

গোটা দিনের বিদ্যুৎ চাহিদার লেখচিত্রকে বলা হয় ডেইলি লোড কার্ভ। এই লেখচিত্র আমাদের বলে দেয় সর্বাধিক চাহিদা বা পিক লোডের সঠিক পরিমাণ এবং সর্বাধিক আর সর্বনিম্ন চাহিদার মধ্যে পার্থক্য কতখানি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি সর্বাধিক চাহিদার সময়ের জন্য কতখানি জলবিদ্যুৎ প্রয়োজন। সর্বাধিক চাহিদা পূরণ করবার জন্য যথেষ্ট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা প্রয়োজন হলেও, জলবিদ্যুতের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা খুব একটা বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের দেশের কয়েকটি রাজ্যে এই ধরনের নির্ভরশীলতার নিদর্শন রয়েছে। এক্ষেত্রে, কোনও বছরে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হলে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি সমস্যায় পড়ে।

৫.২। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ●

মোট উৎপাদনক্ষমতার ৪০ শতাংশ আসবে জলবিদ্যুৎ থেকে—আকাঙ্খিত এই ক্ষমতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশ কয়েকটি সমস্যা। ফলে উন্নয়নের গতি ক্রমেই কমে গেছে। যে কোনও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাপ এবং অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রয়োজন উচ্চমানের জল সংক্রান্ত তথ্য। বাঁধের নকশা করার জন্য প্রয়োজন ভূতাত্ত্বিক তথ্য। আমাদের দেশের জরিপ এবং অনুসন্ধানের পদ্ধতি এখনও যথেষ্ট সেকেলে। অনেক সময়েই বাঁধ তৈরির কাজ মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রকল্পে রদবদল করতে হয়। প্রকল্প চালু হলে দেখা যায় অতিরিক্ত পলি জমে যাচ্ছে। ফলে জল সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমে যায়। এতে সময় এবং অর্থের অপচয় হওয়ার সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এবং নতুন প্রকল্প নির্মাণ নিয়ে আমাদের আগ্রহও কমে যায়।

সম্প্রতি, উন্নতমানের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এই ধরনের সমস্যা কিছুটা কমানো গেছে। সরকারি অনুমোদন এখন অনেক দ্রুত পাওয়া যায়। এমনকি চূড়ান্ত অনুমোদনের আগেও প্রকল্পে কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের বহু প্রকল্পের কাজ শেষ হতে ২০ বছরও সময় লেগে গেছে। সর্বাধিক সময় লেগেছে ৩৬ বছর! জলবন্টন নিয়ে একাধিক রাজ্যের মতবিরোধেও বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হতে বহু বছর দেরি হয়েছে।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে ওঠে প্রত্যন্ত, দুর্গম জায়গায়, যেখানে সড়ক বা অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধা বিশেষ মেলে না। এর ফলে প্রকল্পের খরচ অনেকটাই বেড়ে যায়। সাধারণত জলাধারভিত্তিক প্রকল্পের জন্য বহু মানুষকে বাস্তুহারা হতে হয়। সেই কারণেই এই ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সুতরাং স্থান নির্বাচন অথবা প্রকল্পের কাজ—দুক্ষেত্রেই দেরি হয়ে

যায়। এই সমস্যাকে কমাতে হলে যথাযথ প্রকল্প বাছা দরকার। যেসব প্রকল্পে বড় জলাধারের প্রয়োজন নেই, সেগুলিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন রান অফ দ্য রিভার বা পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প। তাছাড়া, অনেক প্রকল্পের যন্ত্রপাতি পুরানো হয়ে গিয়ে তাদের কার্যক্ষমতা কমে গিয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শক্তিশালী জেনারেটর বসিয়ে সেই প্রকল্পগুলি থেকেই আরও ২৫০০ মেগাওয়াট পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে মোট ৪০০০ জলাধার রয়েছে। অথচ, তার মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় মাত্র ২২৫টি জলাধার। অন্যান্য জলাধারগুলি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। এছাড়া, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ১৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। এই সব ক্ষেত্রগুলিকে আরও বেশি উৎপাদনশীল করার দিকটি আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। হাজার হাজার মানুষকে বাস্তুহারা করে বড় প্রকল্প গড়ে তোলার আগে এইসব দিক বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি। তা নাহলে প্রতিরোধের চাপেই আটকে যাবে অগ্রগতির পথ।

জলাধার তৈরি করলে বনভূমির ক্ষতি হয়। জলের স্রোতে পাহাড় ভেঙ্গে পড়লেও (ল্যান্ডস্লাইড) বনভূমি নষ্ট হয়। এই ল্যান্ডস্লাইড কিছুটা আটকানো যায় নতুন করে ঢাল তৈরি করলে। সব প্রকল্পেই এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা থাকে। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট অর্থ সঠিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করা খুবই দুরুহ। সাধারণভাবে, নদীর মাছেরও কিছুটা ক্ষতি হয়, এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন জলের প্রবাহ বন্ধ রাখলে, বাঁধের নিচের অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্যও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই ক্ষতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। পরিবেশের ক্ষতি রোধ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক বড় বাঁধ ভেঙে দিতেও হয়েছে।

একটি উন্নয়নশীল দেশে সেচ বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বড় বাঁধ কি অপরিহার্য, নাকি তা স্থানীয় মানুষের পক্ষে এবং পরিবেশের পক্ষে এতটাই ক্ষতিকর, যে আমাদের তা তৈরি করা বন্ধ করা উচিত? ১৯৯৭ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক বাঁধের প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য দিকগুলি খতিয়ে দেখতে এক আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করে। এই কমিশন বিভিন্ন দেশের সরকার, স্বেচ্ছসেবী সংস্থা এবং অন্যান্য নানা পক্ষের মতামত যাচাই করে এক সতর্ক সিদ্ধান্তে আসে। আর তা হল, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাঁধ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঠিকই, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্বার্থরক্ষাও প্রয়োজন। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা প্রকল্পের সুফল সবসময়ে পায় না। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার।

জলবিদ্যুৎকে ঘিরে গোটা বিশ্বের এই প্রবল আশঙ্কার দোলাচলের মধ্যেই চীনের ইয়াংসি নদীতে তৈরি হচ্ছে বিশাল থ্রি গর্জেস বাঁধ। কাজ সম্পূর্ণ হলে এটি হবে ২২,

৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ২.৩ কিলোমিটার এবং উচ্চতা ১১৫ মিটার। জলাধারটির ক্ষেত্রফল ১০০০ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি (যেখানে মাইথনের জলাধারের ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গ কিলোমিটার)। প্রকল্পের খরচ ৩০০০ কোটি ডলার। মজার ব্যাপার হল, এই প্রকল্পেও জেনারেটর সরবরাহ করবে সিমেন্স (যারা মাইথন প্রকল্পে জেনারেটর সরবরাহ করেছিল)। এই প্রকল্প থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বছরে তিন কোটি টন কয়লার বিকল্প হতে পারবে। এছাড়াও খনি থেকে প্রকল্প পর্যন্ত কয়লা পৌঁছে দিতে যে জ্বালানি খরচ হয়, তাও বাঁচবে। শুধু তাই নয়। ইয়াংসি নদী বন্যার জন্য কুখ্যাত, আর এই প্রকল্প সেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবে। এই সব সুবিধা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেই সঙ্গে এই প্রকল্পের খরচের অঙ্কও বিশাল। এই প্রকল্পের ফলে ৪০ লক্ষ মানুষকে পুনর্বাসিত করতে হবে। এই অঞ্চলে ভূকম্পনের মাত্রা বাড়ছে। এতবড় প্রকল্পের ফলে ভূমিক্ষয় থেকে ধস নামার আশঙ্কাও প্রবল। তাই পুনর্বাসিত মানুষদের সামনে রয়েছে আবারও ঘর হারানোর অনিশ্চয়তা। লাভ আর লোকসানের এই তুল্যমূল্য বিচার করবে কে?

১৯৯৮ সালে ভারত সরকার জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত নীতির কথা ঘোষণা করে। ২০০৮ সালে তাকে আরও পরিমার্জিত করা হয়। এই নীতির ফলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়নের গতি বেড়েছে। পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় দশম ও একাদশ পরিকল্পনায় উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধি ঘটেছে অনেক বেশি। সরকারের এই নীতিতে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, জলবিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পের ফলে গৃহহীন হয়ে পড়া মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের ৬৭টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের হদিশ দেওয়া হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির প্রস্তাবিত উৎপাদনক্ষমতা ১৮০০০ মেগাওয়াট। যেহেতু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের খরচের আগাম হিসাব করা কঠিন, তাই বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নিলামের থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত খরচের উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রক যে দাম নির্ধারিত করবেন, তারা তা ধার্য করতে পারবেন। তারা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রেতাদের আরও বেশি বিদ্যুৎও বিক্রি করতে পারবে। তবে শর্ত একটাই—প্রকল্পের কাজ সময় মতো শেষ করতে হবে।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎপন্ন বিদ্যুতের ১২ শতাংশ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার তার বরাদ্দ ১২ শতাংশ থেকে যদি ১ শতাংশ আঞ্চলিক উন্নয়ন তহবিলে দেয়, তাহলে প্রকল্প থেকে আরও ১ শতাংশ এই তহবিলে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। ২৫০ মেগাওয়াটের একটি প্রকল্পের বার্ষিক আয়ের দুই শতাংশ অন্তত তিন থেকে চার কোটি টাকা। এই টাকার অঙ্ক যথেষ্ট বড়। এছাড়াও, এই

প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে পরবর্তী ১০ বছর ধরে প্রতি মাসে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির যথাযথ পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য হবে তাদের আগেকার অবস্থায় না রেখে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। আর এই বিনামূল্যের বিদ্যুৎ হল পুনর্বাসনের শর্তের অতিরিক্ত। এই সব ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করতে পারলে আমরা দ্বাদশ পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ৩০,০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার আশা করতেই পারি।

যেসব প্রকল্পে ২৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাদের এখন ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পর্যায়ভুক্ত করা হচ্ছে। ৬০০০টি এই রকম ক্ষুদ্র কেন্দ্রের আনুমানিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০০ মেগাওয়াট। এর মধ্যে আমরা উৎপাদন করতে পেরেছি প্রায় ৩০০০ মেগাওয়াট। আরও ১০০০ মেগাওয়াট উৎপন্ন হবে শীঘ্রই। এই সব ক্ষুদ্র প্রকল্পে জল সঞ্চয়ের প্রয়োজন নেই। অতএব কারও বাস্তুহারা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং, এর সাহায্যে কম খরচে প্রত্যন্ত গ্রামেও বিদ্যুতায়ন সম্ভব হবে। এইসব প্রকল্পের জন্য যেসব ছাড় বা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তা বেশ ভাল পরিমাণে বেসরকারি বিনিয়োগ আনতে পেরেছে। এ পর্যন্ত উৎপন্ন ৩০০০ মেগাওয়াটের এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ১০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি হচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগে। এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত আরও ছোট মাপের প্রকল্প নিয়ে সরকারি সংস্থার বিশেষ মাথাব্যথা নেই, কেননা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে মেগাওয়াটে। তবে, এক মেগাওয়াটেরও কম ক্ষমতাসম্পন্ন অতি ক্ষুদ্র এই প্রকল্পগুলি থেকেও কিন্তু অনেক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। ■

ষষ্ঠ অধ্যায় সৌরশক্তি

৬.১। একটি নবীকরণীয় শক্তি ●

একথা সত্যি যে জীবাশ্ম বা ফসিল জাত জ্বালানি অর্থাৎ পেট্রোলিয়ম, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লা সারা বিশ্বের শক্তি চাহিদার তিন চতুর্থাংশই পূরণ করছে। কিন্তু, তার সঙ্গে এটাও সত্যি যে ধীরে ধীরে তাদের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে নবীকরণীয় শক্তি। আমরা জানি যে জীবাশ্ম-জাত জ্বালানি চিরকাল থাকবে না এবং অনেকেরই আশঙ্কা ২০৫০ সালের বেশ কিছুটা আগেই এই জ্বালানির তীব্র সঙ্কট দেখা দেবে। প্রাথমিকভাবে সেই কারণেই শুরু হয়েছে নবীকরণীয় শক্তির উৎস-সন্ধান ও ব্যবহারের চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, তেল ও গ্যাসের সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে বারবারই নানা অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। অনিয়মিত সরবরাহ-জনিত এই সমস্যা থেকে বেরোবার সবথেকে নির্ভরযোগ্য পথই হল নবীকরণীয় শক্তি। রাশিয়া থেকে গ্যাস সরবরাহের সাম্প্রতিক সমস্যাই ইউরোপকে নবীকরণীয় শক্তির পথ খুঁজতে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করেছে। সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠলে এই নবীকরণীয় শক্তি প্রত্যেক দেশকে শক্তির ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তুলবে এবং শক্তিক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজন কমবে। অবসান হবে শক্তি-সংক্রান্ত অনেক আন্তর্জাতিক বিরোধ ও বিবাদের। তবে, সেই সুখের সময় আসতে এখনও অনেক দেরি।

জীবাশ্ম-জাত জ্বালানি সকলের জন্য প্রচুর পরিমানে সহজলভ্য হলেও অনির্দিষ্টকাল ধরে তার ব্যবহার একেবারেই কাম্য নয়। কারণ, এর থেকে পরিবেশ দূষণের বিপদ ভয়াবহ। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং মোটরগাড়ি থেকে ক্রমাগতই বেরনো বিষাক্ত ধোঁয়া আটকাতে পর্তুগাল বা জার্মানির মত দেশের পথেঘাটে, শহরে সর্বত্র নবীকরণীয় শক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পরিবেশের অবনতি আটকাতে বিভিন্ন দেশের সরকারকে পরামর্শ দেয় বৈজ্ঞানিকদের এক আন্তর্জাতিক সংগঠন, ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই পি সি সি)। এই বিজ্ঞানীদের অভিমত, ২০৫০ সালে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত শক্তির ৮০ শতাংশই আসতে পারে নবীকরণীয় উৎস থেকে। নবীকরণীয় শক্তির আরও একটি সুবিধা হল, প্রয়োজন অনুসারে এই শক্তি দিয়ে খুব ছোট থেকে বড়—নানা মাপের বিদ্যুৎ

উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। কয়লা চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে, একথা কল্পনাই করা যায় না। এই রকম একটি কেন্দ্রের ন্যূনতম উৎপাদন ৫০০ থেকে ৮০০ মেগাওয়াট। অপরদিকে সৌর, বায়ু বা জৈবজ্বালানি-জাত বিদ্যুৎকেন্দ্রে খুব সহজেই এক থেকে ৫০ মেগাওয়াট এমনকি ১০ থেকে ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। ফলে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণও সম্ভব।

এখনও পর্যন্ত প্রথাগত শক্তির তুলনায় নবীকরণীয় শক্তির উৎপাদন অনেক বেশি খরচ সাপেক্ষ। সে কারণেই এ'টির প্রচলনে সরকারি আনুকূল্য প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, স্পেন, ভারত এবং চীন সহ বেশ কয়েকটি দেশ নবীকরণীয় শক্তির ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, গবেষণা ও উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানাতে নতুন নীতিও প্রণয়ণ করেছে। বিশ্বে উৎপন্ন বিদ্যুৎতের ১৯ শতাংশ আসে নবীকরণীয় উৎস থেকে। এর গরিষ্ঠাংশই জলবিদ্যুতের দখলে। সৌর, বায়ু বা ভূগর্ভস্থ তাপ বা জিওথারমাল এবং ওয়েভ-এর অবদান বর্তমানে কম হলেও তা ক্রমেই বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত প্রাচুর্য এবং সহজলভ্যতার নিরিখে সৌরশক্তিই সব থেকে এগিয়ে এবং ভবিষ্যতও উজ্জ্বল।

সূর্যের অভ্যন্তরে পরমাণুর অনবরত সংযোজন থেকেই তার শক্তি পায় সূর্য। এই সংযোজনের ফলে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ টন হাইড্রোজেন পরিণত হয় হিলিয়ামে। সূর্য-কেন্দ্রের এই শক্তি পুরোটাই থাকে গামা রশ্মির তীব্র বিকিরণের আকারে। বহির্বৃত্তে এসে ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আমাদের কাছে তা সূর্যরশ্মি হিসাবে দেখা দেয়। সূর্যের অভ্যন্তর থেকে বহির্বৃত্তের দিকে এই যাত্রায় ফোটন কণাগুলির সময় লাগে কয়েক লক্ষ বছর। এরপরে, পৃথিবীর পথে যাত্রা একেবারেই সাদামাটা। ১৫ কোটি কিলোমিটারের দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগে স্রেফ সাড়ে আট মিনিট।

সূর্যরশ্মি ভূ-মন্ডলে এলে কিছুটা তাপ এবং আলো প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় এবং কিছুটা মেশে বাতাসে। তাতে বাতাস কিন্তু সর্বত্র সমান তপ্ত হয় না। এই অসম উত্তাপের ফলে তৈরি হয় উচ্চ ও নিম্নচাপ অঞ্চল এবং বিভিন্ন রকমের বায়ুপ্রবাহ। অবশিষ্ট রশ্মিকে মেঘ, ধূলিকণা কিছুটা প্রতিফলিত করে, বাকিটা গৃহীত বা নিক্ষিপ্ত হয়। ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানো কিরণ সূর্যের থেকে আসা আলোর দুই তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক। ক্ষীয়মান এই রশ্মি কিন্তু নেহাত কম নয়। প্রতি ১৫ মিনিটে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানো সৌরশক্তি পৃথিবীতে এক বছরে খরচ হওয়া পরমাণু ও জীবাশ্ম জ্বালানির সমান।

প্রাচুর্য থাকলেও সৌরশক্তির বিস্তার লঘু বা খুব পাতলা। রুটি সেঁকতে হলে চাটুকে প্রায় ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গরম করতে হয়। গ্যাস চুল্লি এই কাজ করে প্রতি বর্গমিটারে ২০ হাজার ওয়াট উত্তাপে। সাধারণভাবে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সূর্য থেকে প্রতি বর্গমিটারে

এক হাজার ওয়াট শক্তি পাওয়া যায়—অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সূর্যালোকের তুলনায় গ্যাস চুল্লি ২০ গুণ বেশি শক্তি সরবরাহ করে। সূর্যের আলো তাপে পরিণত করতে হলে ছোট জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা দরকার। আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে রৌদ্রের আলোয় কাগজে আগুণ ধরানোর সাদামাটা পরীক্ষা আমরা প্রায় সকলেই করেছি। সূর্যালোকের শক্তি বোঝার জন্য এই পরীক্ষা যদি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে না হয়, তাহলে আর একটি ঘটনার কথা বলা যাক। খ্রিষ্টপূর্ব ২১২তে রোমানরা সাইরাকিউজ অবরোধ করলে আর্কিমিডিস ব্রোঞ্জের আয়না ব্যবহার করে রোমান-জাহাজের পালে আগুন লাগিয়ে দেন। নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচে সাইরাকিউজ।

রান্না, ঘর বা জল গরম কিংবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও সৌরশক্তির সরাসরি প্রয়োগে উৎপন্ন হতে পারে বিদ্যুৎও। দু'ভাবে হতে পারে এই উৎপাদন। সৌরালোকে তপ্ত গ্যাস বা তরল থেকে উৎপন্ন বাষ্পে চালানো যেতে পারে ইঞ্জিন ও জেনারেটর। একে বলা হয় সৌর তাপ-বিদ্যুৎ। অথবা, ফোটোভোলটায়িক কোষের উপর সূর্যের আলো ফেলে ইঞ্জিন বা জেনারেটর ছাড়াই সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ফোটোভোলটায়িক কোষ তৈরি করা হয়েছিল মহাকাশযানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য। পরে, কম পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় সাশ্রয়কারী হিসেবে এই কোষের ব্যবহার চালু হয় নানা ক্ষেত্রে—যেমন, সমুদ্রস্থ তেল নিষ্কাশন প্ল্যাটফর্ম, প্রত্যন্ত গ্রাম অথবা ক্যালকুলেটর বা ইলেকট্রনিক ঘড়ি।

৬.২। সৌর তাপবিদ্যুৎ ●

কয়লা এবং গ্যাস-এর মত প্রথাগত জ্বালানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে সৌর তাপবিদ্যুৎকে। বর্তমানে হাতে গোণা এমন কয়েকটি দেশের বাজারেই এই বিদ্যুৎ সীমিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যারা দূষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন জ্বালানির স্বার্থে বেশি দাম দিতে রাজি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল ক্যালিফোর্নিয়া—এখানকার মোজাভ মরুভূমিতে নির্মিত হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রকল্প। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে মোট ৩৫৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন নটি প্রকল্পের এক গুচ্ছ তৈরি হয়, যার নাম সোলার এনার্জি জেনারেটিং সিস্টেম (এস ই জি এস)। এই প্রকল্পগুলিতে ৬.৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কয়েক লক্ষ অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক উত্তর-দক্ষিণ বরাবর রাখা হয়েছে, যাতে সারাদিন ধরে সব থেকে বেশি পরিমাণ সূর্যালোক প্রতিফলিত হতে পারে। ফলকে প্রতিফলিত এই রশ্মি তপ্ত করে ইস্পাতের টিউবের মধ্যে থাকা তরল। ৯৮ শতাংশ সৌরালোক বিশোষিত করতে পারে এই টিউব। ইস্পাতের টিউবটি আবার রাখা হয় দু'দেওয়াল বিশিষ্ট কাঁচের

আবরণের মধ্যে। এই দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী অংশ বায়ুশূন্য। বায়ুশূন্য এই আবরণীর সুরক্ষায় সূর্যালোকে সরাসরি তপ্ত ইস্পাতের টিউব ঠাণ্ডা হতে পারে না এবং এই তাপ থেকেই শুরু হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া।

সাধারণতঃ সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দক্ষতা প্রায় ২০ শতাংশ। অর্থাৎ ৩৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে আমাদের ১৭৭০ মেগাওয়াট সৌরশক্তি সংগ্রহ করতে হবে। সৌরশক্তির হিসাব অনুযায়ী প্রতি বর্গ মিটার প্রতিফলকে গড়ে এক হাজার ওয়াট সৌরশক্তি পড়ে। মোজাভের তথ্যও প্রায় একই কথা বলে। অর্থাৎ, এখানে এক বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের ১৭ লাখ ৭০ হাজার প্রতিফলক বা আয়নার প্রয়োজন। বাস্তবে, এখানে ২৫ লক্ষ বর্গ মিটার প্রতিফলক ব্যবহার করা হয়—সম্ভবত সব প্রতিফলক সবসময় কাজ করে না। অধিবৃত্তাকার এই প্রতিফলক তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে এবং খরচ কমাতে যথাসম্ভব পাতলা করা হয় এই পাত। তবে এই পাতকে আবার মরুভূমির হাওয়ায় যথাযথ আকারে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তাই খুব পাতলা হলেও চলবে না। প্রতিফলকের খরচ মোট প্রকল্পের খরচের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। তাই এই খাতে খরচ কম থাকলে সৌর তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্পের খরচও কম হবে।

খরচ কমাবার আরও একটি উপায় হল উৎপাদনের সময় বাড়ানো। সৌরশক্তিকেন্দ্রগুলি রাতে অথবা মেঘলা দিনে কোনও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে না বলেই তাদের উৎপাদন সীমিত। অপরদিকে গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে সৌরশক্তি এতই বেশি থাকে যে তার পূর্ণ ব্যবহার জেনারেটরও করতে পারে না। এই উত্তাপ সঞ্চয় করতে পারলে আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। কয়েকটি প্রকল্পে গলানো লবণের মাধ্যমে এই তাপ সঞ্চিত করে ট্যাঙ্কে রাখা হয়। গলিত এই লবণ দীর্ঘসময় উত্তাপ ধরে রাখতে পারে বলে রাতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

এস ই জি এস-এর পরে মোজাভ সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি জায়গায় সৌরশক্তি-প্রকল্প তৈরি হয়েছে—যেমন নেভাদা বা অ্যারিজোনা। তৈরি হয়েছে জার্মানি এবং স্পেনেও। ক্যালিফোর্নিয়ার ১০ মেগাওয়াটের সৌরশক্তি প্রকল্প সোলার ওয়ান পৃথক এক ধারণায় তৈরি। এখানে একটি মিনারের উপর বসানো ইঞ্জিনের তরল বাষ্পায়িত হয় কয়েক হাজার প্রতিফলকের আলোর থেকে উৎপন্ন তাপে। এই প্রতিফলকগুলিকে বলে হিলিওস্ট্যাট। সব সময়েই সূর্যের আলো সমানভাবে পাবার জন্য দু'ভাবে সূর্যের গতিকে অনুসরণ করে হিলিওস্ট্যাট। দিনের বেলা পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার পরের দিন, সূর্যের অক্ষাংশ অনুযায়ী দক্ষিণ অথবা উত্তরে ঘুরে যায় সবকটি প্রতিফলকই। হিলিওস্ট্যাটের আকার অধিবৃত্তাকার নয়, তারা প্রায় সমতল। সোলার ওয়ানের পর তৈরি হয় আরও একটি ১০ মেগাওয়াটের প্রকল্প—সোলার টু। এই দুটি প্রকল্পই ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনের

সম্ভাব্যতার প্রমাণও দিয়েছে। তবে, খুব কম শক্তি উৎপন্ন হওয়ায় এদের বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা নেই বললেই চলে। বাণিজ্য-সম্ভব হতে গেলে অন্তত ৫০ থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে হবে।

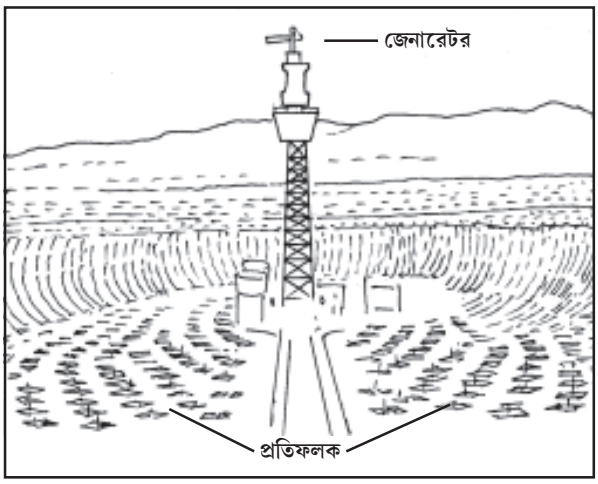

সৌর মিনার

ইউরোপের প্রথম সৌর-মিনার গড়া হয় স্পেন-এ, সেভিল-এর বাইরে। ১১৫ মিটার উচ্চতার এই মিনার অনেকটা ৪০ তলা অট্টালিকার মতো। ১২০ বর্গমিটারের ৬০০টি হিলিওস্ট্যাটে যখন সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় এই মিনারে, তখন তা এক অসাধারণ দৃশ্য! এই কেন্দ্রে বর্তমানে ১১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও কয়েক হাজার প্রতিফলক যুক্ত হলে এই পরিমাণ অবশ্যই বাড়বে। এই কেন্দ্রটি তৈরি করেছে স্প্যানিশ সংস্থা অ্যাবেনগোয়া (Abengoa)। এদের দাবি, তিলমাত্র গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমণ ছাড়াই এই কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

বর্তমানে, সৌর-তাপবিদ্যুৎ জেনারেটরের মোট স্থাপিত ক্ষমতা ১০০০ মেগাওয়াটেরও কম। এইধরণের প্রকল্প স্থাপনের খরচ প্রতি কিলোওয়াট তিন থেকে চার হাজার ডলার । তুলনামূলকভাবে, গ্যাসচালিত প্রকল্পের খরচ প্রতি কিলোওয়াট হাজার ডলারেরও কম। তা সত্ত্বেও নতুন এই প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে এবং মোট ৪০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, লিবিয়া, ইরান এবং চীনে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক ব্যবহৃত হবে। কারণ, হিলিওস্ট্যাটযুক্ত সৌর-মিনার যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। এইরকম প্রকল্পের সংখ্যা কমই হবে। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের আর একটি উপায় হল স্টারলিং ইঞ্জিনের সঙ্গে ফ্রেনেল রিফ্লেক্টর (Fresnel Reflector) নামে অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক ব্যবহার করা। বিশ্বের বিভিন্ন পরীক্ষাগারে এই প্রযুক্তি প্রদর্শিত হচ্ছে এবং এর মধ্যে গুরগাঁও-য়ের সোলার এনার্জি সেন্টারও রয়েছে।

অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক

৬.৩। সৌর ফোটোভোলটায়িক ●

তামা বা অ্যালুমিনিয়মের মতো পরিবাহীতে আলোর বিকিরণে মুক্ত হয় ইলেকট্রন। একেই বলে ফোটোইলেকট্রিক ক্রিয়া। এই ইলেকট্রন সংগৃহীত হতে পারে অন্য একটি পরিবাহীর মাধ্যমে। আলোর প্রভাবে এই দুটি পরিবাহীর মধ্যে চলতে থাকে বিদ্যুৎপ্রবাহ। আমরা সাধারণভাবে জানি আপেক্ষিকতাবাদের জন্যই আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই ফোটোইলেকট্রিক ক্রিয়ার উপর গবেষণার জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কার পান। যদি সিলিকনের কেলাসের (Crystal) মতো কোনও অর্ধপরিবাহীর উপর আলো পড়ে, তাহলে ইলেকট্রনকে মুক্ত করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। কারণ, অর্ধপরিবাহীর ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে অনেক নিবিড়ভাবে যুক্ত। কয়েকটি ইলেকট্রন অবশ্য কিছুটা শক্তিসঞ্চয় করে নিউক্লিয়াসের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেলাসের মধ্যে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। তাদের খালি করা জায়গাগুলিকে বলা হয় হোল বা 'শূন্যতা'। এই হোলগুলিও ধনাত্মক বা পজিটিভ আধানযুক্ত কণার মতো ঘুরে বেড়ায়। সাধারণত, খুব অল্পসময়ের মধ্যেই মুক্ত ইলেকট্রন আর এই হোলের মধ্যে মিলন হয়। তবে, এই কেলাস যদি বিদ্যুৎক্ষেত্রে রাখা হয়, তাহলে ইলেকট্রনগুলি একদিকে যাবে এবং হোলগুলি অন্যদিকে। যতক্ষণ এই ইলেকট্রন বা হোল চলমান থাকবে, ততক্ষণই চলবে তড়িৎপ্রবাহ।

এই মুক্ত ইলেকট্রন বা হোল অন্যভাবেও পাওয়া যেতে পারে। সিলিকনের কেলাসে কয়েকটি বোরনের পরমাণু ঢুকিয়ে দিলে কয়েকটি হোল তৈরি হয়। আবার একই কেলাসে যদি আর্সেনিকের পরমাণু যোগ করা যায় তাহলে পাওয়া যায় কিছু মুক্ত ইলেকট্রন। প্রথম কেলাসটিকে বলা হয় 'পি টাইপ' সেমিকনডাকটর বা অর্ধপরিবাহী এবং দ্বিতীয়-টিকে বলা হয় 'এন টাইপ' সেমিকনডাকটর। এই দুটিকে যুক্ত করলে মুক্ত ইলেকট্রন গিয়ে শূন্যতা বা হোলগুলিকে ভরাট করে। 'পি টাইপ' অর্ধপরিবাহীটি ঋণাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত হয় এবং ইলেকট্রন খুইয়ে 'এন টাইপ' হয় ধনাত্মক আধানযুক্ত। এর ফলে এই দুটির সংযোগস্থল বা জাংশনের আড়াআড়ি তৈরি হয় একটি তড়িৎক্ষেত্র। ফোটোভোলটায়িক কোষ বা সেল এমনই একটি পি এবং এন টাইপের কেলাসের সমন্বয়। এর উপর আলো পড়লে মুক্ত ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয় এবং তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে ইলেকট্রনগুলি একটি বর্তনী বা সার্কিটের দিকে চালিত হয়। যতক্ষণ আলো জ্বলতে

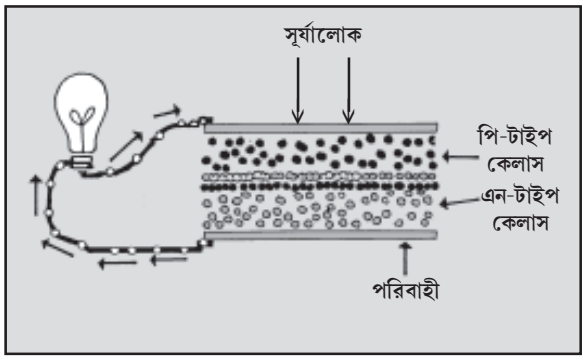

সৌর-ফোটোভোল্টাইক সেল যে ভাবে কাজ করে।

থাকে এই সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। সৌর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মতো, এই কোষগুলিও রাতে অথবা মেঘলা দিনে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে না। ফোটোভোলটায়িক কোষে উৎপন্ন হয় বিদ্যুতের একমুখী প্রবাহ। প্রতিবর্তী প্রবাহের প্রয়োজন হলে সৌরকোষের সঙ্গে একটি ইনভার্টার ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম দফায়, এই কোষগুলি তৈরি হয়েছিল সেলেনিয়াম দিয়ে। এর কর্মদক্ষতাও কম ছিল আর বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচও অনেক বেশি। মহাকাশযানে এই কোষগুলি ব্যবহার করার সময় খরচ নিয়ে বিশেষ চিন্তা ছিল না। কিন্তু এই প্রযুক্তি যখনই ব্যাপক হারে ব্যবহার করার কথা ভাবা হল, তখনই শুরু হল ব্যয়সঙ্কোচের উপায় সন্ধান—বাছা হল সিলিকন। ফোটোভোলটায়িক কোষে ৯৯.৯ শতাংশ শুদ্ধ সিলিকনকে গলিয়ে তৈরি কেলাস এক মিলিমিটারের এক চতুর্থাংশের মতো পাতলা করে কেটে ফেলা হয়। পাতলা এই টুকরোর দু'দিকে স্প্রে করা হয় বোরন এবং আর্সেনিক। আলোর প্রতিফলন আটকাবার জন্য একটি বিশেষ আবরণ দেওয়া হয় উপরের দিকে এবং নিচে থাকে একটি কাঁচের আস্তরণ। বিদ্যুৎ সংগ্রহের জন্য পরিবাহীগুলি রাখা হয় সিলিকনের এই পাতলা টুকরোর উপর এবং পুরো কাঠামোটিকে ধুলো এবং বাষ্পের থেকে বাঁচাতে ল্যামিনেট করা হয়। সৌর ফোটোভোলটায়িক কোষ এবার ব্যবহারের জন্য তৈরি।

এই কোষের উৎপাদন দ্বিগুণ হওয়ার ফলে এর দাম কমেছে ২০ শতাংশ। সৌর তাপ-বিদ্যুতের ক্ষেত্রে খরচ কমেছে ১২ শতাংশ। তা সত্ত্বেও কয়লা বা গ্যাস থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের তুলনায় সৌর বিদ্যুতের দাম অনেক বেশি। তাই, কম দামি কোষের সন্ধান এখনও চলছে। খরচ আরও কমিয়ে দিয়েছে কেলাস থেকে কাটা সিলিকনের টুকরোর থেকেও আরও একশো গুণ পাতলা সিলিকন-ফিল্মের ব্যবহার। গ্যালিয়াম-আর্সেনাইড, ক্যাডমিয়াম-টেলুরিয়াম এবং ক্যানাডিয়াম-ইন্ডিয়াম-জার্মেনিয়াম-সেলেনাইড (সি আই জি এস) এর মতো অর্ধপরিবাহী দিয়েও খরচ কমানো যায়। সিলিকনের কেলাসের কর্মদক্ষতা ১৬ থেকে ২৫ শতাংশ। পাতলা ফিল্মের কার্যকারিতা কম কিন্তু এর খরচও কম। বাড়ির ছাতের উপর যে সৌর প্রতিফলক বা প্যানেল বসানো হয়, তা যথাসম্ভব দক্ষ হওয়া উচিত। কারণ এখানে ক্ষেত্রফল হবে কম। কয়েক হাজার একর জুড়ে যে প্যানেল বসবে, সেগুলির দক্ষতা কিছু কম হলেও চলবে, কিন্তু দাম কম হওয়া প্রয়োজন। আর দামের এই পার্থক্য যতদিন থাকবে ততদিন প্রথম ক্ষেত্রে সিলিকন কেলাস এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাতলা ফিল্মের ব্যবহারই উপযুক্ত হবে।

গাছের পাতা যে পদ্ধতিতে আলোক কণা থেকে খাবার তৈরি করে, সেই বিজ্ঞান কাজে লাগিয়ে সৌরকোষ তৈরি ও তার কার্যকারিতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। এও দেখা

গেছে যে সাদা রঙে ব্যবহৃত টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড সৌরকোষের উপযোগী অর্ধপরিবাহী। দেওয়াল বা ছাতে টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড দিয়ে রং করলে, সৌর-প্রতিফলক লাগানোর জায়গার সঙ্কট মিটতে পারে।

কয়েক ধরনের পলিমার এবং প্লাস্টিক দিয়েও ফোটোভোলটায়িক কোষ বানানো হচ্ছে। কারণ এগুলি দামেও কম, ওজনেও হালকা। নমণীয় পাতে বানানোর ফলে এই কোষগুলি দেওয়াল, জানালার কাঁচ এমনকি গাড়ির ছাতেও বসানো যায়। জৈবকোষের বাণিজ্যিক ব্যবহারে এখনও কিছুটা দেরি আছে, কেন না এর কর্মদক্ষতা বর্তমানে ৩ থেকে ৫ শতাংশ—অন্তত ১০ শতাংশ কর্মদক্ষতা অর্জন করতে না পারলে বাণিজ্য সম্ভব হওয়া কঠিন। ন্যানো টেকনোলজির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। সিলিকন পাত বা ওয়েফার-এর উপর কার্বন এবং সিলিকনের ন্যানোটিউব বসিয়ে আলোর ব্যবহার আরও দক্ষভাবে করা যায়। সৌর কোষে ন্যানো ফ্লেকস নামে অতি ক্ষুদ্র কেলাস ব্যবহারের চেষ্টাও চলছে। এছাড়া অর্ধপরিবাহীর মাত্র কয়েকশো অণু দিয়ে তৈরি অত্যন্ত ক্ষুদ্র 'কোয়ান্টাম ডট'- কে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা আমাদের দেশের আই আই টি-গুলির। এই প্রযুক্তির উদ্দেশ্য, পাতলা ফিল্মের সৌরকোষের দক্ষতা বাড়িয়ে অন্তত ৩০ শতাংশ করা।

বর্তমানে, সারা বিশ্বে উৎপন্ন সৌর ফোটোভোলটায়িক বিদ্যুতের পরিমান প্রায় ৭০,০০০ মেগাওয়াট। এরমধ্যে ইউরোপেই উৎপন্ন হয় ১৭০০০ মেগাওয়াট। বৃহত্তম উৎপাদক হল জার্মানি, তারপরেই আছে স্পেন। এই উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত বেড়েছে—মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে গেছে বার্ষিক ৭০ শতাংশ হারও। তার কারণ, মাসুলে আকর্ষণীয় ছাড়। বৃহৎ পরীক্ষামূলক প্রকল্পে সাহায্য করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান। বাড়ির ছাতে সৌর প্যানেল বসিয়ে ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে জাপান। দশ লক্ষেরও বেশি বাড়ির মালিক এই প্রকল্পে অংশ নেবে। ছাতের উপর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা হল—উৎপাদন কেন্দ্রেই বিদ্যুতের ব্যবহার। ফলে ইউনিট পিছু উৎপাদন-খরচ বেশি হলেও এড়ানো যায় বহন ও সরবরাহের খরচ অথবা অপচয়। অন্য দিকে, সৌর ফোটোভোলটায়িক কোষের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বৃহৎ প্রকল্পের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বৃহত্তম প্রকল্পটি অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ায় ২০১৩ থেকে কার্যকর হবে। ১৫৪ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতার এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ৩৯ কোটি ডলার। অর্থাৎ, প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুতের দাম হবে বেশ চড়া—২৫০০ ডলার! সৌর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অণুকরনে এই কেন্দ্রেও সূর্যের গতি এবং অক্ষাংশ অনুযায়ী দিক পরিবর্তনকারী প্রতিফলক বা আয়না ব্যবহার হবে। এই আয়নায় প্রতিফলিত আলো গিয়ে পড়বে সৌর-প্যানেলে। ফলে, এখানে সূর্যরশ্মি এত তীব্রভাবে কেন্দ্রীভূত হবে যে সাধারণত ৩৫০বর্গমিটার সৌরকোষ থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় মাত্র ০.২৩ বর্গমিটার কোষ থেকেই তা পাওয়া যাবে।

জার্মানির মতো বিশেষ উদ্যোগী না হলেও মার্কিন সরকার সেই সাতের দশক থেকেই সৌরশক্তির গবেষণা ও উন্নয়নে উৎসাহ দেখিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৌর তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। ২০২০ সালের মধ্যে ফোটোভোলটায়িক কোষ থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ এবং সৌর তাপ-বিদ্যুতের দাম কমাতে শিল্প জগতের প্রতিনিধি এবং বিজ্ঞানীদের নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার উদ্যোগ নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডি ও ই (Dept.of Energy)।

ভারতে বেশ কয়েক দশক ধরেই একটি বৃহৎ ফোটোভোলটায়িক প্রকল্প চালু রয়েছে। আমরা বছরে ৩০০টি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন পাই, আর, সেইসঙ্গে অধিকাংশ জায়গাতেই পাই প্রতি বর্গমিটারে ৩০০ থেকে ৬০০ ওয়াট সৌরশক্তি। আমাদের দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এখনও পৌঁছয়নি, অথবা সেই সরবরাহ অনিয়মিত এবং দুর্বল। সেই সব ক্ষেত্রে বৈদুতিকরণের সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য উপায় হল সৌরশক্তি। বর্তমান ভারতের গ্রামাঞ্চলে খড়ের চালের উপর সৌর প্যানেল এখন এক পরিচিত দৃশ্য। এমন একটি প্যানেল গ্রামের মানুষের জীবন আমূল বদলে দিতে পারে। এই বিদ্যুতের দাম বেশি, সম্ভবত ইউনিট পিছু ১৫ টাকা—কিন্তু এক্ষেত্রে প্রয়োজন এতটাই কম, যে একজন দরিদ্র কৃষকও এই খরচ বহন করতে পারে। ৩০ থেকে ৪০ ওয়াটের একটি প্যানেল থাকলে দুটি আলো সারাদিনে তিন ঘন্টা জ্বলতে পারে, চলতে পারে একটি পাখা অথবা সাদা-কালো টেলিভিশন। বর্তমানে ভারতের প্রায় ২০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার সৌর আলো ব্যবহার করছে।

সৌর ফোটোভোলটায়িক কোষের ব্যবহার এখন আর প্রত্যন্ত অঞ্চল কিংবা ছাতের উপর সীমাবদ্ধ নয়। গত কয়েক বছরে দেশে ফোটোভোলটায়িক কোষ থেকে এক মেগাওয়াটের বেশি সৌর-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী একাধিক সংস্থা তৈরি হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহও করছে। ২০১০ সালে জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় অ্যাকশন প্ল্যানের (ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) অধীনে নেহরু সোলার মিশন নামে এক সৌরশক্তি প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য, ২০২০ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াট সৌর-বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এই বিদ্যুৎ গ্রিডের মাধ্যমে সংবহন। এই বিদ্যুতের অর্ধেক আসবে সৌর তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে এবং বাকিটা ফোটোভোলটায়িক কোষ থেকে। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ভার দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি সংস্থাকে। টেন্ডারের মাধ্যমে নির্বাচিত এই সংস্থাগুলি যদিও আগের চেয়ে কম দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করবে, তবুও এই দাম এখনও অনেক বেশি। সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, প্রয়োজন অনুযায়ী সস্তার বিদ্যুতের সঙ্গে মিশিয়ে এই সৌর-বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হবে।

সৌরশক্তি না কেরোসিন? ●

কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে যদি একশ' কি দেড়শ'টি পরিবার পাওয়া যায় যারা সৌরশক্তি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, তাহলে তাদের জন্য একটি ১০-১৫ কিলোওয়াটের প্যানেল বসিয়ে একটি ছোট গ্রিডের মাধ্যমে তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যায়। এতে সুবিধা এই যে দরিদ্র যে সব মানুষ সৌর প্যানেলের খরচ বহন করতে পারেন না, তারা মাসিক টাকা দিয়ে এই প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ পেতে পারেন। সুন্দরবন অঞ্চলে এই ধরনের বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে যেখানে সব মিলিয়ে এক মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সরবরাহ হয় ৫০০০ গৃহস্থালীতে। সৌরশক্তির সঙ্গে বায়ুশক্তি বা জৈবপদার্থজাত (বায়োমাস)-শক্তি যুক্ত করে চালানো প্রকল্পও সফল। এই রকমই একটি প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া দরিদ্র এক ধীবর লেখককে জানিয়েছিল, বিদ্যুতের বিল দেওয়া তার পক্ষে কিছুটা কষ্টকর হলেও সে কোনক্রমে তা দিয়ে দিতে পারে। তার পরিবারের জন্য মাসে চার লিটার কেরোসিন তেল বরাদ্দ। রেশন দোকানে কেরোসিনের দাম ১০ টাকা প্রতি লিটার আর খোলা বাজারে ৩০ টাকা। নিজের বরাদ্দের তেল বিক্রি করে এই ব্যক্তি পায় মাসে ৮০ টাকা। সেই টাকার সঙ্গে আরও কিছুটা টাকা দিয়ে সে মাসে ১২০ টাকার সৌর-বিদ্যুতের বিল দেয়। কেরোসিনে ভর্তুকি সৌরশক্তি-প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা অন্তরায় হলেও সর্বত্র তা অলঙ্ঘনীয় বাধা হয়ে ওঠে নি।

গ্রিডের মাধ্যমে সরবরাহ ছাড়াও আরও ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে এই প্রকল্পে। দু'ভাবে উৎপন্ন হতে পারে এই বিদ্যুৎ—বিভিন্ন বসত বাড়ির ছাতে বসানো সৌর প্যানেল থেকে অথবা, দুই মেগাওয়াট পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহত্তর কেন্দ্র থেকে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে নিকটবর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে। কেন্দ্র নির্বাচনের দায়িত্ব বিভিন্ন রাজ্য সরকারের এবং মাসুল ঠিক করবে সেই রাজ্যের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। এই প্রকল্পের লক্ষ্য, ৭০০০ সৌর লণ্ঠন, গৃহস্থালীতে ব্যবহার্য ৩৭০০০ আলো এবং ১৫০০০ সড়ক-আলো। তবে, প্রকল্পের বিপুল ব্যয় এবং আকারের তুলনায় এই লক্ষ্যমাত্রা অস্বাভাবিক কম।

গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিতভাবে যৌক্তিক। কিন্তু ব্যয়বহুল এই বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রাজ্যব্যাপী গ্রিডের মাধ্যমে তা সরবরাহ করার কি কোনও যুক্তি আছে? এ কথা ঠিক যে, বৃহৎ ক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমানো নেহরু সোলার মিশনের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এত খরচসাপেক্ষ এই পরীক্ষার এখনই কি প্রয়োজন? এ পথে পা বাড়ানোর

আগে খরচ কমার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করা কি উচিত কাজ হত না? এই মিশন এন এ পি সি সি -র একটি অংশ ঠিকই। কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমণ রোধ করাটাই যদি মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে বায়ু বা জৈবপদার্থজাত শক্তির কার্যকারিতা যাচিয়ে দেখাই যেত—কারণ এগুলি অনেক সস্তা।

নেহরু সোলার মিশন আকার এবং উদ্দেশ্যে অনেক বড় মাপের হলেও এর খরচ একেবারে আকাশছোঁয়া কিন্তু নয়। বেসরকারি ক্ষেত্র ছাড়াও এখানে লগ্নি আসতে পারে উন্নত দেশগুলি থেকেও। তবে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলেও দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশই পূরণ করতে পারবে সৌর বিদ্যুৎ। হয়তো এই বাড়তি খরচের ভার আমরা বহন করতে পারব—কিন্তু মিশনের খরচ আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও তার থেকে কতখানি সুবিধা পাওয়া যাবে এখনও তা খুব স্পষ্ট নয়। মিশনের আশা, ২০২০ সালের মধ্যে সৌর বিদ্যুতের দাম প্রচলিত বিদ্যুতের দামের প্রায় কাছাকাছি হবে। যদি বাস্তবে তাই ঘটে, তা হলেও কয়েকটি প্রশ্ন অনিবার্যভাবে থেকেই যাচ্ছে। বৃহৎ এই প্রকল্পে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ সিলিকন ওয়েফার বা পাতের আমদানি কি আন্তর্জাতিক বাজারে ওয়েফারের দরের হেরফের ঘটাবে? (মনে রাখতে হবে, এই পাতের সবটাই আমদানি করে ভারত এবং সৌরশক্তি প্রকল্পের সিংহভাগ খরচই হয় এই খাতে।) অতিরিক্ত এই চাহিদায় ওয়েফারের দাম বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে পুরো প্রকল্পটিরই ব্যয় বাড়বে। আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডি ও ই-র তরফ থেকেও প্রায় একই ধরনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যয় উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। খরচ কমানোর জন্য তারা বিশদ গবেষণার উপর নির্ভর করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রয়াস সফল হলে নেহরু মিশন কি বাড়তি কোনো সুফল আনতে পারবে? এ সব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় নি।

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের বাইরে সারা বছর ধরে প্রতি বর্গমিটারে ১৩৬৭ ওয়াট সৌরশক্তি পাওয়া যায়। আর ঠিক জায়গায় বসালে — যেমন চাঁদে — এই প্যানেল ২৪ ঘন্টাই সূর্যালোক পাবে এবং পৃথিবীতে বসানো প্যানেলের তুলনায় অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। মহাকাশে উৎপন্ন শক্তি মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে পৃথিবীতে পাঠানো যেতে পারে, কারণ বায়ুমন্ডলের প্রভাব মাইক্রোওয়েভে পড়ে না। মহাকাশে ১০০০ মেগাওয়াটের সৌরশক্তি কেন্দ্র গড়তে ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু করেছে জাপান। এই কেন্দ্রটির অবস্থান হবে ৩৬০০০ কিলোমিটার দূরে একটি সমলয়ী কক্ষপথে। ২০,০০০ টন ওজনের কয়েক কিলোমিটার জোড়া একাধিক প্যানেল থাকবে এখানে। কেন্দ্রটি চালু হওয়ার কথা ২০৪০ সালে। সে ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম কত হবে? জাপানে বিদ্যুতের দাম এখনই যথেষ্ট বেশি। মহাকাশ থেকে আনা বিদ্যুতের খরচ বর্তমান খরচের আড়াই গুণ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মহাকাশবিজ্ঞানে আমাদের যা দক্ষতা, তাতে ভবিষ্যতে কোনো এক সময় জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরাও এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করতেই পারি।

৬.৪। সৌরশক্তির অন্যান্য ব্যবহার ●

ভারত, চীন ও জার্মানি সহ একাধিক দেশে সৌরশক্তি চালিত জল গরম করার যন্ত্র বা ওয়াটার হিটার ব্যবহৃত হয়। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে অধিবৃত্তাকার আয়নার সঙ্গে যেমন টিউব বা নল ব্যবহার করা হয়, ঠিক সেই রকম টিউব সহজেই বড় বড় বাড়ির ছাতে রেখে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কয়েকঘন্টার মধ্যেই জল ৮০ থেকে ৯০ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম করা সম্ভব। ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গমিটার জুড়ে প্রায় ১০ লক্ষ বাড়ি, প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকেন্দ্রে বসানো আছে এইরকম হিটার।

জাতীয় সৌর মিশনের পরিকল্পনা, ২০২০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বাড়িয়ে দু'কোটি বর্গমিটারে নিয়ে যাওয়া। এই প্রযুক্তির ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে প্রচারের সঙ্গে হিটারের খরচের ৩০ শতাংশ বহন করছে সরকার। একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার উর্ধ্বে যে কোনও বাড়ির ক্ষেত্রেই এই সৌর-হিটার আবশ্যিক করে দিয়েছে বাঙ্গালোর পুরসভা।

সেচ এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য সৌরশক্তি চালিত পাম্প থাকলেও তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ২০১১ সালেও নশ' ওয়াটের প্যানেল সম্পন্ন এক হর্স পাওয়ারের একটি পাম্পের দাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। এত বেশি দামের কারণেই সারা দেশে মাত্র ১০ হাজারের মতো সৌরশক্তির পাম্প চলে—এর অধিকাংশই গুজরাটে। অথচ, সব মিলিয়ে ভারতে প্রায় দেড় কোটি বিদ্যুৎ চালিত পাম্প ব্যবহৃত হয়। এর থেকেই বোঝা যায়, সৌরশক্তির প্রসার ঘটালে কতটা সঞ্চয় সম্ভব।

যে নলের ভিতর দিয়ে জল গরম করা হয়, হাওয়া গরম করার কাজেও তা ব্যবহার করা যায়। এর সঙ্গে প্রয়োজন শুধু একটি পাখার—যা গরম জল বহনকারী নলের পিছনে বসাতে হবে। ঘর গরম করা, ফল, সবজি, চা অথবা বীজ শুকানো কিংবা লন্ড্রিতে কাপড় শুকনো করার কাজে গরম হাওয়া ব্যবহার হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হল, তাপ-নিয়ন্ত্রণ এবং শীতলনে। এই রকম একটি ৩০ টনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র চালু আছে গুজরাটে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাপকে কিভাবে শীতলনের কাজে ব্যবহার করা হয়? বায়ুশূন্য কোন কক্ষে জল স্প্রে করলে তা দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পীভবনের এই প্রক্রিয়া ততক্ষণই চলবে যতক্ষণ থাকবে বায়ুশূন্যতা। বেশ কিছুক্ষণ এই বাষ্পীভবন চললে জলের তাপমাত্রা কমে ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে আসবে। কক্ষের মধ্যে লিথিয়াম ব্রোমাইডের লবণ থাকলে তা জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে স্থানটিকে বায়ুশূন্য করে রাখে। জলীয় বাষ্পে আর্দ্র এই লবণ মাঝে মধ্যে বের করে নিয়ে শুকোতে হবে—তার জন্যই উত্তাপের প্রয়োজন। এই উত্তাপ সৌরশক্তি থেকেও আসতে পারে, আবার কেরোসিন জ্বালিয়েও হতে পারে। সাধারণ একটি এক টনের এয়ার কন্ডিশনারের দাম ২০ হাজার টাকার কম—কিন্তু বাষ্প শোষণকারী এক টনের এয়ার কন্ডিশনারের দাম দেড় লক্ষ টাকা। এই প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের আগে এর দাম কমাটা অত্যন্ত জরুরি।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে সৌর কুকার তৈরির চেষ্টা চলছে। আটের দশকে বাক্সের আকারের কুকার তৈরি হয়েছিল ছোট পরিবারের জন্য। গত ৩০ বছরে এই কুকার শোভনদর্শন হলেও ব্যর্থতার রূপ কিছুমাত্রও পাল্টায়নি। ২৪ কোটি পরিবারের এই দেশে মাত্র পাঁচ লক্ষ সৌর কুকার ব্যবহারের কথা জানা যায়। প্রতিফলক সহ ছোট কুকারগুলি আরও ব্যর্থ। একমাত্র অরোভিল-এ নির্মিত বিশাল আকারের কুকারগুলি সাফল্যের মুখ দেখেছে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য, তিরুপতি দেবস্থানে ব্যবহৃত কুকার—এটি দিয়ে দৈনিক ৩০ হাজার মানুষের রান্না হয়। অনুসরণকারী প্রতিফলকের সাহায্যে ৪ টন বাষ্প উৎপন্ন করে চালানো হয় এই কুকার। দাম এক কোটি দশ লাখ টাকা হলেও এল পি জি-র ব্যবহার কমিয়ে এখানে বছরে ২০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়। শিরডিতেও এইরকম একটি কুকারে প্রতিদিন ২০ হাজার পূণ্যার্থীর জন্য ভাত, ডাল, এবং সব্জি রান্না হয়। ভিওয়ান্ডির চিতালে ডেয়ারিতে বিশাল অধিবৃত্তাকার প্রতিফলকের সাহায্যে ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ২০০০ কিলো বাষ্প উৎপন্ন করে পাস্তুরাইজেশনের কাজ চলে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সৌরশক্তির ব্যবহার এখন প্রচলিত। তবে, সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, এর সাহায্যে গাড়ি চালানো। প্রতিবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ায় গাড়ির দৌড়ে যোগ দিতে আসে সৌরশক্তি চালিত বেশ কিছু গাড়ি। এই গাড়িগুলির চেহারা তিন চাকার সাইকেল এবং ফ্লায়িং সসারের মাঝামাঝি—সর্বাধিক গতি ঘন্টায় ৮৮ কিলোমিটার হলেও এরা দূরপাল্লার যাত্রায় সক্ষম। সৌরশক্তি চালিত অন্তত একটি গাড়ি সারা পৃথিবী ঘুরেছে। ২০১০ সালের জুলাই মাসে সৌরশক্তি চালিত এক পরীক্ষামূলক বিমান 'সোলার ইমপালস' একটানা আকাশে উড়েছে ২৬ ঘন্টা। দিনের বেলা সঞ্চিত শক্তিতে এটি রাতেও পাড়ি দিয়েছে আকাশপথে।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এক সৌর শহর প্রকল্পের উদ্বোধন করে ভারত সরকার। নির্বাচিত কয়েকটি শহরের পুরসভাকে নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত নবীকরণীয় শক্তি কাজে লাগিয়ে যথাসম্ভব বেশি 'সবুজ বিদ্যুৎ' উৎপাদন এবং সংরক্ষণে সচেষ্ট করা হচ্ছে। উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে গৃহ নির্মাণে শক্তি সাশ্রয়কারী কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারে—অগ্রাধিকারে রয়েছে পাম্পে জল তোলা এবং বন্টনে শক্তি বা বিদ্যুতের কম ব্যবহার এবং বর্জ্য পদার্থ পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের প্রয়াস। চিহ্নিত ৪৮টি সৌরশহরের মধ্যে চন্ডিগড় এবং নাগপুরকে গড়ে তোলা হচ্ছে 'আদর্শ সৌর শহর' হিসেবে। ■

সপ্তম অধ্যায় বায়ুশক্তি

৭.১ বায়ুশক্তি সম্পদ ●

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ার অনেক আগেই বায়ুশক্তির প্রচলন। বায়ুশক্তির সাহায্যেই পালতোলা নৌকা দীর্ঘ জলপথ পাড়ি দিত। ঘুরত বাতচক্র বা উইন্ডমিলের চাকা, হত শস্য পেষাই বা জলসেচের কাজ। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে নেদারল্যান্ডস সহ ইউরোপের সর্বত্রই হাজার হাজার এইরকম বাতচক্র তৈরি হয়। পরে এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা সহ নানা দেশে। ১৯৩০ সালের মধ্যে এর সংখ্যা হয় ৬০ লক্ষেরও বেশি। ১৮৮০ থেকে ১৯৫০—বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রথম পর্বের সঙ্গী এই চক্র। গ্রিডের মাধ্যমে সস্তায় বিদ্যুতের সরবরাহ শুরু হলে বায়ু-বিদ্যুতের গুরুত্ব অনেকটাই কমে। আবার ১৯৮০ সাল নাগাদ তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন নতুন করে শুরু হয়।

গোড়ার দিকে, একেকটি বাতচক্রের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২০ থেকে ৪০ কিলোওয়াট এবং ১৯৩০ নাগাদ তা কিলোওয়াট থেকে বেড়ে মেগাওয়াটে পৌঁছায়। বর্তমানে, বিশ্বের বৃহত্তম বাতচক্র থেকে ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং ১০ মেগাওয়াট উৎপাদনকারী যন্ত্রের নকশা তৈরির পথে। সাধারণ একটি ডাচ বাতচক্রের রোটার বা ঘূর্ণনযন্ত্রে থাকত চারটি ফলা বা ব্লেড। বেশি বাতাস পাওয়ার জন্য ফলাসমেত টাওয়ারের উপরিভাগ ইচ্ছামত ঘোরানো যেত, অনেকটা নৌকার পালের মত। টাওয়ারের নিচের অংশ ব্যবহৃত হত মিল-মালিকের আবাস হিসাবে। অবশ্য এ ধরনের বাতচক্র এখন আর খুব একটা চোখে পড়ে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু খামারেই ১২ ফলার মিল ছিল। বিদ্যুতের ট্রান্সমিশন টাওয়ারের মতো উঁচু থামের উপর বসানো হত এই রোটার। এখন ব্যবহৃত নিচের দিকে মোটা হয়ে যাওয়া চোঙাকার খুঁটির উচ্চতা ১০০ মিটারেরও বেশি হতে পারে। কাঠ বা ধাতুর বদলে এখন ব্যবহার হয় ফাইবারগ্লাসের ব্লেড এবং তা ৫০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তবে, এক বা দু'ফলার মিলে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হলেও সব থেকে বেশি ব্যবহার তিন ফলার মিলের।

সৌরপ্যানেল বা ফোটোভোলটায়িক কোষ সূর্যালোকের সবটা পায় না। যেটুকু বায়ুমন্ডলে মিশে যায়, তার সবটাই কিন্তু হারিয়ে যায় না। কিছুটা শক্তি আমরা বায়ুর মাধ্যমে ফিরে

পাই। বায়ু এতটাই হালকা যে তা সরাসরিভাবে তাপ শোষণ করতে পারে না। ভূত্বক থেকে ১২ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত ট্রপোস্ফিয়ারে বায়ু তপ্ত হয় পরোক্ষে—সূর্যের আলোয় তেতে ওঠা মাটির উষ্ণতায় এবং সৌরকিরণে তপ্ত সমুদ্র-জলের তাপে। তবে, বায়ু সর্বত্রই কিন্তু সমান তপ্ত হয় না। অসম এই উত্তাপের গুরুত্বপূর্ণ কারণ দুটি। প্রথমত, গোলাকার পৃথিবীর কিছু অংশ ছাড়া সূর্যরশ্মির অধিকাংশই তির্যকভাবে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয়, সূর্য ক্রমাগতই তার স্থান পরিবর্তন করছে। মার্চ ও সেপ্টেম্বরে সূর্য দৃশ্যমান নিরক্ষরেখায়, জুনে ২৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখায় এবং তারপরে দক্ষিণের পথে যাত্রা। ডিসেম্বরে ২৩ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখায়। বিষুবরেখা ও ক্রান্তিয় অঞ্চল বেশিরভাগ সময়েই সরাসরি সূর্যালোক পায় বলে এগুলি পৃথিবীর উষ্ণতম অঞ্চল—আর তির্যকরশ্মির কার্পণ্যে শীতলতম হল দুই মেরু।

ভূত্বকের বৈচিত্র অসম উত্তাপের আর একটি কারণ। জলভাগের উপরকার বাতাসের তুলনায় মৃত্তিকালগ্ন বায়ু গরম হয় দ্রুত। আবার পাহাড় বা বনাঞ্চলের বায়ু মরু-বাতাসের তুলনায় শীতল। তপ্ত বায়ু প্রসারিত হয়ে লঘু ও উর্ধ্বগামী হয়। তাপ যথেষ্ট থাকলে তা ট্রপোস্ফিয়ারের শীর্ষেও পৌঁছতে পারে। তপ্ত বায়ু উর্ধ্বগামী হলেই সে জায়গায় তৈরি হয় শূন্যতা। আর অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বায়ু এসে সেই স্থান পূরণ করে। বায়ুপ্রবাহের প্রক্রিয়া শুরু হয় এইভাবেই। তাপমাত্রার তারতম্য সামান্য হলে দুর্বল স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ মাত্র কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রবাহিত হয় এবং কয়েক ঘন্টা বা দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এই তারতম্য বিশাল হলেই (যেমন বিষুব অঞ্চলের সঙ্গে মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রার ফারাক) পৃথিবীজোড়া বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রবাহ বছরভর হাজার হাজর কিলোমিটার অতিক্রম করে। সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন মরসুমি বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, যা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একদিকে প্রবাহিত হয় এবং তারপর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। আবার, পৃথিবীর আবর্তনে উত্তুরে বা দক্ষিণী বায়ুপ্রবাহ পূর্ব বা পশ্চিমদিকে ঘুরে যেতে পারে।

ভারতের বায়ুপ্রবাহের মূল নিয়ন্ত্রক মরসুমি বায়ু। এপ্রিল-মে মাসে রাজস্থানের মরুভূমির উপর সূর্যালোক সরাসরিভাবে পড়ায় এই অঞ্চলের তাপমাত্রার পারদ ওঠে ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। একই সময়ে তপ্ত হয় আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মরুভুমিও। ফলে, ধেয়ে আসে দক্ষিণ-পশ্চিমের শীতল বাতাস। ভারত মহাসাগরের জলভূমির উপর দিয়ে অবাধে আসায় এই বাতাসে আর্দ্রতা বাড়ে, মন্থর হয় গতি। শেষ পর্যন্ত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তা ভারতের দক্ষিণ বিন্দুতে পৌঁছায়। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে পৌঁছানো প্রথম নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজের পালে ছিল এই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। বায়ুপ্রবাহের এই পথেই ২০মে তিনি কালিকটে পৌঁছান—অর্থাৎ বর্ষার ঠিক আগে।

জুলাই এবং আগষ্ট জুড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমী এই বায়ুপ্রবাহ বইতে থাকে জোরকদমে,

গোটা দেশ জুড়ে। সেপ্টেম্বর থেকে এটি দুর্বল হতে শুরু করে এবং অক্টোবর নাগাদ পরিণত হয় বিপরীতমুখী এক বায়ুপ্রবাহে যা ভারত মহাসাগরের দিকে যাওয়ার আগে তামিলনাড়ুতে দ্বিতীয়বার বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে যায়। সাধারণত পাহাড়-পর্বতের বাধা এই বায়ুপ্রবাহের গতি শ্লথ করে কিন্তু কোনো কোনো গিরি অঞ্চলের অসমতায় তা ঝোড়া হাওয়ায় পরিণত হতে পারে—ঘণ্টায় ১৩০ থেকে ১৬০ কিলোমিটার। দক্ষিণ ভারত, গুজরাত এবং রাজস্থানের একাধিক এলাকায় দেখা যায় এই ঝড়। স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ অবশ্য তুলনামূলকভাবে অনেক দুর্বল। স্থলবায়ু বা সমুদ্রবায়ুর গতিবেগ হতে পারে ঘন্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার।

বায়ুসম্পদে সমৃদ্ধতম তামিলনাড়ু। তারপর আছে কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং রাজস্থান। গর্জনশীল চল্লিশার (Roaring Forties) অন্তর্গত নিউজিল্যান্ড বা আর্জেন্টিনা এবং উচ্চগতির পশ্চিমাবায়ুসম্পন্ন ইউরোপ বা কানাডার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে ভারতের বায়ু সম্পদ যথেষ্ট কম। কেবল ইচ্ছাশক্তি এবং উদ্যোগের জোরেই গোটা বিশ্বে বায়ুশক্তি সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান এখন পঞ্চম। ভারতের আগে রয়েছে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং স্পেন।

৭.২ বায়ুশক্তির সম্ভাবনা ●

বায়ুচালিত টারবাইন সেই জায়গাতেই বসানো যায়, যেখানে বছরের বেশিরভাগ সময়েই দ্রুতগতিতে হাওয়া বইবার সম্ভাবনা আছে। টারবাইনের জন্য কোনও জায়গা চিহ্নিত করার আগে অন্তত এক বছর সেখানকার হাওয়ার গতি এবং দিকপথ পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ভারত সরকারের সেন্টার ফর উইন্ড এনার্জি টেকনোলজি দেশের ৬৫০টিরও বেশি স্থানের বায়ুপ্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে। এরমধ্যে ২১৬টি এলাকায় টারবাইন চলার জন্য বায়ুপ্রবাহের প্রয়োজনীয় গতিবেগ পাওয়ায় সে'গুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

বায়ুবিদ্যুৎ প্রচলনের সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দেশে কিছু মতভেদ আছে। সরকারি হিসাব প্রথমে ছিল ১৫০০০ মেগাওয়াট। সম্প্রতি তা সংশোধন করে বলা হয় ৪৫০০০ মেগাওয়াট। তামিলনাড়ুর প্রকৃত ক্ষমতা সরকারি সম্ভাব্য হিসাবকে ছাপিয়ে যাওয়ায় উইন্ড এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার মতে সঠিক সংখ্যা ৬৫০০০ মেগাওয়াট। অনেক বিশেষজ্ঞ আবার মনে করেন, ভারতে বায়ুশক্তির সম্ভাব্য ক্ষমতা এক লাখ মেগাওয়াটেরও বেশি। মতভেদের আসল কারণ হল, সম্ভাব্য ক্ষমতা হিসাব করার ভিত্তিটিই সর্বজন গ্রাহ্য নয়। আনুমানিক এই মূল্যায়নের প্রথম ধাপে রয়েছে দেশের ৬৫০টি এলাকা থেকে সংগৃহীত

হাওয়ার গতিবেগ সংক্রান্ত তথ্য। গতিবেগ মাপা হয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যানিমোমিটার দিয়ে, তাই তথ্যের মান সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এমন সব স্তম্ভ থেকে, যার বেশিরভাগেরই উচ্চতা ২৫-৩০ মিটার। আমাদের প্রয়োজন ৭৫-১০০ মিটার উচ্চতায় হাওয়ার সম্ভাব্য গতিবেগ। সরাসরি মাপতে না পারায় এর অনুমান করা হয় অঙ্কের সাহায্যে। এখান থেকেই অনিশ্চয়তার সূত্রপাত। বায়ুশক্তির ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উৎপন্ন বিদ্যুৎ নির্ভর করে গতিবেগের ঘনফলের উপর। আণুমানিক গতিবেগ যদি ১০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হয় এবং তার প্রকৃত গতিবেগ হয় ঘন্টায় ১২.৬ কিলোমিটার, তাহলে উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রকৃত হিসাব কিন্তু আনুমানিক হিসাবের দ্বিগুণ হয়ে যাবে, কারণ $(১০)^৩$ হল ১০০০ আর $(১২.৬)^৩$ হল ২০০০।

গতিবেগের সঙ্গে শক্তির এই পরিবর্তনকে বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনও চলমান বস্তুর শক্তি সংক্রান্ত একটি ফর্মুলা, শক্তি = ১/২ ভর $\times$ $(\text{গতিবেগ})^২$ $[E = ½ \text{ mass}.v^2]$ বাতচক্রের ব্লেডের মধ্য দিয়ে যে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে তার শক্তি সম্পর্কেও এই ফর্মুলা প্রযোজ্য। প্রতি সেকেন্ডে যে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, তার ভর আবার হাওয়ার গতিবেগের সঙ্গেই সমানুপাতিক। অর্থাৎ

$$\text{mass} = k.v$$

তার মানে,

$$E = ½ \text{ k.v. } v^2 = ½k.v^3$$

সুতরাং ব্লেডের মধ্যে দিয়ে বাহিত বায়ুর শক্তি গতিবেগের ঘনফল অনুযায়ী বাড়ে বা কমে। এই শক্তি সঞ্চালিত হয় টারবাইনের ব্লেডে। ব্লেড যত লম্বা হবে, তত বেশি আয়তনের বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার হবে। সেইজন্যই ৫০ মিটার পর্যন্ত লম্বা ব্লেড ব্যবহার করা হয়। তবে, বায়ুপ্রবাহের সব শক্তি নিতে পারে না টারবাইন। তত্ত্বগতভাবে তার গ্রহণক্ষমতা ৫৯ শতাংশ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা প্রায় ৫০ শতাংশ। হাওয়ার বেগ অতিরিক্ত হলে টারবাইনের ক্ষতি হতে পারে। তাই, প্রয়োজনে বাতচক্রের ব্লেডের মুখ বাতাসের প্রতিকূলে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

বলাই বাহুল্য যে ভারতে বায়ুবিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা যাচিয়ে দেখার জন্য মাত্র ৬৫০টি কেন্দ্রের তথ্য যথেষ্ট নয়। আরও বেশি তথ্য প্রয়োজন— বিশেষত উত্তর ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি থেকে। কারণ এইসব অঞ্চল থেকে যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত হয়নি। কোনও একটি কেন্দ্র থেকে পাওয়া বাতাসের গতিবেগের তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় মোট কতটা জায়গা জুড়ে হাওয়ার পর্যাপ্ত গতিবেগ থাকতে পারে। ধরে নেওয়া হয়েছে, এই অঞ্চলের মাত্র ৩ শতাংশ এলাকায় উইন্ডমিল বসানো যাবে। এই অনুমান একেবারেই

একতরফা। তিনের বদলে ছয় শতাংশ এলাকা পাওয়া যাবে — এটা ধরে নিলেই আবার বায়ুশক্তির সম্ভাবনা দ্বিগুণ হতে পারে। এছাড়াও, টারবাইন যত বড় হবে, জমির প্রয়োজনও কমবে। সুতরাং সম্ভাব্য উৎপাদনের হিসাবও হয়ে যাবে অর্থহীন। যেহেতু আমরা ৪৫০০০ মেগাওয়াটের সরকারি লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারিনি, তাই এই সংশোধন আপাতত অপ্রয়োজনীয়। তবে, এই তথ্য সরকারি নথিতে গৃহীত এবং বিভিন্ন শক্তির উৎস সংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনায় বিবেচিত। তাই যুক্তিগ্রাহ্য এবং বাস্তবসম্মত একটি অনুমান অত্যন্ত জরুরি।

৭.৩ বায়ু থেকে বিদ্যুৎ ●

ভারতে বায়ুচালিত টারবাইনের স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ১৪০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি। তামিলনাড়ুতেই রয়েছে এই ক্ষমতার ৫০ শতাংশেরও বেশি। বায়ুশক্তি প্রকল্প গড়ে তোলার কাজে যথেষ্ট উন্নতি করেছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং কর্ণাটক। আবার,ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করেনি অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং কেরল। আটের দশকে এই প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রথম টারবাইনটি চালু করা হয় সরকারি উদ্যোগে। পরীক্ষামূলক এই প্রকল্পের সাফল্য উৎসাহী করে বেসরকারি লগ্নিকে। ১৯৯০ সালে তামিলনাড়ুতে ৫৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মাত্র দু'টি টারবাইন নিয়ে শুরু হয় বেসরকারি উদ্যোগের প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই দৃষ্টান্ত আকৃষ্ট করে আরও লগ্নিকারীদের। দেশের সর্ব্বোচ্চ বায়ুপ্রবাহসম্পন্ন জেলা কন্যাকুমারীর মুপ্পান্ডাল গ্রামে বর্তমানে প্রায় ২৫০০ টারবাইন এবং ৫০০ মেগাওয়াটের বেশি স্থাপিত ক্ষমতার বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু। এখানে ২৫ মিটারের পুরোনো খুঁটি ও কম ক্ষমতার টারবাইনের পাশাপাশি চলে ৮০ মিটারের স্তম্ভের উপর দুই মেগাওয়াটের টারবাইন। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর ও রামেশ্বরম, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ এবং মহারাষ্ট্রের ধুলে ও সাতারা জেলাতেও বেশ কয়েকটি বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

ভারতের বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বায়ুচালিত টারবাইন নির্মাতা 'সুজ্‌লন' সংস্থা এইসব প্রকল্পে টারবাইনের যোগান দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বায়ুশক্তি সমৃদ্ধ বেশ কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে তুলতেও সহায়তা করছে এই সংস্থা। সাধারণভাবে সহায়ক সংস্থা বায়ুশক্তি কেন্দ্রের পুরো প্রকল্পটিরই রূপরেখা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি কাজই করে। এমন কি যোগানও দিয়ে থাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির। এতে লগ্নিকারীর আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং কেন্দ্রটি নিখুঁতভাবে চলে।

বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

হল, মেগাওয়াট পিছু টারবাইনের দাম কমে ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা হওয়া। বেশিরভাগ রাজ্যই বায়ুবিদ্যুৎ শুল্ক ধার্য করেছে ইউনিট পিছু ৩ থেকে ৪ টাকা। লগ্নিকারীদের কর ছাড় সহ উৎপাদন সংক্রান্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। ফলে, তাঁরা লগ্নি থেকে আকর্ষণীয় লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন। ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনের ফলে উৎপাদনে আরও সুবিধা হয়েছে। সব বড় রাজ্যের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন নিয়ম করেছে, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিনতে হবে নবীকরণীয় শক্তির উৎস থেকে। তবে এই আইন এখনও যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি।

৭.৪ বিশ্ব পরিবেশ ●

বিশ্ব পরিবেশও বায়ুশক্তির ক্ষেত্রে অনুকূল। গত এক দশকে বিশ্বের বায়ুশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা বেড়েছে দশগুণ। মোট ক্ষমতা এখন ২,০০,০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি। প্রত্যাশিতভাবেই দ্রুত বৃদ্ধির অন্যতম কারণই হল প্রযুক্তির উন্নতি। টারবাইনগুলি আরও বড়, কার্যকর এবং কম শব্দের। দ্রুতগতির বাতাসের নাগাল পেতে স্তম্ভের উচ্চতা বেড়েছে, বর্ধিত হয়েছে বাতচক্রের ফলার মাপ —উৎপন্ন হচ্ছে আরও বেশি শক্তি। বৃহদাকার এই ব্লেডগুলি আর বহন করে আনা যায় না, প্রকল্প স্থলেই তা জুড়ে ফেলা হয়। বিশ্বের বৃহত্তম টারবাইনে এখন ছয় মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, স্তম্ভের উচ্চতা ১৮৯ মিটার এবং ব্লেডগুলির দৈর্ঘ্য ৬৩ মিটার। টারবাইনগুলির কর্মদক্ষতা যেমন বেড়েছে, ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে তেমনই দূর থেকে তাদের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণও সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হল বৃহৎ টারবাইনের সাহায্যে মূল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। ছোট টারবাইনের মাধ্যমে দু-একটি বা কয়েকশো বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজে অনেক দূর এগোনো যায়। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০০ ওয়াট থেকে ১০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী টারবাইনের চাহিদা বেশি। এই টারবাইনগুলি ২০ মিটার উচ্চতার স্তম্ভ এবং ঘন্টায় ১৫ কিলোমিটার বাতাসের গতি থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। সৌর প্যানেলের সঙ্গেও যুক্ত করা যায় এই টারবাইনগুলি—যাতে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সৌরপ্যানেল এবং মেঘলা, দ্রুত হাওয়ার দিনে টারবাইন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে। মহারাষ্ট্রে ছোট টারবাইন থেকে ১০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। মাটির নিচে ৩০ ফিটের মধ্যে জলস্তর থাকলে এই টারবাইনের সাহায্যে পাম্প চালিয়ে জলসেচ অথবা পানীয় জল সংগ্রহ করা যায়। বর্তমানে গুজরাতেই প্রায় এক হাজার এইরকম পাম্প চলছে।

উপকূল-সংলগ্ন সমুদ্রের উপর টারবাইনের ব্যবহার ইউরোপে এখন যথেষ্ট চালু।

এইরকম বেশ কয়েকটি কেন্দ্র আছে ডেনমার্কে। ৩০০টিরও বেশি টারবাইন নিয়ে ব্রিটিশ উপকূলের কাছে তৈরি হচ্ছে বৃহত্তম কেন্দ্র 'লন্ডন অ্যারে'। বর্তমানে এই ধরণের অঞ্চল থেকে বায়ুবিদ্যুতের উৎপাদনক্ষমতা ৩০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি। তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে এই রকম অঞ্চল চিহ্নিত করা হলেও এগুলির ব্যবহারে বিশেষ সাড়া মেলে নি। খরচ বেশি হলেও এই প্রকল্প যথেষ্ট আকর্ষণীয় কারণ সমুদ্রের উপরে হাওয়ার গতিবেগ দিন-রাত সবসময়েই বেশি। ফলে, বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ে। ইউরোপের তুলনায় আমাদের উপকূল-সংলগ্ন সমুদ্রের জল গভীর হলেও সে সমস্যা সাময়িক, কারণ সমুদ্রগভীরে যাওয়ার খরচ ভাসমান টারবাইন অনেকটাই কমিয়ে দিচ্ছে।

বায়ুশক্তি সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে বহু পথ এখনও বাকি। তবে সুখের কথা, প্রথমদিকে যেসব সমস্যায় বায়ুশক্তির বিস্তারের গতি স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল, তার অনেকগুলিরই সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে। বেশির ভাগ রাজ্যের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনই সরবরাহকারি সংস্থার জন্য নবীকরণীয় উৎস থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ কেনার নিয়ম চালু করেছে। যেহেতু নবীকরণীয় শক্তির ক্ষেত্রে সব রাজ্য সমান সমৃদ্ধ নয়, তাই এক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ব্যবস্থাও করা হয়েছে (Tradeable Renewable Energy Certificate)। এর ফলে, বায়ুশক্তির প্রসার বাড়বে, কারণ নবীকরণীয় শক্তির মধ্যে এটিই সবথেকে সস্তা। অপরদিকে বায়ুচালিত টারবাইনের জন্য জমি পাওয়া ভবিষ্যতে এক বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের মনোযোগ দিতে হবে তিনটি ক্ষেত্রে। প্রথমত, স্থলভাগ থেকে সাগরের দিকে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের অধিকাংশ টারবাইনই পুরানো এবং ছোট। এগুলির বদলে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন টারবাইন ব্যবহার করলে অতিরিক্ত জমি ছাড়াই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তৃতীয়ত, কম জমি এবং কম গতিবেগের হাওয়ায় কাজ করে এমন ছোট টারবাইনের উপর আমাদের আরও জোর দিতে হবে। ■

অষ্টম অধ্যায় জৈব পদার্থ থেকে শক্তি

৮.১ পুরানোর সঙ্গে নতুন ●

শক্তির উৎস হিসেবে জৈব পদার্থের কথা বলতে গেলে একসঙ্গে বহু জিনিসের নাম মনে পড়ে। যেমন, কাঠ থেকে পাওয়া একাধিক জিনিস— কাঠের গুঁড়ি, কাঠের টুকরো, কাঠের গুঁড়ো অথবা তা দিয়ে তৈরি ছোট ছোট বড়ি বা গুল। আবার সবুজ পদার্থ, যেমন—মানুষের খাদ্য নয় এমন উদ্ভিদ ও পাতা, সবজির খোসা, জলজ শ্যাওলা, ধান বা গমের খড়, সরষের খোল, পাটকাঠি, ধানের খোসা, আখের ছিবড়ে এমনকি ফেলে দেওয়া খাবার। এর সঙ্গে আছে সব ধরনের প্রাণীজ বর্জ্য যেমন গোবর বা পোলট্রি থেকে প্রাপ্ত মলমূত্র, কষাইখানার আবর্জনা, ছাঁট ইত্যাদি এবং মৃত পশুদের দেহাবশেষ। এইসব বস্তু থেকেই আমরা উত্তাপ পেতে পারি, যা যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক শক্তিতেও পরিণত করা যায়।

কাঠ, খড় বা ঘুঁটের মতো শুষ্ক জৈবপদার্থ জ্বালিয়ে তার থেকে উত্তাপ পাওয়া যায়। প্রায় এক লক্ষ বছর আগে, মানুষ যখন আগুনের ব্যবহার শেখে, তখন থেকেই শুকনো জৈবপদার্থের ব্যবহার শুরু হয়। কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়ে কত কাজই না করা হত! শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া, রাতের বেলা আলো জ্বালানো, হিংস্র পশুর আক্রমণকে আটকানো, জঙ্গল সাফ করা অথবা রান্না করা। জৈব পদার্থের এই আদিম ব্যবহার আজও বজায় রয়েছে। গ্রামীণ ভারতের ৯০ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ১৫ শতাংশ বাড়িতে এখনও কাঠ, খড় বা ঘুঁটে জ্বালিয়ে রান্না করা হয়। জৈব পদার্থের এই সাবেক ব্যবহার শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বে ব্যবহৃত শক্তির প্রায় ১০ শতাংশ আসে এইভাবে।

বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আর তাই উৎপন্ন হচ্ছে জৈব গ্যাস, এথানল বা জৈব-ডিজেলের মতো জ্বালানি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কাঠের ব্যবহার বন্ধ করা যাচ্ছে। আধুনিক এই প্রযুক্তি শুধু দক্ষতাতেই নয়, পরিচ্ছন্নতাতেও যথেষ্ট এগিয়ে। সেই কারণে প্রত্যেক দেশই এখন জৈব পদার্থের সাবেক ব্যবহারের

পরিবর্তে আধুনিক ব্যবহারকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জৈব পদার্থ থেকে উত্তাপই পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় আলো এবং বিদ্যুৎও। সার্বিকভাবে জৈব পদার্থকে নবীকরণীয় শক্তি বলা যেতেই পারে, কারণ আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়তই গাছ জন্মাচ্ছে। তবে তাকে দক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারলেই তা সদর্থে নবীকরণীয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে। গোটা বিশ্বে জৈব পদার্থ থেকে উৎপন্ন মোট শক্তির মাত্র ১৫ শতাংশই আসে আধুনিক প্রযুক্তি মারফত। ৮৫ শতাংশ এখনও সাবেক উপায়েই উৎপন্ন হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাত আরও বেশি ও আশঙ্কাজনক।

৮.২ জৈবগ্যাস থেকে শক্তি ●

জৈব গ্যাসের সরবরাহ বলতে গেলে অফুরান। সবচেয়ে সহজলভ্য উৎস হল পশু-পাখির বর্জ্য। ভারতে গবাদিপশুর সর্বশেষ গণনা অনুযায়ী গরু ও মোষের সংখ্যা ২০ কোটি। এইসব পশু প্রতি বছর ১০০ কোটি টন গোবর তৈরি করে। এর সবটাই যদি বায়ো গ্যাস প্রকল্পে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আমরা বছরে ৪০০০ কোটি কিউবিক মিটার জৈব গ্যাস পাবো, যার ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ২৪০০ কোটি কিউবিক মিটার হবে মিথেন। তাহলে প্রতিবছর চড়া দামে যে ১০০০ কোটি কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করতে হয়, তা বন্ধ করা যাবে। কিন্তু দূরদুরান্ত থেকে এই গোবর একত্রিত করাটাই বিশাল সমস্যা।

এই সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে উপযোগী পথ হল গ্রামাঞ্চলে পরিবার ভিত্তিক ছোট ছোট প্রকল্প গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৮১ সালে সরকার ন্যাশনাল বায়োগ্যাস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম নামে এক বিশেষ কর্মসূচি চালু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ জৈব গ্যাস প্রকল্প চালু হলেও এই বিশেষ কর্মসূচিটি নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে। জৈবগ্যাসের উৎপাদনে ভালই মূলধন লাগে। যথেষ্ট অর্থবান কৃষকই এর খরচ বহন করতে পারে। ২০০১-০২থেকে সারা দেশে এল পি জি সহজলভ্য হওয়ার পর থেকেই সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকদের পছন্দের তালিকায় জৈবগ্যাসের জায়গা নিয়ে নিল এল পি জি। নতুন উৎপাদন যেমন বন্ধ হল, তেমনই তৈরি হওয়া কেন্দ্রগুলিও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রইল।

অপরদিকে, গ্রামের গরিব মানুষ রান্নার জ্বালানি হিসাবে কাঠ-খড় ইত্যাদিই ব্যবহার করে। এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোনও খরচ না হলেও ক্ষতির অঙ্কটা লুকোনো আছে পরোক্ষে। রান্নার জন্য কাঠ বয়ে আনেন বাড়ির মহিলারা। সপ্তাহে এক অথবা দুদিন

২০-৩০ কিলো বোঝা মাথায় চাপিয়ে অন্তত দু-কিলোমিটার দূরত্ব পেরিয়ে আসেন তাঁরা। নিয়মিত এতখানি ভার বহন করা সোজা কাজ নয়, আর সেই কারণেই বহু মহিলা সারা জীবন পিঠের ব্যথা, বা আরও জটিল সমস্যায় আক্রান্ত হন। এছাড়াও বেশিরভাগ বাড়িতেই রান্না হয় বাড়ির ভিতরে, যেখানে বাতাস চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেই। মায়েদের রান্না করার সময় তাদের পাশে বসে থাকে ছোট ছেলেমেয়েরা। ফলে সকলেই ধোঁয়ার শিকার হয়। বিষাক্ত এই ধোঁয়ায় কারবনের ক্ষুদ্র কণা ছাড়াও কারবন মনোক্সাইড, বেনজিন এবং ফরমালডিহাইডের মতো ক্ষতিকর পদার্থও থাকে। এর থেকে যক্ষ্মা, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, এমনকি ফুসফুসে ক্যানসারও হতে পারে।

প্রথম সমস্যার অনেকটাই সমাধান করা গেছে। গত ২০-২৫ বছরে সরকারি বেসরকারি জমিতে, নদী-নালার পাড়ে এবং পথের ও রেললাইনের ধারে অসংখ্য গাছ লাগানো হয়েছে। ফলে রান্নার জ্বালানির জন্য কাঠ বা ডালপালা সংগ্রহ করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সমস্যা দূর করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে 'ধোঁয়াহীন উনুন' তৈরি এবং গ্রামের মানুষদের মধ্যে তা বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়। সাবেক উনুনের তুলনায় দ্বিগুণ কার্যকর এই উনুনে ধোঁয়া অনেক কম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, গ্রামের মানুষ এর স্বাস্থ্যকর দিক সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। তাছাড়া, উনুনের ধোঁয়া বেশি হলে পোকামাকড় থাকে না। এইসব নানা কারণেই, ধোঁয়াহীন উনুন তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি। খুব কম সংখ্যক মানুষ এগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, যারা ব্যবহার করেনও, তাদের দুই তৃতীয়াংশই কিছুদিনের মধ্যে এগুলিকে বাতিল করে দেন।

পাঁচ বা ছটি গরুর মালিক, এমন একজন কৃষকের কাছে একটি জৈবগ্যাস প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় গোবর পাওয়া যায়। গোটা দেশে এইরকম এক কোটি ২০ লক্ষ কৃষক রয়েছে। কিন্তু, সহজলভ্য এল পি জি এবং সুলভ কাঠ—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে রান্নার জ্বালানি হিসাবে জৈবগ্যাস কখনওই জনপ্রিয় হতে পারেনি। জৈবগ্যাস প্রকল্পের থেকে যে সার পাওয়া যায় তা গোবরের থেকে অনেক বেশি কার্যকর। ইউরিয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে এই জৈবসার। কিন্তু ইউরিয়াতে আবার অনেক বেশি ভর্তুকি দেওয়া হয়, তাই জৈবসারের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। এল পি জি এবং ইউরিয়াতে ভর্তুকির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমানো হলেও জৈবগ্যাসে ভর্তুকি অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে. এর ফলে জৈবসারের কর্মসূচি যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছে।

জৈব গ্যাস উৎপাদনে পাচন প্রক্রিয়া বা বায়ো-মিথেনেশনের মাধ্যমে মিথেন উৎপন্ন করা হয়। তিনধরনের ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে মিথেন উৎপন্ন হয়। প্রথমটি জৈবপদার্থের জটিল অণুকে শর্করাতে পরিণত করে। দ্বিতীয়টি শর্করা থেকে অ্যাসেটিক অ্যাসিড তৈরি

করে। তৃতীয়টি অ্যাসেটিক অ্যাসিড থেকে মিথেন উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে ৩০ থেকে ৪০ দিন সময় লাগে এবং তা হতে হয় অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে। অক্সিজেন বেশি থাকলে মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলে পরিণত হয়।

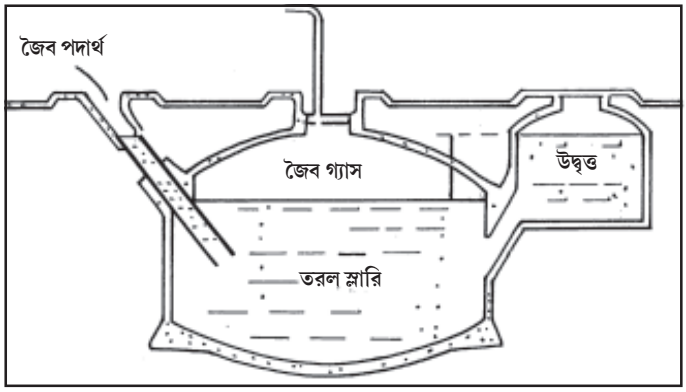

জৈবগ্যাস উৎপাদনকেন্দ্রের নকশা

জৈবগ্যাস উৎপাদনকেন্দ্রে পাচক হিসেবে কাজ করে ইট ও সিমেন্টের এক আধার, যা মাটির নিচে বসানো হয়। এর একদিকে একটি নল থাকে যা জৈব পদার্থের (যেমন গোবর) ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত। এর সাহায্যে এই পদার্থ ইটের আধারে ঢোকানো হয়। অন্যপাশে আর একটি নল থাকে, যেখান দিয়ে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ বেরিয়ে যায়। জৈব গ্যাস জমা হয় আধারের উপরিভাগে। এই গ্যাস নলের সাহায্যে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যায়। গোড়ার দিকে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন জৈব গ্যাস উৎপাদনকেন্দ্রের একটি মডেল তৈরি করে, যেখানে গ্যাস সংগ্রহের জন্য ধাতুর তৈরি ভাসমান এক আধার ছিল, যা গ্যাসের আয়তন বাড়ার সঙ্গে উপরে উঠে যেত এবং গ্যাস বেরিয়ে গেলে নেমে যেত। কিন্তু ধাতু ব্যবহার করাতে প্রকল্পের মোট খরচ বেড়ে যাচ্ছিল। তাই ইটের তৈরি গম্বুজাকৃতির আধার ব্যবহার করা হল। ইট দিয়ে গম্বুজ তৈরি করা সহজ নয়। মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই গম্বুজ, যা মুঘলদের হাত ধরেই এদেশে জনপ্রিয় হয়েছে। চীনাদের কাছে আমরা শিখি জৈব গ্যাস উৎপাদনকেন্দ্রে এই গম্বুজের ব্যবহার। সেইমতো হাজার হাজার গ্রামীন রাজমিস্ত্রিকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও বহু গম্বুজই ভেঙে পড়ে। তাই পরবর্তীকালে আগে থেকে তৈরি করা সিমেন্টের আধার ব্যবহার করা হয়। এখন সিমেন্ট এবং প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন ধরনের আধার পাওয়া যায়। নানা আকর্ষণীয় রং এবং আকারের এই আধারগুলি শহর এবং শহরতলিতে জৈবগ্যাসের কদর বাড়িয়ে দিয়েছে।

দেশে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা বাড়লেও কিছু অঞ্চলে তা একই রকম রয়েছে, অথবা কিছুটা কমেই গেছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ জৈবগ্যাস তৈরি করার জন্য

গোবরের বদলে অন্য জৈবপদার্থের কথা ভেবেছে। যেমন, পাতা, সবজির খোসা, পচা ফল বা সবজি ইত্যাদি। প্রতি বছর আমরা ১১০ থেকে ১৫০ কোটি টন এই ধরনের জৈব পদার্থ পাই, যা জৈবগ্যাসের উৎস হিসেবে যথেষ্ট উপযোগী। জৈবগ্যাস উৎপাদনের জন্য গোবর ব্যবহার না করতে চাইলে দ্বিস্তর পাচকের প্রয়োজন। এই ধরনের পাচক তৈরি হলেও তা থেকে সফলভাবে উৎপাদন করতে হলে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

ট্রম্বে বি এ আর সি ক্যাম্পাসে তৈরি হওয়া ৩৫ কিউবিক মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন জৈবগ্যাস উৎপাদনকেন্দ্র প্রমাণ করে দিয়েছে যে রান্নাঘরের বর্জ্য পদার্থ থেকেই একটি উৎপাদন কেন্দ্র চালানো যায়। ক্যান্টিন থেকে পাওয়া বর্জ্য পদার্থগুলিকে সযত্নে বাছাই করা হয়। নারকেল মালা, ডিমের খোলা, পেঁয়াজের খোসা, মাংসের হাড় অথবা কাঁটা চামচের মতো জিনিসকে বেছে বাদ দেওয়া হয়। কারণ এগুলি জৈবগ্যাস উৎপাদনের কাজে বাধা দেয়। উদ্বৃত্ত বা পচা খাবার, টি ব্যাগ বা কেটে যাওয়া দুধের মতো নরম বস্তুগুলিকে আলুর খোসা, কাগজ, পাতা এবং পচা সবজির থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। পাঁচ হর্সপাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন এক মোটরের সাহায্যে শক্ত জঞ্জালকে গুঁড়িয়ে তাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে থকথকে কাদায় পরিণত করে সেই মিশ্রণকে একটি ট্যাঙ্কে পচানো হয়। এখানে জলের তাপমাত্রা ৫০ থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে যাতে থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া পাচনক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। জল গরম হয় একটি সৌর ফোটোভোলটায়িক প্রকল্পের সাহায্যে, যা এই জৈবগ্যাস প্রকল্পের সঙ্গেই যুক্ত। উচ্চ তাপমাত্রার ফলে ক্ষতিকর জীবাণু বিনষ্ট হয়ে যায় এবং উৎপাদনকেন্দ্রটি পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকে। এই পাচক থেকে ৭৫ শতাংশ মিথেন উৎপন্ন হয়। এখান থেকে উৎপন্ন জৈব গ্যাস দিয়ে ক্যাম্পাসের গ্যাসবাতি জ্বলে।

জমি এবং অন্যান্য সম্পদের মতো গবাদি পশুর অসম বণ্টনও আমাদের দেশের এক নির্মম সত্য। অধিকাংশ পরিবারের কাছে এত সামান্য সংখ্যক গবাদি পশু রয়েছে, যে তা জৈব গ্যাস উৎপাদনের জন্য নেহাতই নগণ্য। আবার, বেশ কিছু পরিবারের কাছে রয়েছে প্রচুর গবাদি পশু। এক্ষেত্রে সর্বসাধারণের জন্য একটি জৈব গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রের কথা ভাবা যায়, যেখানে একটি গ্রামের সব গোবর এবং জৈব পদার্থের সাহায্যে জৈব গ্যাস উৎপাদন করে তা গোটা গ্রামের মানুষের কাজে লাগতে পারে। উৎপন্ন গ্যাসের পরিমাণ বেশি হলে তার সাহায্যে পাম্প, ছোট ডিজেল ইঞ্জিন চালানো, এমনকি বিদ্যুৎ উৎপাদনও করা সম্ভব। বড় উৎপাদন কেন্দ্র হলে, তা গ্রামের সবধরনের শক্তির চাহিদা পূরণ করতে পারবে বলেই ধরে নেওয়া যায়।

সর্বসাধারণের জন্য এই ধরনের উৎপাদনকেন্দ্রে সরকারি সহায়তা থাকলেও, তা যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। এর মূল কারণই হল অনুশাসনের অভাব। সর্বসাধারণের

জন্য নির্মিত উৎপাদন কেন্দ্র তখই সফল হতে পারে যখন সেখান থেকে রান্নার জ্বালানির পরিবর্তে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সেই বিদ্যুতের সাহায্যে বাতি জ্বলে। বিদ্যুতে বাতি না জ্বললে বিকল্প হিসাবে কেরোসিনের বাতি জ্বালাতে হয়, যার দাম যথেষ্ট বেশি। অপরদিকে, রান্নার জ্বালানির পরিবর্ত হল বিনামূল্যের কাঠ।

আমাদের দেশের বৃহত্তম জৈবগ্যাস প্রকল্পের উৎপাদনক্ষমতা ৬৩০ কিউবিক মিটার। গুজরাতের মেহসানার মেথানে অবস্থিত এই প্রকল্প চালু হয়েছিল ১৯৮৭ সালে এবং এখনও তা চালু আছে। গ্রামীণ সমবায় সংস্থার ৩২০ জন সদস্যকে প্রতিদিন পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ করে এই কেন্দ্র। সেই সঙ্গে ২০০০ টন সারও বিক্রি হয়। আশ্রম ছাত্রাবাস, ডেয়ারি, গোশালা, সবজিবাজার এবং কসাইখানার সঙ্গে যুক্ত জৈবগ্যাস প্রকল্পগুলি ভালভাবেই কাজ করছে। যেসব শিল্পকেন্দ্র তাদের বর্জ্য পদার্থটিকে কাজে লাগিয়ে জৈবগ্যাস উৎপাদন করছে, সেগুলিও যথেষ্ট ভালভাবে চলছে।

বহুসংখ্যক গ্রামভিত্তিক উৎপাদনকেন্দ্রকে সহায়তা দিয়েছে এবং তা নিয়ে গবেষণার কাজ করেছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স। এইসব উৎপাদনকেন্দ্রের সাহায্যে রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ এবং গ্রামীণ শিল্প চালানোর কাজ হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সব থেকে সম্ভাবনাময় কেন্দ্রগুলিও স্থায়িত্বের নিরিখে বিশেষ কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। ২০০০ সালে সরকার ৩৩১টি গ্রামভিত্তিক উৎপাদনকেন্দ্রকে সহায়তা করেছিল। এগুলির মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞদল খুঁজে দেখেন যে, এর মধ্যে মাত্র ২৪টি কার্যকর রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যা কারিগরিক্ষেত্রের নয়, মূলত প্রাতিষ্ঠানিক। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সর্বসাধারণের উৎপাদনকেন্দ্রকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। গত ছয় বছরে তিন মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২৬০টি প্রকল্পকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

৮.৩ শুকনো জৈবপদার্থ ●

সাবেক প্রথায় কাঠ ব্যবহারে বেশ কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। রান্নার জন্য খোলা জায়গায় কাঠ জ্বালানো হলে, মোট উত্তাপের মাত্র ১০ শতাংশ আসলে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকি তাপ হলকা আর ধোঁয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে নষ্ট হয়। এই অপচয় এড়াতে বিশ্বজুড়ে উন্নতমানের উনুনের নকশা তৈরি হয়েছে এবং তার প্রসারেও যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ভারত এবং চীনের নাম। এই উন্নত উনুনের কর্মদক্ষতা ২০ শতাংশ। অর্থাৎ কাঠের ব্যবহার কমে অর্ধেক হয়ে যায়। কিন্তু, ভারতে এইসব 'ধোঁয়াহীন চুল্লি'র ব্যবহার বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষ পুরানো দিনের উনুনে কাঠ বা খড়

পুড়িয়েই রান্না করে।

কাঠের উপর নির্ভরশীল একটি পরিবারে প্রতিদিন চার থেকে ছয় কিলো কাঠ জ্বালানো হয়। তার মানে আমাদের দেশে বছরে ২০ থেকে ২৫কোটি টন কাঠ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কাঠ আসে আমাদের বনভূমি, পথের দুধারে, নদীর বাঁধের বেড়ে ওঠা গাছ থেকে। তাহলে প্রশ্ন হল— আমরা কি শুধু ডালপালাই ব্যবহার করি, নাকি গাছ কেটে বনভূমি ধ্বংস করি? একদল গবেষক মনে করেন ভারতে জ্বালানির জন্য বনভূমি ধ্বংস হওয়ার কোনও প্রমাণ নেই। আবার অন্য একদলের মত, গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি কাঠ খরচ হয়ে যাচ্ছে জ্বালানির কারণে। তাই যদি হয়, তাহলে কাঠকে আর শক্তির নবীকরণীয় উৎস বলা যাবে না।

১৯৭৩/৭৪ সালে তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পর থেকে সুইডেন, ফিনল্যান্ড, এবং জার্মানির মতো বহু ইউরোপীয় দেশই জৈব পদার্থ ব্যবহারকে উৎসাহ দিচ্ছে। জৈবপদার্থ থেকে উৎপন্ন শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে ফিনল্যান্ড। এখানে মোট ব্যবহৃত শক্তির ২০ শতাংশ আসে জৈবপদার্থ থেকে। এরপরেই আছে সুইডেন, যেখানে ১৫ শতাংশ শক্তির উৎস হল জৈব পদার্থ। এর অন্যতম কারণ হল এই দুই দেশের বিশাল বনাঞ্চল, যা মোট জমির যথাক্রমে ৬৬ এবং ৫২ শতাংশ। শীতপ্রধান এই দেশগুলিতে ঘরবাড়ি গরম রাখার জন্য প্রচুর উত্তাপ প্রয়োজন। যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়, সেখানে তাই ব্যবহার করা হয়। অন্যত্র, কাঠই হল প্রধান জ্বালানি। কয়লা বা তেলের বয়লারের তুলনায় কাঠের বয়লারের দাম এখনও অনেক বেশি। যদিও তা চালানোর খরচ কম। গ্যাসের দাম অতিরিক্ত বেশি না হলে, কাঠ ব্যবহারকে জনপ্রিয় করতে হলে কারবন কর চালু করা দরকার। যখন কাঠ পোড়ানো হয়, তখন তার থেকে যে কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়, তা সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সেই গাছ যে কারবন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করেছিল, তারই সমান। সেই অর্থে, কাঠ বা খড় পোড়ানো হলে, তা থেকে অতিরিক্ত কারবন নির্গত হয় না, সেই কারণেই ইউরোপীয় দেশগুলি এখন জৈবপদার্থ ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছে। অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় কাঠে কার্বন নির্গমন ৯০ শতাংশ কম হয়।

ইউরোপে ঘরবাড়িতে এবং জেলাভিত্তিক তাপ নিয়ন্ত্রণের কাজে জৈবপদার্থ ব্যবহার করা হয়। বৃহৎ জেলাভিত্তিক প্রকল্পে হাজার হাজার বাড়ি গরম রাখার জন্য ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা নলের সাহায্যে বাষ্প পরিবহন করা হয়। যেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, সেখানে তা বাষ্পের সঙ্গেই উৎপন্ন হয়, যা উত্তাপের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, এবং বিদ্যুতের দামও কম থাকে। আমাদের দেশে ঘরবাড়ি গরম রাখার প্রয়োজন তেমন নেই, তাই উত্তাপের চাহিদাও তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু একইসঙ্গে বাষ্প এবং বিদ্যুতের উৎপাদন করা যেতেই পারে, যদি কোনও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এই বাষ্প ব্যবহার করে। এর উৎকৃষ্ট

উদাহরণ হল চিনিকল।

আখ মাড়াই করে রস বার করে নেওয়ার পর যে শুকনো ছিবড়ে পড়ে থাকে, তাকে পুড়িয়ে তার থেকে বাষ্প উৎপন্ন করা যায়। এই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। টারবাইন থেকে যে উদ্বৃত্ত বাষ্প বেরোয় তা আখের রস ফোটানোর পক্ষে যথেষ্ট গরম। এইভাবে, সব ছিবড়ে কাজে লাগালে একটি কারখানার মোট বিদ্যুৎ ও বাষ্পের চাহিদা মিটিয়েও কিছুটা বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত থাকে। এপর্যন্ত, ভারতে এই ধরনের ১৫২টি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা ১৬০০ মেগাওয়াট। আখের ছিবড়ে ছাড়াও, আরও ১৩০টি জৈবপদার্থ ভিত্তিক প্রকল্প রয়েছে, যাদের উৎপাদনক্ষমতা ১০০০ মেগাওয়াট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধানের খোসা ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ফসলের উদ্বৃত্ত বা কাঠও কাজে লাগে।

উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্প ছাড়াও বেশ কিছু ছোট প্রকল্প তৈরি হয়েছে, যার উৎপাদনক্ষমতা ১ থেকে ২ মেগাওয়াট এবং সেগুলি নিকটবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এখানে যেটুকু তাপ উৎপন্ন হয় তা টারবাইন চালাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পরিবর্ত ব্যবস্থা হিসেবে জৈবপদার্থকে গ্যাসে পরিণত করে সেই গ্যাস অন্তর্দহন যন্ত্রের জ্বালানি হিসেবে ডিজেলের পরিবর্তে অথবা তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। ৫০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই ধরনের একটি প্রকল্প গত ১০ বছর ধরে সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলে কার্যকর রয়েছে। এখানে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়, যা নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অবশ্যই একাজে ম্যানগ্রোভের কাঠ ব্যবহার করা হয় না।

অপর্যাপ্ত অক্সিজেনে কাঠ জ্বালিয়ে পাওয়া কাঠের গ্যাস (wood gas) বা উৎপাদক গ্যাসে (producer gas) ২০ শতাংশ কারবন মনোক্সাইড, ২০ শতাংশ হাইড্রোজেন এবং ১-২ শতাংশ মিথেন থাকে। কারবন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন, অথবা মিথেন সকলেরই দহন ক্ষমতা এবং উপকারী শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। কাঠকে গ্যাসে পরিণত করতে আমরা কিছু শক্তি ক্ষয় করলেও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি ঘন জ্বালানিকে গ্যাসীয় জ্বালানিতে পরিণত করা হয়, যা ব্যবহার করা অনেক সহজ। গোসাবায় উৎপন্ন এই গ্যাস ১০০ কিলোওয়াটের পাঁচটি ইঞ্জিনে ডিজেলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। প্রকল্পটির পরিচালক গ্রামীন শক্তি সমবায়ের ১২০০ জন সদস্যের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে যায় মিনিগ্রিডের সাহায্যে। এরা এই বিদ্যুৎ দিয়ে বাড়িতে আলো জ্বালান এবং পাম্প চালান।

গোসাবা প্রকল্পটি তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গ নবীকরণীয় শক্তি উন্নয়ন সংস্থা। খরচ হয় ১৬ কোটি টাকা। এখানে প্রতিদিন দুই টন কাঠ এবং ৩০০ লিটার ডিজেল ব্যবহৃত হয় এবং এই প্রকল্প ইউনিট পিছু ৫ টাকা ৬০ পয়সায় দৈনিক ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ

করে। এই দাম শহরের বিদ্যুতের থেকে বেশি। কিন্তু গ্রামে যারা ডিজেল পুড়িয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন তারা দাম নেন ১৫ থেকে ২০ টাকা প্রতি ইউনিট। গোসাবা প্রকল্পের একটি বৈশিষ্ট হল, প্রত্যেকটি বাড়িতে বিদ্যুতের মিটার রয়েছে। বিল মেটানোর ক্ষেত্রেও বিশেষ ফাঁক নেই। কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলি পুরানো হয়ে গেছে, ফলে কর্মক্ষমতাও কমেছে। প্রকল্পটি থেকে এখন আর কোনও লাভ হচ্ছে না। তবে, কিছু অতিরিক্ত বিনিয়োগ এবং বিদ্যুতের সামান্য মূল্যবৃদ্ধি করলে এই প্রকল্পটি আবার লাভের মুখ দেখতে পারবে। সুন্দরবনের অন্যত্র এইরকম আরও দুটি গ্যাস প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে একটির নিজস্ব ৬০ একর জমিও রয়েছে, যেখান থেকে কাঠ পাওয়া যায়।

বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট অঞ্চল বা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে চিহ্নিত সুন্দরবন হল ১০২টি দ্বীপের সমষ্টি। এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে জনবসতি আছে, বাকিগুলি ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট। উনিশ শতকের শেষভাগে কলকাতায় বসবাসকারী এবং ম্যাকিনন অ্যান্ড ম্যাকেনজি সংস্থায় কর্মরত স্কটসম্যান ড্যানিয়েল হ্যামিলটন গোসাবা অঞ্চলে কয়েকটি দ্বীপ কেনেন এবং বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে আসা ভূমিহীন মানুষদের সেখানে আশ্রয় দেন। অনেকটা রবার্ট ওয়েন-এর মতো এই ভদ্রলোক কোনও ব্যক্তিগত লাভের আশায় নয়, স্রেফ পারস্পরিক ঐক্য, সমানাধিকার এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে এক জনবসতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে নৈতিক সমর্থন জানাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু যে মহৎ আদর্শের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়নি। আজ বেঁচে থাকলে, বর্তমান পরিস্থিতি দেখে তিনি দুঃখিতই হতেন। তবে সুখের কথা, এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা জৈবপদার্থ, বায়ু এবং সৌর শক্তির একাধিক প্রকল্প পারস্পরিক সহযোগিতার ভাবনাকে আজও অক্ষুন্ন রেখেছে।

জৈবপদার্থ থেকে গ্যাস উৎপাদক এবং তার উপযোগী জেনারেটর এখন ৫, ২০, ১০০ এবং ৫০০ কিলোওয়াট মাপে পাওয়া যায়। এই বিদ্যুৎ বাড়ি এবং সড়কের আলো জ্বালানো, সেচ এবং পানীয় জলের পাম্প চালানো এবং গমকলের মতো গ্রামীন শিল্পের কাজে ব্যবহার করা হয়। এর সুবিধা হল, এটি অনেক বেশি দামী ডিজেলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় এবং এর সাহায্যে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। কর্নাটকের টুমকুর জেলায় তৈরি হওয়া ২০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এক জেনারেটরে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ১.৬ কিলো কাঠ ব্যবহার করে ৮৫ শতাংশ ডিজেলের ব্যবহার কমানো গেছে। চীনে, কাঠ থেকে উৎপন্ন গ্যাস পাইপলাইনের সাহায্যে বাড়িতে সরবরাহ করা হয় রান্নার জ্বালানি হিসেবে। দেখা গেছে, এটি এল পি জির থেকে সস্তা।

অন্যান্য নবীকরণীয় শক্তির তুলনায় জৈবপদার্থ হল সব থেকে সহজলভ্য। এর

থেকে উৎপন্ন শক্তি অবিরাম, সৌর বা বায়ুশক্তির মতো মাঝে মাঝে থেমে যায় না। তবে জৈবপদার্থের শক্তির ঘনত্ব কম এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অনেক বড় এলাকা থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তা সে কাঁচামাল কাঠই হোক, বা খড় ইত্যাদি। কোনও প্রকল্প তৈরি হলে গোড়ার দিকে হয়তো পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল পাওয়া যাবে। কিন্তু, ধীরে ধীরে তার বাজার তৈরি হলে কাঁচামালের দামও বেড়ে যাবে, ফলে প্রকল্পের অর্থনৈতিক দিকটি মার খাবে। গোটা বিশ্বেই জৈবপদার্থ সংক্রান্ত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা এইরকমই। ভারতের 'ধানের পাত্র' অন্ধ্রপ্রদেশে (যদিও বর্তমানে ধান উৎপাদনে অন্ধ্রপ্রদেশকে ছাড়িয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ) ধানের খোসাকে ব্যবহার করে একাধিক প্রকল্প গড়ে উঠেছে। যখন প্রকল্পগুলি শুরু হয় তখন ধানের খোসার দাম ছিল ২০০ টাকা প্রতি টন। এখন তার দাম হয়েছে টন প্রতি ১৫০০ টাকা। তবে এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। ধানের খোসার এই মূল্যবৃদ্ধির সুফল কি কৃষকদের কাছে পৌঁছেছে?

ভারতে জৈবপদার্থ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি। কেবল আখের ছিবড়ে থেকেই পাওয়া যেতে পারে ৩০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। শস্যের উদ্বৃত্ত হয় প্রায় ৫০ কোটি টন। এর অধিকাংশই ব্যবহার হয় রান্নার জ্বালানি হিসেবে। কিছুটা বাড়ির চাল তৈরির কাজে লাগে এবং কিছুটা মাঠেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। আরও ২০ কোটি টন জ্বালানি কাঠ রান্নার কাজে লাগে। এই ৭০ কোটি টনের অর্ধেকও যদি আমরা সঞ্চয় করে দ্বিগুণ দক্ষতায় ব্যবহার করি, তাহলে তা ৪০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। শক্তি উৎপাদনের জন্য সুপরিকল্পিত বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে আমরা আরও বেশি জ্বালানি কাঠ পেতে পারি। প্রতি ৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে বাবলা, প্রোসোপিস বা ইউক্যালিপটাস গাছ লাগালে তা আমাদের অতিরিক্ত ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতে পারবে।

৮.৪ জৈব জ্বালানি ●

উদ্ভিদ অথবা প্রাণীদের অবশিষ্টাংশ থেকে যে জ্বালানি উৎপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় জৈব জ্বালানি। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কাঠ বা বায়োগ্যাসকেও জৈব জ্বালানি বলা যায়। তবে, ব্যবহারিক দিক থেকে এথানল এবং বায়ো-ডিজেলকেই এখন জৈব জ্বালানি বলা হয়। এই দুটিরই বৈশিষ্ট্য হল—স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এরা তরল অবস্থায় থাকে। তাই এদের মজুত এবং পরিবহন দুটোই সহজ। এছাড়াও এথানল পেট্রোলের

সঙ্গে এবং বায়ো ডিজেল সাধারণ ডিজেলের সঙ্গে সহজেই মিশে যায়। তাই এদের ব্যবহারের জন্য পৃথক পাইপলাইন অথবা আধারের প্রয়োজন নেই। পেট্রোল বা ডিজেলের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মাধ্যমেই এগুলি বিপণন করা যায়।

জৈব জ্বালানি নিয়ে আজকের ভাবনা বা সচেতনতার বীজ কিন্তু বোনা হয়েছিল গত শতকের গোড়ার দিকে। রুডলফ ডিজেল গাড়ির ইঞ্জিন চালাতে উদ্ভিজ তেল ব্যবহার করেন। জগদ্বিখ্যাত ফোর্ড কোম্পানির কর্ণধার হেনরি ফোর্ড এক বিশেষ মডেলের মোটরগাড়ি তৈরি করেন, যার নাম ফোর্ড মডেল টি এবং যা চলত এথানলে। কিন্তু সেই যুগে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপন্ন হত প্রচুর পরিমাণে। তাই দামও ছিল কম। উপরন্তু মোটরগাড়ির সংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় নেহাতই নগণ্য। তাই জৈব জ্বালানি ব্যবহৃত হওয়ার কোনও সুযোগই পেল না।

অবস্থাটা বদলে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। পেট্রোল বা ডিজেল মজুত রাখা হল যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর জন্য। ফলে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য রইল না কিছুই। তৈরি হল এক কৃত্রিম সংকট। গুরুত্বহীন হয়ে যাওয়া জৈব জ্বালানির আবার চাহিদা বাড়ল। ইউরোপে প্রায় দশ লক্ষেরও বেশি গাড়ি চলতে শুরু করল কাঠ থেকে পাওয়া জ্বালানি 'সিনফুয়েল'-এ। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই আবার পেট্রোলিয়মের নতুন ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেল। জৈব জ্বালানি ফের পড়ে গেল পিছনে।

গত শতকের শেষের দিকে, সত্তরের দশকে, জ্বালানি সম্পর্কে মানুষের ভাবনার আমূল পরিবর্তন হল। পেট্রোপণ্যের দাম যে ক্রমশই বাড়বে এবং তার জোগানও আর অফুরান থাকবে না—এই দুটি অমোঘ সত্য উপলব্ধি করল মানুষ। আর তখনই এল নতুন করে গবেষণার তাগিদ।

জৈব জ্বালানির ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিল ব্রাজিল। ১৯৭৮ সালে পেট্রোলের বিকল্প হিসেবে এথানল ব্যবহারের জন্য উদ্যোগী হয় দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশ। ব্রাজিলের এই গবেষণার কাজে বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগায় ১৯৭৯-৮০ নাগাদ ইরান-ইরাক যুদ্ধের ফলে পেট্রলিয়মের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। কিন্তু এরপরেই জ্বালানির দাম আবার কমতে থাকে। ১৯৮৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত জ্বালানির দাম এতই কম ছিল যে ব্রাজিলকে অনুসরণ করে জৈব জ্বালানি উৎপাদনের কাজে কোনও দেশই তৎপর হল না।

এথানল প্রকল্প চালু হয়ে যাওয়ার পরে ব্রাজিলকে অবশ্য তা চালিয়ে যেতেই হয়। ভর্তুকি দেওয়ার পরেও এথানলের দাম এতই বেশি ছিল, যে ব্রাজিল সরকারকে পেট্রোলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়ে রাখতে হয়েছিল, যাতে এথানলের ব্যবহার বন্ধ না হয়ে যায়। প্রকল্প চালিয়ে যাবার সুফল পাওয়া যায় ২০০১

সালের পরে, পেট্রোলের দাম যখন চতুর্গুণ বেড়ে ব্যারেল পিছু ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিবেশ রক্ষার তাগিদ এখন জৈব জ্বালানি সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার গুরুত্বকে বাড়িয়েছে। শুরুতে যা ছিল একান্তভাবেই ব্রাজিলের নিরুপায় প্রয়াস, আজ তাই বাঁচার তাগিদ হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপ ও আমেরিকায়। ইতিমধ্যে বায়ো-ডিজেলকে ডিজেলের বিকল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারত সহ বহু দেশই এখন জ্বালানি হিসেবে এথানল এবং বায়ো-ডিজেলের ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে জৈব জ্বালানির ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নানা কারণে। আমদানি করে আনা তেলের বিকল্প হিসেবে অন্য কোনও জ্বালানি ব্যবহার করলে তাতে শক্তি নিরাপত্তা বাড়ে। বিকল্প এই জ্বালানিও হয়তো আমদানি করতে হবে, যেমন ইউরোপকে জৈব জ্বালানি আমদানি করতে হয়। এই জ্বালানি আমদানি করা হয় বিভিন্ন দেশ থেকে। এথানল আসতে পারে ব্রাজিল থেকে, পাম তেল মালয়েশিয়া থেকে অথবা জৈব ডিজেল পাকিস্তান থেকে। উৎসের এই বৈচিত্র্যে শক্তি-নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না। অপরদিকে, যদি জৈব জ্বালানি দেশেই উৎপাদন করা যায়, তাহলে পতিত জমির সদ্ব্যবহার এবং বাড়তি কর্মসংস্থান দুইই হয়। তৃতীয়ত, জ্বালানি হিসেবে জৈব জ্বালানি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, অনেকটা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রাপ্ত ডিজেলের মতো। আর এই ব্যবহারে কারবন নির্গমন কমানো যায়।

বিশ্বজুড়ে জৈব জ্বালানির উৎপাদন দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ২০০০ সালে ১ হাজার ৬০০ কোটি লিটার থেকে তা বর্তমানে দশ হাজার কোটি লিটার হয়েছে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ হল এথানল আর ১০ শতাংশ জৈব ডিজেল। বর্তমানে পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির তিন শতাংশ আসে জৈব জ্বালানি থেকে। জৈব জ্বালানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে ব্রাজিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ। এব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ভারত, চীন এবং মালয়েশিয়ার মতো দেশও। ২০০৫এ মোট জ্বালানির ২ শতাংশ হবে জৈব জ্বালানি—ইউরোপিয় ইউনিয়ন এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হলেও, বর্তমানে তারা ২০২০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জৈব জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ৪ হাজার ৮০০ কোটি লিটার জৈব জ্বালানি ব্যবহার করে। তাদের পরিকল্পনা, ২০২২ সালে ১৩ হাজার ৬০০ কোটি লিটার জৈব জ্বালানি ব্যবহার করা হবে। আই ই এ-র হিসাব অনুযায়ী, বায়ুমণ্ডলে কারবন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ৪৫০ পিপিএম-এ স্থিত রাখতে হলে ২০৫০ সালে পরিবহনের জন্য জ্বালানির চাহিদার ২৭ শতাংশ পূরণ করতে হবে জৈব জ্বালানিকে। এই জৈব জ্বালানির উৎপাদনে সম্ভবত ১০ কোটি হেক্টর জমি লাগবে। আন্তর্জাতিক এই সংস্থার অভিমত, সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিকে বজায় রাখতে পারলে খাদ্য, তন্তু, তাপ এবং

শক্তির চাহিদা পূরণ করেও এই জমি পাওয়া যেতেই পারে।

এথানল এবং বায়ো-ডিজেলকে বলা হয় প্রথম প্রজন্মের জৈব জ্বালানি। এদের উৎপাদন বেশ কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জৈব জ্বালানির জন্য জমি এবং জল পেতে খাদ্যশষ্যের মতো অপরিহার্য বস্তুর উৎপাদন কমাতে হয়েছে, বনভূমিও কেটে ফেলা হয়েছে। ফলে, এই জ্বালানি ব্যবহারে কারবন ডাই অক্সাইডের কম নির্গমনের যে সুফল, তাও কমে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ভুট্টা থেকে এথানল উৎপন্ন হয়, তাতে অত্যন্ত বেশি জল খরচ হয় বলে অভিযোগ। সেদেশে ৪০ শতাংশ ভুট্টা এথানলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে ২০০৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভুট্টার দাম তিনগুণ বেড়ে গেছে। এইসব সমস্যা প্রথম প্রজন্মের জৈব জ্বালানির উৎপাদনকে অনেকটাই সীমিত করবে। ভবিষ্যতের উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের জৈব জ্বালানি তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

উন্নত জৈব জ্বালানির মধ্যে সব থেকে সম্ভাবনাময় হল সেলুলোজ থেকে উৎপন্ন এথানল। উদ্ভিদের দেহের এক তৃতীয়াংশই হল সেলুলোজ। কাঠের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশই সেলুলোজ। কাঠের মণ্ড, কাঠকলের বর্জ্য পদার্থ বা শষ্যের খোসা ইত্যাদি থেকে সহজেই সেলুলোজ পাওয়া যায়। তবে তার থেকে শর্করা বার করে এবং তাকে পচিয়ে এথানল তৈরি করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। বর্তমানে এর জন্য খরচ হয় লিটার পিছু পাঁচ ডলার। একে কমিয়ে এক ডলার করাই এখন লক্ষ্য। সেলুলোজের সঙ্গে প্রাপ্ত লিগনিন (যা লিগনো সেলুলোজ তৈরি করে) থেকেও এথানল তৈরি করা যেতে পারে। শ্যাওলা থেকে জৈব জ্বালানি উৎপাদন, জৈব পদার্থ থেকে সিনগ্যাস বা অনুঘটকের সাহায্যে শর্করা থেকে ডিজেল তৈরি করা—এইগুলি হল অন্যান্য উৎপাদন পদ্ধতি যা গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

৮.৫ জৈব রসায়ন ●

এথানল এবং জৈব ডিজেল কেন এত কার্যকর—তা জানতে হলে আমাদের রসায়নবিদ্যাকে আরও একবার ঝালিয়ে নিতে হবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি—প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অশোধিত পেট্রোলিয়মে রয়েছে অ্যালকেন নামে এক শ্রেণীর হাইড্রোকারবন। প্রাকৃতিক গ্যাসে রয়েছে সব থেকে হালকা অ্যালাকেনগুলি। যেমন মিথেন, ইথেন, প্রোপেন এবং বিউটেন। অশোধিত তেলে এইগুলি ছাড়াও আছে অপেক্ষাকৃত ভারী অ্যালকেন। সবকটি অ্যালকেনই জ্বালানি হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর। অ্যালকেনের সঙ্গে একটি বা দুটি অক্সিজেন পরমানু যোগ করলে তৈরি হয় আর এক

শ্রেণীর রাসায়নিক, যার নাম অ্যালকোহল। মিথেন এবং অক্সিজেন থেকে আমরা পাই মেথানল। ইথেন এবং অক্সিজেন থেকে পাওয়া যায় এথানল। অতঃপর প্রোপানল, বিউটানল ইত্যাদি। অক্সিজেন যুক্ত হলে জ্বালানি হিসেবে অ্যালকেনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। অ্যালকোহলও জ্বালানি হিসেবে যথেষ্ট ভাল।

কার্যক্ষেত্রে অ্যালকোহল তৈরি হয় চিনিকে পচিয়ে, অ্যালকেনের সঙ্গে অক্সিজেনের প্রত্যক্ষ বিক্রিয়ায় নয়। এই চিনি পাওয়া যেতে পারে আখ বা বীটের রস থেকে। ভুট্টা বা গমের মতো শষ্য ব্যবহার করা হলে তার স্টার্চকে আগে হাইড্রোলিসিসের মাধ্যমে শর্করায় পরিণত করে তারপর তাকে পচনক্রিয়ার মধ্যে দিতে হবে। শর্করাকে ইস্ট দিয়ে দুদিন ধরে পচালে তা অ্যালকোহলে পরিণত হয়। এই মিশ্রণে অ্যালকোহলের পরিমাণ থাকে সর্বাধিক ১০ শতাংশ। এরপর পাতনক্রিয়ার সাহায্যে ৯৫ শতাংশ বিশুদ্ধ অ্যালকোহল পাওয়া যায়। এই অ্যালকোহলই রাম, হুইস্কি ইত্যাদি পানীয়তে ব্যবহার করা হয়, শিল্পক্ষেত্রে রাসায়নিক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এই অ্যালকোহল কিন্তু গাড়ি চালাতে পারে না বা পেট্রোলের সঙ্গে একে মেশানো যায় না। তার জন্য দরকার ৯৯ শতাংশেরও বেশি বিশুদ্ধ, অনার্দ্র বা অ্যানহাইড্রাস অ্যালকোহল। একে বিভিন্ন অনুপাতে পেট্রোলের সঙ্গে মেশানো যায়। ব্রাজিলে আখ থেকে এথানল তৈরি হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টা এবং ইউরোপে বীট থেকে। ব্রাজিলেই উৎপাদনের খরচ সব থেকে কম, কারণ সেখানে আখের উৎপাদনের হার খুব বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খরচ কিছুটা বেশি। ইউরোপে এই খরচ সর্বাধিক।

আরও এক শ্রেণীর রাসায়নিক রয়েছে যার নাম ফ্যাটি অ্যাসিড। এরা অ্যালকোহলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'এসটার' গঠন করে। সব ধরণের উদ্ভিজ তেলেই এসটার থাকে। তা সে সর্ষের তেলই হোক, অথবা নারকেল তেল, পাম তেল, রেপসীড তেল বা জ্যাট্রোফা তেল। এইসব তেলের 'এসটার'-এ নানা ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড থাকতে পারে কিন্তু অ্যালকোহল এক প্রকারেরই থাকে। আর তা হল—গ্লিসেরল। গ্লিসেরলের একটি অণু ফ্যাটি অ্যাসিডের তিনটি অণুকে নিয়ে তৈরি করে ট্রাইগ্লিসেরাইড। পঞ্চাশোর্ধ পাঠক এই নামটি বিলক্ষণ চেনেন, কারণ রক্তে এর মাত্রা বেড়ে গেলেই তা বিপদের কারণ হয়। উদ্ভিজ তেল আমরা বহুদিন ধরেই ব্যবহার করেছি প্রদীপের বা লণ্ঠনের আলো জ্বালাতে। এই তেল দিয়ে ডিজেল ইঞ্জিনও চালানো যেতে পারে, কিন্তু এই তেল আঠালো হওয়ায় এর ব্যবহার সহজ হয় না।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হয়। মেথানল বা এথানলের মতো অ্যালকোহলের সঙ্গে এই তেলের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তেলের

ঘনত্ব কমে। ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি গ্লিসেরলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেথানল বা এথানলের সঙ্গে নতুন এসটার গঠন করে। এই বিক্রিয়ায় যেহেতু এক ধরণের এসটার আর এক ধরনের এসটারে পরিণত হয়, একে বলা হয় 'ট্র্যান্স এসটারিফিকেশন রিঅ্যাকশন'। জৈব ডিজেল হল এই ধরনের মিথাইল বা ইথাইল এসটারের সমষ্টি। সর্ষের তেল, সয়বিন তেল, রেপসীড তেল এবং পাম তেল থেকে জৈব ডিজেল তৈরি হয়। ভারত এই কাজের জন্য বেছে নিয়েছে জ্যাট্রোফা তেলকে।

৮.৬ ব্রাজিলিয় কর্মসূচী ●

আখ উৎপাদনে ব্রাজিলের স্থান ছিল উপরের দিকে। তাই ব্রাজিলের পক্ষে কম খরচে এথানল উৎপাদন করা ছিল যথেষ্ট সুবিধাজনক। ১৯৭৫ সালে ব্রাজিল PROALCOOL প্রকল্প গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল পেট্রোলের পরিবর্তে আখ থেকে তৈরি এথানল ব্যবহার করা এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মুখও দেখে এই প্রকল্প। এর ৩৫ বছর পরে, এথানল জ্বালানির মোট চাহিদার ২১ শতাংশ পূরণ করে। সাতের দশকে ব্রাজিল আখের উৎপাদনে শীর্ষে থাকলেও এথানল উৎপাদনের হার কম ছিল এবং খরচও ছিল বেশি। তাই প্রকল্পের গোড়ার দিকে এথানলে ভর্তুকি দিতে হয়েছে। শুরুতে ব্রাজিল কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আরও উচ্চ মানের আখ উৎপাদন শুরু হয়। বড় বড় জমির মালিকদের হাতে চলে যায় আখ উৎপাদন।

ফসলের উন্নতির পরবর্তী পর্যায়ে চিনি কলের আধুনিকিকরণ হয়। বর্তমানে ব্রাজিলে এক হেক্টর জমি থেকে ৬০০০ লিটার এথানল পাওয়া যায়। ভারতে হেক্টর পিছু গড় উৎপাদন প্রায় ৪৬০০ লিটার। ব্রাজিলে উৎপন্ন আখের মাত্র অর্ধেক ব্যবহার হয় চিনি তৈরিতে। বাকি অর্ধেক ব্যবহৃত হয় এথানল তৈরির কাজে। গত বছর ব্রাজিল আনুমানিক তিন কোটি ৯০ লক্ষ টন চিনি এবং প্রায় দু'হাজার ৮০০ কোটি লিটার এথানল উৎপাদন করেছে।

ব্রাজিলে বিশেষ ভাবে নির্মিত কিছু সংখ্যক গাড়ি ৯৫ শতাংশ এথানল এবং পাঁচ শতাংশ জলের মিশ্রণ ব্যবহার করতে পারে। এই বিশেষ জ্বালানির দামে পেট্রোলের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। তবে, পেট্রোল এবং অনার্দ্র এথানলের (৯৯ শতাংশ বিশুদ্ধ) মিশ্রণের ব্যবহার অনেক বেশি জনপ্রিয়। এই মিশ্রণে এথানলের ভাগ থাকে ২০ থেকে ২৬ শতাংশ, যা নির্ভর করে আপেক্ষিক দামের উপর। ২০ শতাংশের

মিশ্রণের জন্য গাড়ির ইঞ্জিনে সামান্য হেরফের করলেই চলে।

সাতের দশকের দুর্দান্ত সফল সূচনার পরে, আটের দশকে তেলের দাম অস্বাভাবিক কমে যাওয়ায় ব্রাজিলের PROALCOOL প্রকল্পটি বেশ সমস্যায় পড়ে যায়। এথানলের চাহিদাও কমে যায়। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন থাকেনি, এবং তা এতটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে যে ১৯৯০ এর গোড়ার দিকে ব্রাজিলকে এথানল আমদানি করতে হয়েছে। আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কমাবার জন্য যে প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল, তার জন্যই আবার আমদানির দ্বারস্থ হতে হয়। পেট্রোল এবং এথানলের আপেক্ষিক মূল্যের পরিবর্তনের ফলে তাদের ব্যবহারের অনুপাতেরও বদল ঘটানো জরুরি হয়ে পড়ে। মোটরগাড়ি নির্মাতারা এই ঘনঘন পরিবর্তনের বিরোধিতা করতে থাকে। তাদের সঙ্গে অ্যালকোহল নির্মাতাদের সংঘাত জনমানসে এই প্রকল্প সম্পর্কে কিছুটা অনাস্থার ভাব তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের অবসান ঘটে ফ্লেক্স-ফুয়েল যানবাহন চালু করার পর। এই ধরণের গাড়িতে ৮৫ শতাংশ এথানল পর্যন্ত যে কোনও মিশ্রণই ব্যবহার করা চলে। ৮৫ শতাংশ এথানলের এই মিশ্রণকে বলে E 85। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই E 85 ব্যবহার করে এবং সেদেশে ৬০ লক্ষ ফ্লেক্স-ফুয়েল গাড়ি আছে।

বাংলা বনাম ব্রাজিল ●

শিকাগো গ্যাস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কলিন সেন যেমন এল এন জি বিশেষজ্ঞ, তেমনই খাদ্যের বিবর্তন ও ইতিহাসেরও একজন পণ্ডিত। তিনি বলেন, বাঙালিরা ছানা তৈরি করতে শিখেছিল পর্তুগিজদের কাছে। ক্রমেই এই ছানার রকমারি সুস্বাদু মিষ্টির স্রষ্টা হয়ে ওঠে বাঙালিরা। ব্রাজিলিয়রাও কি তাই করে? তারা আদতে মিষ্টান্ন প্রিয়। ভারতের তুলনায় সেদেশের মাথা পিছু চিনির খরচ আড়াই গুণ বেশি। কিন্তু তাদের দেশে রসগোল্লার মতো মিষ্টি নেই। সেখানে ছানা আছে, চিনিও আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। অভাব কেবল বাঙালি 'জিনিয়সের'।

৮.৭ ভারতীয় কর্মসূচী ●

আখের উৎপাদন ব্রাজিলের মত ভারতেও বেশী। আখ উৎপাদনে ভারত বহু সময়েই ব্রাজিলকেও অতিক্রম করে গেছে। তাহলে, সাতের দশকের ব্রাজিলের মতো ভারতও কেন এথানল উৎপাদনের উদ্যোগ নিল না?

একটি বড় কারণ হয়তো ছিল এই যে সাতের দশকে ব্রাজিলের তুলনায় ভারতে

গাড়ির সংখ্যা ছিল নেহাতই কম। চাহিদা কম থাকার জন্যই বিকল্প জ্বালানির সন্ধানে তেমন আগ্রহ দেখায়নি ভারত। আর একটা কারণ ছিল—রাশিয়া। ভারতকে তারা ক্রমাগত ভরসা দিয়েছে যে ভারতের তেলের ভাণ্ডার অফুরান। এর ওপর, ১৯৭৫ সালেই সন্ধান পাওয়া গেল 'বম্বে হাই'-এর। এই অবস্থায় এথানল নিয়ে ভাবনাকে স্বাভাবিক ভাবেই অগ্রাধিকার দেওয়া হল না।

শক্তি নিরাপত্তা অথবা পরিবেশ রক্ষা—উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এথানল তৈরির প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক উদ্যোগটা নিতে হয় দেশের চিনি শিল্পকেই। চিনি শিল্পের প্রধান সমস্যাই হল উৎপাদনের অনিশ্চয়তা। এক বছর উৎপাদনের হার লাভজনক হল তো তার পরের বছর মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন লোকসানের কারণ হয়ে উঠল। চিনি শিল্পের এরকম বিপদের সময় এথানল প্রকল্প তাকে লাভের সুযোগ করে দেয়। ব্রাজিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রভাবশালী কৃষক এবং শিল্পপতিরা এথানল প্রকল্প শুরু করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যে কোনও কারণেই হোক, সাতের দশকে ভারতীয় চিনি শিল্প এথানল প্রকল্প চালু করতে পারেনি। তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছর। ২০০৩ সালে আখ উৎপাদনকারী এক রাজ্যের নেতা পেট্রোলিয়ম মন্ত্রকের দায়িত্ব পান। তাঁরই বদান্যতায় ভারতের কয়েকটি বড় শহরে এথানল প্রকল্প চালু হয়।

ভারতে আমরা আখের রস থেকে শুধু চিনিই তৈরি করি। ব্রাজিলের মত অ্যালকোহল তৈরিতে আখের রস ব্যবহার করিনা। আমরা অ্যালকোহল তৈরি করি 'মোল্যাসেস' থেকে; আখের রস থেকে চিনি বার করে নেবার পরে যে গাঢ় বাদামী রংয়ের তরল অবশিষ্ট থাকে, সেই অবশিষ্ট থেকে। এই মোল্যাসেস কিন্তু গুড় নয় যদিও গুড়কে ইংরেজিতে বলে মোল্যাসেস, সম্ভবত তার রংয়ের জন্য। গুড় বা খাণ্ডসারি যে আখ থেকে তৈরি হয় তা চিনিকলে ঢোকেইনা।

২০০৩ সাল থেকেই ভারত সরকার এথানল তৈরির জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যাতে পেট্রোলে পাঁচ শতাংশ এথানল মেশানো যায়। আমাদের দেশে পেট্রোল খরচ হয় বছরে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টন। তাহলে এথানলের প্রয়োজন ছয় লক্ষ টন বা ৭০ কোটি লিটার। বর্তমানে আখের উৎপাদন এতটাই বেশি যে আমরা বছরে ২৫০ কোটি লিটারেরও বেশি অ্যালকোহল উৎপাদন করতে পারি। সুতরাং, দেশের রাসায়নিক শিল্প এবং সুরার প্রয়োজন মিটিয়েও বছরে এই পরিমাণ এথানল উৎপাদন করতে সক্ষম ভারত।

সাধারণত মোল্যাসেস বিক্রি হয় কিলো প্রতি চার থেকে পাঁচ টাকায়। এক লিটার অ্যালকোহলের জন্য প্রয়োজন ৪.৫ কিলো মোল্যাসেস। সুতরাং কাঁচামালের দাম

লিটার প্রতি ১৮ থেকে ২২ টাকা। আমাদের দেশের কারখানাগুলি সম্প্রতি অ্যালকোহলকে ৯৫ থেকে ৯৯ শতাংশ শুদ্ধ করার প্রযুক্তি চালু করেছে। এরজন্য যে খরচ করা হয়েছে, তা পূরণ হওয়া দরকার। তেল কোম্পানিগুলি এথানলের যে দাম ঠিক করেছে তা যথেষ্ট বলেই মনে হয়। চাহিদার তুলনায় যোগান কিন্তু যথেষ্ট নয়।

গাড়ির ইঞ্জিনের রদবদল না করেই ডিজেলের সঙ্গে ২০ শতাংশ পর্যন্ত জৈব ডিজেল মিশিয়ে ব্যবহার করা চলে। এই মিশ্রণকে বলা হয় B20। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি বেশ জনপ্রিয়। এমনকি ওখানকার বেশ কয়েকটি প্রদেশে B20 ব্যবহার বাধ্যতামূলক। জার্মানি বেশ কিছুদিন ধরেই B100 ব্যবহার করছে। ওখানকার এক হাজার বা তারও বেশি পাম্পে এই ডিজেল পাওয়া যায়। ইউরোপের অন্যত্র B5ই বেশি জনপ্রিয়। পেট্রোলের সঙ্গে এথানল মেশানোর পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০১৭ সালের মধ্যে ডিজেলের সঙ্গে ২০ শতাংশ জৈব ডিজেল মেশানো হবে। আমাদের দেশের জন্য ডিজেলের অংশটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেননা ২০১৬-১৭ সাল নাগাদ আমাদের ডিজেলের খরচ হবে আট থেকে সাড়ে আট কোটি টন। সেই তুলনায়, এক কোটি ৬০ লক্ষ টনের পেট্রোলের খরচ অনেকটাই কম।

ডিজেল যেহেতু আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ, তাই ডিজেলের সঙ্গে এথানল মেশানোর চেষ্টাও চলছে। ভারতে পাঁচ শতাংশ এথানলের মিশ্রণ ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে। ব্রাজিল সাত শতাংশের ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এথানলের অক্টেন বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট বেশি। এর ফলে একে পেট্রোলের সঙ্গে মেশানো ভাল। ডিজেলের অক্টেন বৈশিষ্ট্য কম আর সিটেন বৈশিষ্ট্য বেশি। তাই ডিজেলের সঙ্গে এথানল মেশালে সেই মিশ্রণের অক্টেন বৈশিষ্ট্য কমাতে আরও কোনও রাসায়নিক যোগ করতে হয়। এই সমস্যার কোনও সমাধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যেহেতু পেট্রোলের সঙ্গে মেশানোর মতো যথেষ্ট এথানলই আমরা যোগাড় করে উঠতে পারিনি, তাই ডিজেলের সঙ্গে তা মেশাবার বিষয়টি আমাদের কাছে নিছকই গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে।

ভারতে বহু ধরনের তৈলবীজ উৎপন্ন হলেও ভোজ্য তেলের সরবরাহ যথেষ্ট নয়। তাই ভোজ্য তেল দিয়ে জৈব ডিজেল বানানো সম্ভব নয়। সুতরাং জৈব ডিজেলের জন্য জ্যাট্রোফা কারকাস নামে এক ধরনের অ-ভোজ্য তৈলবীজ চাষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জ্যাট্রোফা দেশী তৈলবীজ নয় এবং ভারতের কোথাও সুপরিকল্পিতভাবে এর চাষও হয়নি। তাই এই প্রকল্পের শুরুতেই প্রয়োজন উচ্চমানের বীজ চিহ্নিত করা, তার পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করা, চাষের জন্য জমি নির্দিষ্ট করা এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ভাবে এই চাষের কাজ চালানো। গত কয়েক বছর ধরে এই সব কাজই চলছে।

এক হেক্টর জমি জুড়ে কেবল জ্যাট্রোফা চাষ করলে ৩০০০ কিলো বীজ পাওয়া

যায়। এর থেকে ৩৫-৪০ শতাংশ তেল পাওয়া যাবে। সুতরাং, এক হেক্টর জমি থেকে পাওয়া যেতে পারে ১২০০ কিলো তেল। তার মানে এক কোটি ৬০ লক্ষ টন জৈব ডিজেল পেতে হলে আমাদের এক কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জাট্রোফা চাষ করতে হবে। বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার বিভিন্ন তেল কোম্পানি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থাকে জ্যাট্রোফা চাষ শুরু করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। কয়েকটি জৈব ডিজেল উৎপাদন কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। এগুলির কাঁচামাল হল আমদানি করা চর্বি বা ব্যবহৃত রান্নার তেল। যেসব উৎপাদন কেন্দ্র রপ্তানির বরাত পেয়েছে, তারাই টিঁকে থাকতে পেরেছে। বাকিরা কাজ গুটিয়ে নিয়েছে। ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি আবার তাদের প্রয়োজনীয় জৈব ডিজেল পায়না। তারা যে দাম দেয়, তা উৎপাদকের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

২০১৭ সালের মধ্যে আমাদের পেট্রোলের খরচ বেড়ে হবে এক কোটি ৬০ লক্ষ টন। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০১৬-১৭-এর মধ্যে পেট্রোলের সঙ্গে ২০ শতাংশ এথানল মেশানো হবে। তা করতে হলে আমাদের প্রায় ৬০০ কোটি লিটার এথানল উৎপন্ন করতে হবে। তার মানে আখ চাষ ৪০ লক্ষ হেক্টর থেকে বাড়িয়ে এক কোটি হেক্টর জমিতে করতে হবে। কিন্তু, এই অতিরিক্ত ৬০ লক্ষ হেক্টর অথবা জ্যাট্রোফা চাষের জন্য এক কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমি আসবে কোথা থেকে?

আমাদের দেশে ছয় কোটি ৩০ লক্ষ হেক্টর পতিত জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। এখন তা কমে পাঁচ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর হয়েছে, কারণ আশি লক্ষ হেক্টর পুনরুদ্ধার হয়েছে। যার যখন, যে কোনও কারণেই জমির প্রয়োজন হয় তখন তার নজর পড়ে এই পতিত জমিতেই। তাই কেমিক্যাল হাব বা সামাজিক বনসৃজন, দরিদ্রদের জন্য আবাসন বা সৌর প্যানেল বা বায়ু চালিত টারবাইন—সব ক্ষেত্রেই কথা উঠেছে এই পতিত জমিরই। এবার অতিরিক্ত আখ উৎপাদন অথবা জ্যাট্রোফা চাষও কি হবে সেই পতিত জমিতেই?

এথানল বা বায়োডিজেল মিশ্রণের পরিকল্পনা তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন উৎপাদকদের ভাল দাম দেওয়া যাবে —অন্তত শোধনাগার গেটের দাম তো দিতেই হবে; তার বেশিও দেওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে যদি এথানল বা জৈব ডিজেলের দাম কমে যায়, তাহলে তা আমদানি করা যেতে পারে। ব্রাজিল বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইসব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। তবে এই ধরনের আগ্রাসি পরিকল্পনার কিছু সমস্যা আছে। লোভনীয় দাম দেওয়া হলে জমি, জল অথবা অন্যান্য সম্পদ খাদ্যশষ্য থেকে এই ধরনের কৃষিতে ব্যবহৃত হতে বাধ্য। এর ফল হতে পারে মারাত্মক। আখের রস যদি চিনির বদলে অ্যালকোহল তৈরির কাজে লাগে, তাহলে তা কতখানি

অসন্তোষের কারণ হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমরা যদি এই প্রকল্পকে ছোট মাপে সীমিত রাখি, তাহলে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে—সুফলা জমিতে জ্যাট্রোফা চাষ হবে না, জৈব ডিজেলের জন্য ভোজ্য তেল ব্যবহৃত হবে না এবং আখের রস থেকে এথানল তৈরি হবে না। কিন্তু, সবটা তো আমাদের হাতে নেই। ইউরোপ তার বিপুল চাহিদা মেটানোর জন্য যদি বেশি দাম দেয়, তাহলে আমরা কি করব?

যে প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, তার সামাজিক প্রভাব নিয়ে চিন্তিত হওয়া কি যথাযথ? ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে যে এই প্রশ্ন একেবারে গুরুত্বহীন নয়। ব্রাজিলে ক্ষুদ্র কৃষকদের ছোট ছোট জমি জুড়ে যখন বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে, তখন তা দেশের সার্বিক বেকারত্বের হার হয়তো কমিয়েছে। কিন্তু এই সব কৃষিক্ষেত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক নিপীড়ন এবং অনৈতিকতার অভিযোগও উঠেছে। দীর্ঘ ৩৫ বছরের এথানল উৎপাদন প্রকল্পের পরেও আয় বৈষম্যের ক্ষেত্রে ব্রাজিলের স্থান যথেষ্টই উপরের দিকে। ■

তৃতীয় ভাগ শক্তির অন্যান্য উৎস

- পরমাণু শক্তি
- দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস
- অপ্রচলিত এবং কম প্রচলিত শক্তি

নবম অধ্যায় পরমাণু শক্তি

৯.১ পারমাণবিক বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিশন ●

২০ শতকের গোড়ার দিকেই পদার্থবিজ্ঞানীরা পরমাণু বা অ্যাটমের আকার ও গঠনের এক স্পষ্ট চিত্র আঁকতে পেরেছিলেন। প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে পজিটিভ আধানযুক্ত প্রোটন এবং আধানবর্জিত নিউট্রনে গড়া ঘন ও ভারী নিউক্লিয়াস। কেন্দ্রের নিউক্লিয়াসের চারপাশে রয়েছে নেগেটিভ আধানযুক্ত কণিকা ইলেকট্রন। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর সমান। সেই তুলনায় ইলেকট্রন প্রায় ২০০০ গুণ হালকা। পরমাণুর ভরের বেশিরভাগই হল নিউক্লিয়াসের ভর। আর, পরমাণুর আয়তনের বেশিরভাগটাই দখল করে ঘূর্ণমান ইলেকট্রন। একটি পরমাণুর ইলেকট্রনের সংখ্যা সবসময়েই প্রোটনের সংখ্যার সমান। প্রোটন ও ইলেকট্রনের তড়িদাধান সমান কিন্তু বিপরীত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে পরমাণু নিরপেক্ষ। নেগেটিভ আধানযুক্ত ইলেকট্রন পজিটিভ প্রোটোনের আকর্ষণে নিউক্লিয়াসের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল—তারা কেন্দ্রের চারপাশে না ঘুরে, নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয় না কেন? বিশিষ্ট ডেনিশ পদার্থবিজ্ঞানী নীলস্ বোর বলেছিলেন, প্রকৃতির নিয়মই তা করতে দেয় না। এরপর প্রায় এক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, কিন্তু আজও কেউ এই 'রাজকীয়' ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

গঠনগত দিক থেকে সব পরমাণুই একইরকম। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কারবনের মতো মৌলের চরিত্র ভিন্ন— কারণ, তাদের পরমাণুতে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন। অধিকাংশ পরমাণুই বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। যেমন কারবন পুড়ে গিয়ে কারবন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে অথবা বহু সংখ্যক হাইড্রোজেন এবং কারবন পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরি করে হাইড্রোকারবন। যে কোনও মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় তার পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা দিয়ে (যা প্রোটনের সংখ্যার সমান)। রাসায়নিক বিক্রিয়া শুধু ইলেকট্রনের পুনর্বিন্যাস করে— অবিকৃত থাকে নিউক্লিয়াস। তার মানে এই নয়, যে নিউক্লিয়াস অপরিবর্তনীয়। বহু নিউক্লিয়াসই তেজষ্ক্রিয়তার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তিত হয়। তেজষ্ক্রিয় এই নিউক্লিয়াসগুলি থেকে নিক্ষিপ্ত হয় দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনে গড়া এক আলফা কণিকা—অথবা একটি ইলেকট্রন কিংবা উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামা রশ্মি। এই গামা রশ্মির

সংস্পর্শে এলে ক্যানসার বা মৃত্যুও হতে পারে।

তেজষ্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে তীব্রগতিতে নিক্ষিপ্ত আলফা কণিকাগুলির আঘাতে অন্য নিউক্লিয়াসের নিউট্রন এবং প্রোটন বাঁধন মুক্ত হয়ে বেরিয়ে গেলে এক মৌল রূপান্তরিত হয় অন্য মৌলে। একে বলা হয় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া। রাসায়নিক ও নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মধ্যে সাধারণ পার্থক্য হল, রাসায়নিক বিক্রিয়া বিভিন্ন মৌলকে যুক্ত করে যৌগিক পদার্থ গঠন করে। আর নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলে মৌলের রূপান্তর ঘটে। কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে তামাকে সোনায় পরিবর্তিত করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন একাধিক নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া।

মহার্ঘ্য সোনা উৎপাদনে পদার্থবিজ্ঞানীরা উৎসাহী নন। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সম্পর্কে তাদের গভীর উৎসাহের কারণ হল, এই ধরনের বিক্রিয়া থেকেই বহুল পরিমাণে শক্তি নির্গত হয়, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ার তুলনায় কয়েক লক্ষ গুণ বেশি। বিশেষ করে, পারমানবিক বিভাজন বা ফিশন এবং পারমানবিক সংযোজন বা ফিউশনের ফলে সর্বাধিক পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। বিভাজন বিক্রিয়ায়, ইউরেনিয়ামের মতো ভারী মৌলের নিউক্লিয়াসকে সঠিক শক্তি দিয়ে আঘাত করলে তা প্রায় সমান দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়। আবার সংযোজন বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেনের মতো হালকা মৌলের দুটি নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে আরও ভারী একটি মৌলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৮ সালে জার্মান রসায়নশাস্ত্রবিদ অটো হান প্রথম এই বিভাজন বিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। ইউরেনিয়ামের পরমাণু কেন্দ্রকে কম শক্তিসম্পন্ন নিউট্রনের আঘাতে তিনি এই বিক্রিয়া ঘটান।

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U = {}^{142}_{54}Xe + {}^{90}_{38}Sr + 4.{}^{1}_{0}n$$

এটিই কিন্তু ইউরেনিয়ামের একমাত্র সম্ভাব্য বিভাজন নয়। কিছু ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস বিভক্ত হতে পারে বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টনে অথবা সিসিয়াম এবং নেপচুনিয়ামেও। আগ্রহের বিষয় হল, কম শক্তিসম্পন্ন বা 'ধীরগতির' নিউট্রনের (গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে দুই কিলোমিটারের কিছু বেশি!) আঘাতে ইউরেনিয়ামের বিভাজন ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি। পরমাণু চুল্লি তৈরি করার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অটো হান-এর পরীক্ষামূলক বিভাজন বিক্রিয়ায় প্রত্যেকটি বিভাজিত নিউক্লিয়াস ২০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন করেছিল। তুলনামূলক ভাবে বলা যায় কারবন পরমাণুর কথা, যা পোড়ালে মাত্র চার ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হয়। পরে,

অন্যান্য পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, নিউক্লিয়াস বিভাজনের ফলে কিছু নিউট্রনও উৎপন্ন হয়। উচ্চ শক্তির এই নিউট্রনের গতি কমিয়ে ধারাবাহিক বিভাজনও ঘটানো যায়। নিউক্লিয়াসের সংখ্যা সামান্য থাকলে ধারাবাহিক বিভাজনের ক্রম কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে পরিমাণ পর্যাপ্ত হলে নিউক্লিয়াসের ধারাবাহিক এই বিভাজন থেকে বিস্ফোরণ হবে। কমও না বেশিও না, নিউক্লিয়াসের সংখ্যা মাঝামাঝি রাখতে পারলে বিভাজনের হারও স্থিতিশীল রাখা সম্ভব। ইউরেনিয়ামের এই নিয়ন্ত্রিত পরিমাণকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত ভর (Critical Mass)। স্থিতিশীল ধারাবাহিক বিভাজনকে ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

পরমাণু-বিভাজন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায় নি। হান-এর আবিষ্কার হয়েছিল হিটলারের অস্ট্রিয়া দখল এবং চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের মধ্যবর্তী সময়ে। আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। ১৯৪১ সালের মধ্যে জার্মানির অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে জার্মানিতে তখন বিজ্ঞানীর একান্তই অভাব। তবে ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ তখনও সেখানেই ছিলেন। আর তাই জার্মানির পরমাণু বোমা বানাবার যোগ্যতাও ছিল। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বিজ্ঞানীরা জার্মানির আগেই পরমাণু বোমা বানাতে চেয়েছিলেন। বোমা বানানোর কাজে রুজভেল্টের সম্মতি আদায় করতে তাঁরা আইনস্টাইনের সাহায্যও নিয়েছিলেন। ফলে শুরু হয় ম্যানহ্যাটন প্রকল্প। ১৯৪২ সালে রবার্ট ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে এই প্রকল্পের সূচনা হয় এবং ১৯৪৫ সালে তৈরি হয় পরমাণু বোমা। জার্মানি এই প্রযুক্তির ধারে কাছেও ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর পরমাণু বোমা তৈরি করে সোভিয়েত রাশিয়া।

পরমাণু বোমা অথবা তাপ উৎপাদনকারী পরমাণু চুল্লি—যাই বানানো হোক, ইউরেনিয়ামের নিয়ন্ত্রিত ভর সম্পর্কে ধারণা থাকাটা প্রাথমিক শর্ত। চারের দশকের গোড়ার দিকে এ ব্যাপারে তথ্যের অপ্রতুলতা তো ছিলই, প্রাপ্ত তথ্যগুলিও খতিয়ে দেখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এনরিকো ফেরমিকে। তিনি ১৯৪২ সালে শিকাগোর এক স্টেডিয়ামে বিশ্বের প্রথম পরমাণু চুল্লি তৈরি করেন। ছোট মাপের এই চুল্লির সর্বাধিক উৎপাদন ছিল ২০ ওয়াট বিদ্যুৎ, যা দিয়ে স্রেফ একটি বাল্‌ব জ্বালানো যায়। কিন্তু এই পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছিল ৪০ টনেরও বেশি ইউরেনিয়াম। ভয় ছিল, ইউরেনিয়ামের নিয়ন্ত্রিত মাত্রা অতিক্রম করে যদি বিস্ফোরণ ঘটে, তাহলে কী হবে? শিকাগোর মতো জনবহুল এলাকা কি এই ধরনের পরীক্ষা চালানোর উপযুক্ত স্থান? সম্ভবত নয়, তবে ফেরমির মতো বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে এই ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল খুবই কম।

চারের দশক জুড়ে পরমাণু অস্ত্রের নকশা এবং তার সামরিক প্রয়োগের বিষয়ে নানা গবেষণা চলে। পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী চুল্লির নকশা তৈরি করার কাজ শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে 'অ্যাটমস ফর পিস' কর্মসূচীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত সহ একাধিক দেশ এই তথ্যে তাত্ত্বিকভাবে উপকৃত হলেও ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওবনিন্স্ক্-এ প্রথম বাণিজ্যিক পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তারপর এই ধরনের কেন্দ্র দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সহ অন্যান্য দেশেও। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে পরমাণু শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা এক লক্ষ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে হয় তিন লক্ষ মেগাওয়াট। এরপর পুরানো চুল্লিগুলি ক্রমেই বাতিল হতে শুরু করায় নয়ের দশক থেকেই উৎপাদন নিম্নমুখী হয়। পাঁচের দশকে বিদ্যুতের সব থেকে সম্ভাবনাময় উৎস নয়ের দশকে তাই ক্রমেই বিলীয়মান হতে থাকে। এর কারণ কী? ভবিষ্যতই বা কতটা উজ্জ্বল?

৯.২ পরমাণু চুল্লি ●

পরমাণু চুল্লিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ধারাবাহিক বিভাজন থেকে। এর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন এমন এক জ্বালানির যা বিভাজনপ্রবণ বা ফিসাইল। পরমাণু চুল্লিতে বা বোমায় ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি হিসেবে এ পর্যন্ত মাত্র দুটি মৌলকেই চিহ্নিত করা গেছে—ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম।

দ্বিতীয় প্রয়োজন ধীরগতি নিউট্রনের যা বিভাজন ঘটাবে বা জ্বালানিতে আগুন লাগানোর কাজ করবে। তৃতীয় প্রয়োজন বাষ্পের যা টারবাইন চালাবে। বাষ্পের জন্য আবার দরকার জলের। এছাড়া দরকার বিভাজন বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

ইউরেনিয়ামকে চুল্লিতে ব্যবহার করতে হলে তাকে ইউরেনিয়াম-ডাই-অক্সাইডের গুঁড়োতে পরিণত করে পেনসিলের আকার দেওয়া হয়। পেনসিলগুলি লম্বা ধাতব নলে (বিজ্ঞানের ভাষায় 'পিন') রেখে পিনের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এইবার, পিনগুলিকে ঢোকানো হয় চুল্লির ভিতরকার চ্যানেলে। চ্যানেল ও পিনের মাঝখান দিয়ে ঠাণ্ডা জল যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকে। যে কোনো পরমাণু চুল্লিতে এ ধরনের কয়েকশ পিন ব্যবহার হয়।

নিউট্রনের যোগান দেয় রেডিয়াম-বেরিলিয়াম মিশ্রণ। তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম নিঃসৃত আলফা-কণিকা বেরিলিয়ামের নিউট্রন ঠেলে বার করে দেয়। সমস্যা হল, এগুলি

দ্রুতগতির নিউট্রন। আবার ইউরেনিয়মের বিভাজন থেকে যে নিউট্রন বেরোবে সেগুলিও দ্রুতগতির। এই গতি কমিয়ে আনার জন্য ব্যবহার করা হয় বিশেষ গতি-নিয়ন্ত্রক (Moderator)—গতি-নিয়ন্ত্রক ভর্তি রাখে চ্যানেলগুলির অন্তর্বর্তী শূন্যস্থান।

ধারাবাহিক বিভাজন শুরু হলেই জ্বালানি এবং 'পিন'গুলি উচ্চ তাপে তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শীতলনের প্রয়োজন ঘটে। শীতলনের জন্য জলের থেকে উপযোগী তরল আর হয় না বলেই অধিকাংশ চুল্লিতেই জল ব্যবহার করা হয়। উত্তপ্ত জ্বালানির 'পিন'-এর সংস্পর্শে এসে জল ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বা জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

চুল্লির প্রাণকেন্দ্র হল জ্বালানি এবং গতি-নিয়ন্ত্রকের এই বিন্যাস। এটি ধরা থাকে ১২-১৫ ইঞ্চি পুরু এক ইস্পাতের আধারে। জ্বালানির 'পিন'-এর মধ্যে ধারাবাহিক বিভাজনের ফলে উৎপন্ন হয় অতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। চুল্লির আধারকে এমন ভাবে তৈরি করা হয়, যাতে অতি উত্তাপের ফলে জ্বালানির কোনো 'পিন' গলে গেলেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরে বেরিয়ে না আসে। এই আধারটি আবার রাখা হয় একটি বাড়ির ভিতরে। ফলে চুল্লিটি ঘেরা থাকে আরও এক সুরক্ষাপরতে। সুরক্ষার নির্দেশনামা মেনেই কোনো ব্যক্তি এই চুল্লির বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারে এবং বাড়ির ভিতর এবং বাইরের বিকিরণের মাত্রা সব সময়য়েই কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

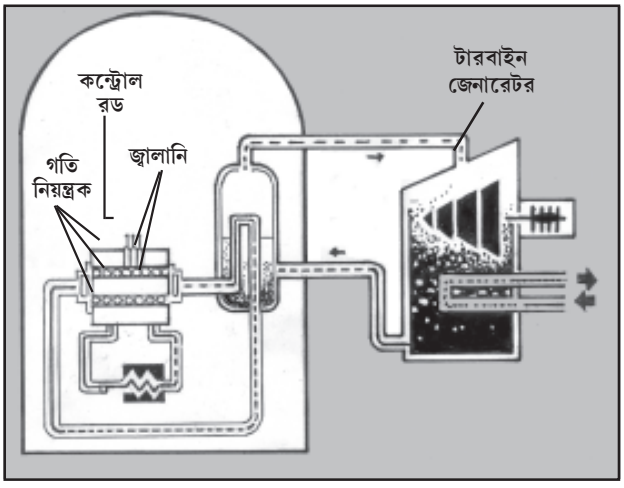

পরমাণু চুল্লির গঠন

ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম মৌলে একাধিক সমস্থানিক (আইসোটোপ) থাকে। এইগুলির নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা অভিন্ন হলেও নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন হয়। এই আইসোটোপ বা সমস্থানিকগুলির রাসায়নিক ধর্ম এক হলেও বিভাজনপ্রবণতায় অনেক পার্থক্য আছে।

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ইউরেনিয়ামের দুটি সমস্থানিক বা আইসোটোপ আছে—U 235 এবং U 238। ধীরগতির নিউট্রন থাকলে U 235 হল অত্যন্ত বিভাজনপ্রবণ এবং এটিই হল একমাত্র সমস্থানিক যা ব্যবহারযোগ্য পরিমাণে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। অন্য বিভাজনপ্রবণ

সমস্থানিকগুলিকে চুল্লির ভিতরে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে হয়। থোরিয়ামকে (Th 232) দ্রুতগতির নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে U 233 উৎপন্ন হয়। একই ভাবে U 238 থেকে উৎপন্ন হয় Pu 239। এই দুটি আইসোটোপই ফিসাইল তবে এরা U 235 এর থেকে কিছুটা আলাদা। Pu 239-এর বিভাজনের জন্য দ্রুতগতির নিউট্রন প্রয়োজন। U 233 দু'ধরনের গতির নিউট্রনেই বিভাজিত হতে পারে। পরমাণু চুল্লিতে দু'ধরনের ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয়—প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম এবং সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে U 235 থাকে ০.৭ শতাংশ। ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করলে এই অনুপাত পৌঁছায় ৩ থেকে ৫ শতাংশে।

বেশিরভাগ চুল্লির জ্বালানি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম এবং গতি-নিয়ন্ত্রক হল জল। তবে যেসব চুল্লির জ্বালানি প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম সেখানে জল ব্যবহার করা যায় না। সেক্ষেত্রে গতি-নিয়ন্ত্রকের কাজ করে ভারি জল (হেভি ওয়াটার)। ভারতের অধিকাংশ চুল্লিতেই প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

উত্তপ্ত পিনের সংস্রবে আসা জলকে ফুটতে দেওয়া হয় ফুটন্ত জল-চুল্লি বা বয়েলিং ওয়াটার রিঅ্যাকটর-এ (বি ডবলিউ আর)। তারাপুরে এই ধরনের দুটি চুল্লি আছে। জ্বালানির 'পিন'গুলি মুখ বন্ধ হলেও শীতলকারী তরলের সঙ্গে সবসময়েই খানিকটা তেজষ্ক্রিয় পদার্থ মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বি ডবলিউ আর-এর ক্ষেত্রে এই তেজষ্ক্রিয়তা টারবাইনেও ছড়িয়ে যেতে পারে এবং কোনও ছিদ্র দিয়ে তা বেরিয়ে বিস্তৃত অঞ্চল আক্রান্ত হওয়ারও ভয় থাকে। উচ্চচাপ জল-চুল্লি বা প্রেশারাইজড ওয়াটার রিঅ্যাকটর-এ (পি ডবলিউ আর) জলকে চাপের মধ্যে রাখা হয় এবং ফুটতে দেওয়া হয় না। এই ধরনের চুল্লিই বেশি জনপ্রিয়। এখানে বাষ্প তৈরি করা হয় একটি পৃথক বর্তনীতে। এইভাবে তেজষ্ক্রিয়তাকে চুল্লির মধ্যেই সীমিত রাখা হয়। বেশিরভাগ ভারতীয় চুল্লিই উচ্চচাপ জলচুল্লি এবং এগুলিতে 'নিয়ন্ত্রক' হিসাবে ভারি জল ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের চুল্লিকে বলে উচ্চচাপ ভারি জল-চুল্লি বা প্রেশারাইজড হেভি ওয়াটার রি অ্যাকটর (পি এইচ ডবলিউ আর)।

পরমাণু চুল্লির সঙ্গে পরমাণু বোমার পার্থক্যই হল ধারাবাহিক বিভাজনের নিয়ন্ত্রণের তারতম্যে। চুল্লিতে এই ধারাবাহিক বিভাজন সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত থাকে। বোমার ক্ষেত্রে শিথিলভাবে গ্রথিত ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামকে খুব দ্রুত সংকুচিত করে অনেক কম আয়তনে নিয়ে আসা হয়। এর ফলে ভর নিয়ন্ত্রিত মাত্রার বাইরে চলে যায় এবং ধারাবাহিক বিভাজন থেকে বিস্ফোরণ হয়। চুল্লির ক্ষেত্রে জ্বালানির বিন্যাসকে ধাপে ধাপে তৈরি করা হয়, যাতে একমাত্র প্রয়োজনের সময়েই এটি নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় পৌঁছায় এবং কখনও তার ঊর্ধ্বে না যায়। বিপদের সামান্যতম ইঙ্গিত পেলেই চুল্লির কেন্দ্রস্থলে ক্যাডমিয়াম বা বোরনের দন্ড ঢুকিয়ে নিউট্রনকে শোষণ করে ধারাবাহিক বিভাজন থামিয়ে দেওয়া হয়। এই সুরক্ষা ব্যবস্থা হল পরমাণু চুল্লির এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তবে, বোরিক অ্যাসিড অত্যন্ত ক্ষয়কারী এবং বোরনের ব্যবহারেও অত্যন্ত সতর্কতার

প্রয়োজন। এই অ্যাসিড থেকে চুল্লির যথেষ্ট ক্ষতি এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার উদাহরণও আছে।

ধারাবাহিক বিভাজন যত অগ্রসর হয়, U 235 বিভিন্ন অন্তর্বর্তী পদার্থে বিভক্ত হতে থাকে। এর মধ্যে আছে অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়াম (Sn), সিসিয়াম (Cs) এবং আয়োডিন (I)। ইউরেনিয়ামের আর একটি সমস্থানিক U 238 চুল্লিতে উপস্থিত থাকলেও ধারাবাহিক বিভাজনে অংশ নেয় না। বরং কিছু অংশ নিউট্রন শোষণ করে P 239-এ পরিণত হয়। এই প্লুটোনিয়াম আবার ধারাবাহিক বিভাজনে যোগ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করে। ইউরেনিয়াম চুল্লি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের ৪০ শতাংশই আসে প্লুটোনিয়াম থেকে।

বিভাজনজাত পদার্থ যত জমা হয় ততই ধারাবাহিক বিভাজন দুর্বল হতে থাকে। এই অবস্থায়, বিভাজনপ্রবণ পদার্থ ফুরিয়ে যাওয়ারও আগেই জ্বালানি বদলাতে হয়। চুল্লির নকশা অনুযায়ী জ্বালানির মেয়াদ এক থেকে দেড় বছর হতে পারে। এরপর, খরচ হওয়া জ্বালানি থেকে পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের (reprocessing) মাধ্যমে অব্যবহৃত ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম উদ্ধার করা যায়।

উদ্ধার করা ইউরেনিয়াম একই চুল্লিতে আবার ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করতে গেলে প্রয়োজন দ্রুত চুল্লির (Fast-Reactor)। বেশিরভাগ চুল্লিই পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের পথে না গিয়ে একবারই ব্যবহার করার পর জ্বালানি বদলে ফেলে। ভারতে ইউরেনিয়ামের অভাব। তাই পুনঃপ্রক্রিয়া-করণের মাধ্যমে প্লুটোনিয়াম ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে।

যেসব পরমাণু চুল্লিতে জল অথবা ভারি জলের গতি-নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা হয়, তাদের বলা হয় তাপীয় চুল্লি (Thermal Reactor)। এই গতি-নিয়ন্ত্রক নিউট্রনের গতি কমিয়ে আনে। দ্রুত-চুল্লিতে কাজে লাগে দ্রুত গতির নিউট্রন। এই চুল্লিতে বিভাজনপ্রবণ পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যাতে থাকে ২০ শতাংশ U 235, অথবা Pu 239 কিংবা U 233। দ্রুতগতির নিউট্রন এই পদার্থগুলিকে বিভাজিত করতে পারে। দ্রুতগতির চুল্লি ব্যবহারের সবথেকে বড় সুবিধা হল, এখানে প্লুটোনিয়ামকে কাজে লাগানো যায়। অন্যক্ষেত্রে এই প্লুটোনিয়াম বর্জ্য পদার্থ হিসাবে বাতিল হয়ে যায়। ভারতের ক্ষেত্রে এই চুল্লি বিশেষভাবে উপযোগী কারণ এখানে ইউরেনিয়ামের সরবরাহ কম। এছাড়াও দ্রুত-চুল্লিতে আমাদের থোরিয়ামের মজুত ভাণ্ডারের সদ্ব্যবহার সম্ভব। কোনো কোনো দ্রুত-চুল্লিতে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম খরচ হল, তারও বেশি প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয়। এদের বলা হয় দ্রুত-পরিমাণবর্ধক চুল্লি (Fast Breeder Reactor)। ভবিষ্যতে এই ধরণের চুল্লির ব্যবহার অপরিসীম এবং ক্রমবর্ধমান শক্তির উৎস হয়ে উঠতে পারে।

ইউরেনিয়াম চালিত তাপীয় চুল্লির তুলনায় প্লুটোনিয়াম ব্যবহৃত দ্রুত-চুল্লির দাম অনেক বেশি হলেও ১৯৫০ এবং ১৯৬০ নাগাদ একাধিক দ্রুত-পরিমাণবর্ধক-চুল্লি তৈরি করা হয়েছিল। ধারণা ছিল, ইউরেনিয়ামের দাম বাড়বে এবং আমরা প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করতে বাধ্য হব। কার্যত দেখা গেল ইউরেনিয়ামের দাম কমই রইল। মাত্র তিনটি ছাড়া পুরানো সব দ্রুত চুল্লিই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯০ এর পর যখন পরিত্যক্ত পরমাণু বোমা থেকে প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দেওয়া হয়, তখন ইউরেনিয়ামের দাম আরও কমে যায়। দ্রুত-চুল্লির বাণিজ্যিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তবে ভারত ও জাপান এই চুল্লির ব্যাপারে তাদের গবেষণা ও উৎসাহ বজায় রেখেছে।

বর্তমানে ভারতে ৫০০ মেগাওয়াটের পরীক্ষামূলক একটি দ্রুত-পরিমাণবর্ধক-চুল্লি বা প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর (পি এফ বি আর) নির্মিয়মান। এর জ্বালানি কেন্দ্রে থাকবে প্রায় দুই টন প্লুটোনিয়াম। আমাদের পি-এইচ-ডব্লিউ-আর-এ ব্যবহৃত জ্বালানি থেকে পাওয়া যাবে এই প্লুটোনিয়াম। এই জ্বালানিকেন্দ্রকে ঘিরে থাকবে U 238 এর এক আবরণ। জ্বালানিকেন্দ্রে পরমাণু বিভাজনের ফলে নিঃসৃত নিউট্রনের আঘাতে এই U 238 ক্রমেই রূপান্তরিত হবে প্লুটোনিয়ামে। জ্বালানিকেন্দ্রে প্লুটোনিয়াম খরচ হলেও, আররণে জমবে তারও বেশি। পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে এই প্লুটোনিয়াম আবার ফিরে যাবে জ্বালানিকেন্দ্রে। এই প্রক্রিয়ার জন্য দুবছর বা তার কিছু বেশি সময় লাগতে পারে। সুতরাং এই চুল্লি শুরু করার আগে দুটি জ্বালানিকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় চার টন প্লুটোনিয়াম মজুত রাখা দরকার। তা হলেই এটি হবে স্বনির্ভরশীল। দুই টন জ্বালানিকেন্দ্রের একটি পরিমাণবর্ধক চুল্লি দুবছর কাজ করতে পারে এবং শেষে তার থেকে ২১০০ কিলো প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। এইরকম ২০টি চুল্লি একসঙ্গে কাজ করলে দুবছর অন্তর আমরা একটি করে নতুন দুই টনের উৎপাদনকেন্দ্র পেতে পারি। কোনো দ্রুত-চুল্লিতে যদি U 238-এর বদলে থোরিয়ামের আবরণ ব্যবহার করা হয়, তা হলে থোরিয়াম রূপান্তরিত হবে U 233-তে। প্রয়োজনীয় পরিমাণে U 233 পাওয়া গেলেই তা দিয়ে জ্বালানিকেন্দ্র তৈরি হতে পারে এবং থোরিয়ামের আবরণের সাহায্যে এই জ্বালানি আরও বেশি করে পাওয়া যেতে পারে।

৯.৩ ইউরেনিয়ামের মজুতভাণ্ডার ●

ভূস্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতে এর মজুত খুব সামান্য। আকরিক থেকে এই ধাতু অক্সাইড হিসেবে নিষ্কাশিত হয়। এই

অক্সাইডের ($U_3 0_8$) নাম ইয়েলোকেক। মজুত, উৎপাদন, খরচ বা বাণিজ্য—সবক্ষেত্রেই ইউরেনিয়ামের এই রূপটিরই উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে প্রমাণিত মজুত প্রায় ৭০ লক্ষ টন। ভবিষ্যতে প্রমাণিত মজুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন নির্দেশিত মজুতের পরিমাণ এক কোটি ৭০ লক্ষ টন। এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চুল্লির বছরে প্রায় ২০০ টন ইয়েলোকেক প্রয়োজন। গোটা বিশ্বের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ৩৭০,০০০ মেগাওয়াট। জ্বালানির বার্ষিক প্রয়োজন ৭০,০০০ টন। কাজেই, প্রমাণিত মজুত ও উৎপাদনের অনুপাত ১০০ বছর। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

এই মজুতভাণ্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের তুলনায় ইউরেনিয়ামের দাম অনেক বেশি স্থিতিশীল। ১৯৭০ নাগাদ তেলের দাম বাড়ায় অনেক দেশই ইউরেনিয়াম জমা করার উদ্যোগ নেয়। ফলে দামও বাড়তে থাকে। ১৯৯০ সালের পর পরমাণু অস্ত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় (৯০ শতাংশেরও বেশি সমৃদ্ধ)। এগুলি শক্তি উৎপাদনের জন্য উন্মুক্ত করতেই ইউরেনিয়ামের দাম আবার কমে যায়। এরপর, এই দ্বিতীয় উৎস থেকেই ৪০ শতাংশ ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। সম্প্রতি প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বাড়ায়, পরমাণু শক্তির উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে ইউরেনিয়ামের দামও কিছুটা বেড়েছে।

বিশ্বের অধিকাংশ পরমাণু চুল্লিতে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম (৩ থেকে ৫ শতাংশ) ব্যবহার করা হয়। ইউরেনিয়ামকে সমৃদ্ধ করার প্রথম ধাপে ইয়েলোকেককে ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডে (UF_6) পরিণত করা হয়। UF_6 হল গ্যাসিয় পদার্থ। এই গ্যাস যখন ছড়িয়ে পড়ে, এর মধ্যে থাকা U 235 পরমাণু সম্বলিত অপেক্ষাকৃত হালকা অণুগুলি ছড়ায় অনেক দ্রুত এবং U 238 সম্বলিত অনুগুলির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। U 235 এর সঠিক ঘনত্ব পেতে হলে এই প্রক্রিয়াকে বারবার অবলম্বন করতে হবে। আরও একটি পদ্ধতি হল, ঘূর্ণন সৃষ্টি করে এদের পৃথক করা। ঠিক যেমন করে দুধ থেকে মাখন বা আখের রস থেকে মোল্যাসেস তুলে নেওয়া হয়। দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে অপেক্ষাকৃত হালকা ইউ ২৩৫ মাঝখানে থাকে। সমৃদ্ধ এই মিশ্রণকে তারপর $U O_2$ তে পরিণত করা হয় এবং এটি চুল্লির জ্বালানির কাজ করে। এই দুটি পদ্ধতিই যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ—তবে তুলনামূলক বিচারে প্রথমটি আরও বেশি। এই সংক্রান্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কেননা এটি বোমা বানানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে ইউরেনিয়ামের ঘাটতি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে একে সমৃদ্ধ করার আধুনিক প্রযুক্তির অভাব। তাই আমাদের পক্ষে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। ভারতে যে পি এইচ ডবলিউ আর রয়েছে, সেখানে কম ইউরেনিয়াম লাগে। ১০০০ মেগাওয়াট প্রকল্পের জন্য প্রতি বছর প্রায় ১৫০ টন ইয়েলোকেক

প্রয়োজন হয়। ভারতে ইউরেনিয়ামের মজুত রয়েছে ঝাড়খণ্ডের যাদুগুড়া, অন্ধ্রপ্রদেশে এবং মেঘালয়ে। একে চুল্লির জ্বালানিতে পরিণত করা হয় হায়দরাবাদে।

সারা বিশ্বে থোরিয়ামের মজুত ইউরেনিয়ামের থেকে অনেক বেশি। বিশ্বের মোট থোরিয়াম মজুতের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি রয়েছে ভারতে। কেরল ও ওড়িশার মোনাজাইট বালি থোরিয়ামে সমৃদ্ধ। এই আকরিকের প্রক্রিয়াকরণ হয় ওড়িশায়। এর থেকে থোরিয়াম এবং অন্যান্য অনেক দুষ্প্রাপ্য মৌল উপাদান পাওয়া যায়।

৯.৪ পরমাণু শক্তির সমস্যা ●

পরমাণু শক্তিকে সর্বদাই চারটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথম সমস্যা হল নিরাপত্তা সংক্রান্ত। থ্রি মাইল আইল্যান্ড, বা চেরনোবিল অথবা সাম্প্রতিককালে ফুকুশিমার বিধ্বংসী দুর্ঘটনা পরমাণু শক্তির প্রবল বিপদকে জনসমক্ষে এনে দিয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যাটি হল, সংখ্যাবৃদ্ধির (Proliferation) আশঙ্কা, চুল্লির নয়—বোমার অর্থাৎ পারমাণবিক পদার্থ এবং প্রযুক্তিকে ভিন্নপথে চালিয়ে তাকে বোমা বানানোর কাজে প্রয়োগ। তা সে প্রকৃত বোমাই হোক অথবা অপরিশোধিত বোমা। তৃতীয় সমস্যা, দীর্ঘসময়ের জন্য তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বাক্স-বন্দি করা। চতুর্থ সমস্যা উদ্ভুত হয় বাকি তিনটি থেকে। আর, তা হল, পরমাণু শক্তির চড়া দাম। ১৯৮০ থেকে পরমাণু শক্তির ব্যাপারে জনসাধারণের তীব্র আপত্তির মূল কারণই হল এর দাম এবং নিরাপত্তার অভাব।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা উদ্ভুত হয় সিসিয়াম (Cs), স্ট্রনসিয়াম (Sn), আয়োডিন (I), নেপচুনিয়াম (Ne) এবং টেকনেসিয়ামের (Tc) মতো বিভাজনজাত পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা থেকে। যদিও সব পরমাণু চুল্লিতেই তেজস্ক্রিয়তাকে চুল্লির ভিতরে আবদ্ধ রাখার পর্যাপ্ত এবং বিস্তারিত ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনার সময় তা বাইরে ছড়িয়ে পড়তেই পারে। ১৯৫৭ সালে ব্রিটিশ চুল্লি উইন্ডস্কেল ১-এ আগুন লাগে। প্রথামাফিক প্রক্রিয়াতেই গ্র্যাফাইটের গতি-নিয়ন্ত্রককে উত্তপ্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, তাপমাত্রা এবং বিকিরণের মাত্রা প্রত্যাশিত সীমার থেকে অনেক বেশি হয়ে গেছে। পরীক্ষা করে দেখা যায়, যে জ্বালানির একটি অংশে আগুন লেগে গেছে। এই ধরনের আগুন নেভাতে জল ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেননা, উত্তাপের ফলে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙে যেতে পারে এবং হাইড্রোজেন থেকে বিস্ফোরণ নিশ্চিত। যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো বিকল্প পদার্থ কাজ করেনি, তাই শেষপর্যন্ত জলই ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু ততক্ষণে আয়োডিন বাইরে বেরিয়ে অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। ফলে অন্তত দুশো জনেরও বেশি মানুষ থাইরয়েড ক্যানসারে

আক্রান্ত হন। বিপদের মাত্রা এইখানেই সীমাবদ্ধ থাকায় ব্রিটিশরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছিলেন।

সবথেকে বিপজ্জনক হল 'নিয়ন্ত্রণহীন' দুর্ঘটনা, যেখানে বিভাজন লাগামছাড়া হয়ে পড়ে। এই ঘটনা ঘটতে পারে যদি 'নিয়ন্ত্রণ দন্ড' গুলি সময়মতো কাজ না করে। ১৯৮৬ সালে চেরনোবিলের বিধ্বংসী দুর্ঘটনায় চুল্লির যন্ত্রচালকরা নিয়ন্ত্রক দন্ডগুলিকে কাজ করতে দেয়নি। চুল্লির সঙ্গে একটি নতুন যন্ত্রকে যুক্ত করা হয়েছিল এবং সেটিই পরীক্ষা করে দেখার কথা ছিল। এই পরীক্ষার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ধীরে ধীরে কমানো হচ্ছিল। কিন্তু ধীরে না কমে এটি অত্যন্ত দ্রুত কমে যায়। তাই উৎপাদন আবার বাড়াতে হয়। নিয়ন্ত্রক দন্ডগুলিকে বার করে আনা হয়— প্রথমে সামান্য পরিমাণে, তারপর আর একটু বেশি এবং শেষে সম্পূর্ণভাবে। অতএব ধারাবাহিক বিভাজনকে বিস্ফোরক হওয়ার থেকে আটকবার মতো তখন আর কিছুই ছিল না। বিস্ফোরণের ফলে চুল্লির ২০০০ টনের ঢাকনা উড়ে যায়। বিধ্বংসী আয়োডিন এবং সিসিয়াম সহ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে। এই চুল্লিতে গতি-নিয়ন্ত্রক হিসাবে ১২০০ টন গ্র্যাফাইট ছিল, যা নয় দিন ধরে পুড়তে থাকে। এরপর যখন আগুন নেভানো হয়, তখন আরও বেশি তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান বহু মানুষ, থাইরয়েড ক্যানসারে আক্রান্ত হন সহস্রাধিক। ১৯৯৯ সালে জাপানের টোকাইমুরা পরমাণুকেন্দ্রেও একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় দুই যন্ত্রচালকের। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবমুক্ত করতে কয়েকশো মানুষকে দ্রুত স্থানান্তরিত করতে হয়।

শীতলকের অভাবে দুর্ঘটনার নিদর্শন আরও বেশি। এরমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থ্রি মাইল আইল্যান্ডের দুর্ঘটনা। পাম্প বিকল হয়ে পড়ায় টারবাইনের মধ্যে বাষ্পের সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায় এবং জ্বালানিকেন্দ্র ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকে। চুল্লিটি আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার ফলে তাপমাত্রা বাড়তেই থাকে। জ্বালানি এবং ধাতুনির্মিত 'পিন'—দুইই গলে যায়। শেষ পর্যন্ত গলে যায় জ্বালানিকেন্দ্রের এক বড় অংশ। একটি ত্রুটিপূর্ণ ভাল্‌ভ থেকে ২৫০,০০০ গ্যালন শীতলক ছড়িয়ে পড়ে। সৌভাগ্যবশত বাড়িটি অবিকৃত থাকে এবং সেই কারণেই বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ১৯৯৫ সালে জাপানের মোনজু চুল্লিতেও একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার পরে চুল্লিটি বন্ধ করে দিতে হয়।

২০১১ সালের মার্চ মাসে যখন জাপানের ফুকুশিমাতে ভূমিকম্প এবং সুনামি আছড়ে পড়ে তখন এখানকার ছটির মধ্যে তিনটি চুল্লি বন্ধ ছিল। বাকি তিনটিও নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ফলে জ্বালানিকেন্দ্র উত্তপ্ত হতেই থাকে, ঠিক যেমনটা হয়েছিল থ্রি মাইল আইল্যান্ডে। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শীতলক পাম্প বন্ধ হয়ে যায়। সুনামি আসা পর্যন্ত আপৎকালীন বিদ্যুৎ সংযোগ কাজ করে। কিন্তু

তারপর, প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জেনারেটরগুলিও ভেসে যায়। শীতলণ প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দুটি চুল্লির জ্বালানিকেন্দ্র গলে যায়। পুড়ে যায় একটি চুল্লির ইস্পাতের আধারের কিছু অংশ।

বিস্ফোরণ আটকাবার জন্য আধারের ভিতরের চাপ কমানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চাপ কমাতে বাষ্প বার করে দেওয়া হয় এবং এই বাষ্পের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থও বেরিয়ে আসে। চুল্লির ভিতরে প্রচণ্ড তাপে বাষ্প পরিণত হয় হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে। হাইড্রোজেন বাইরে বেরিয়ে এসে বিস্ফোরন ঘটায় এবং এর ফলে চুল্লির বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবহৃত জ্বালানি যে পুকুরে রাখা ছিল তার জলের সঞ্চালনও অনিয়মিত হয়ে যায়। জল ফুটতে থাকে এবং উত্তপ্ত জ্বালানি গলতে থাকে। হেলিকপ্টারের সাহায্যে পুকুরের মধ্যে ঠাণ্ডা জল ঢালতে হয়। এখান থেকে কত পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিয়েছে, তার হিসাব নেওয়ার কাজ এখনও চলছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ২০০,০০০ স্থানীয় বাসিন্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এগুলি হল কয়েকটি বড় দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত। এছাড়া আরও অসংখ্য ছোট দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই যথেষ্ট বিপজ্জনক হতে পারত। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর বিধ্বংসী কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে পরমাণু কেন্দ্রগুলিকে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের হাত থেকেও বাঁচানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টির গুরুত্ব এইসব ঘটনা থেকেই স্পষ্ট। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় পরমাণু শিল্পে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু শক্তি-উৎপাদনের এই উৎসে যাতে বিনিয়োগ না কমে সে কারণে পরমাণু কেন্দ্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের উর্ধ্বসীমা বেধে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য, সবসময়েই উর্ধ্বসীমার পরেও সরকারি আনুকূল্য আসতেই পারে।

এবার হল বোমা তৈরির সমস্যা। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ৪০০টি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। এরসঙ্গে যুক্ত আছে আরও বিভিন্ন প্রকল্প। যেমন, জ্বালানি তৈরি, ভারি জল উৎপাদন এবং পুণঃপ্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প। এরমধ্যে অনেকগুলিই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির (আই এ ই এ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। বাকিগুলি সরকার বা চালনাকারী সংস্থার এক্তিয়ারে। পারমাণবিক পদার্থ বা প্রযুক্তি যাতে অবাঞ্ছিত হাতে না যায়, তা দেখা যথেষ্ট কঠিন কাজ। ইউরোপ, রাশিয়া এবং জাপানের পুণঃ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে প্রায় ২০০ টনেরও বেশি প্লুটোনিয়াম জমা করে রাখা আছে। এটি যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। ভবিষ্যতে আরও নতুন পরমাণুকেন্দ্র গড়ে উঠলে তা পারমাণবিক নিরাপত্তাকে চাপে ফেলবে। তেজস্ক্রিয়তার উপস্থিতিই পরমাণু-পদার্থের চুরির পথে সব থেকে বড় বাধা; সুন্দরবনের হরিণ যেমন বাঘের

পাহারায় থাকে। কিন্তু ব্যবহৃত জ্বালানির পুণঃ প্রক্রিয়াকরণের ফলে যখন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে প্লুটোনিয়ামকে পৃথক করে ফেলা হয়, তখন তা রক্ষাকবচের বাইরে চলে আসে। এই কারণেই জ্বালানির পুণর্ব্যবহারের থেকে একবার ব্যবহারের প্রকল্পই বেশি বাঞ্ছিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে কোনো বেসরকারি সংস্থাকে পুণঃ প্রক্রিয়াকরণে সম্মতি দেয়নি।

তৃতীয় সমস্যা হল বর্জ্যপদার্থের ব্যবস্থা। পারমাণবিক বর্জ্য তিন প্রকারের—নিম্নস্তর, অন্তর্বর্তী স্তর এবং উচ্চস্তরের বর্জ্য। যন্ত্রচালকদের জামাকাপড়, কাগজের রুমাল, পরমাণু চুল্লির ভবনে পড়ে থাকা জঞ্জাল বা পচনশীল পদার্থ—এইসব হল নিম্নস্তরের বর্জ্য। এগুলিকে ভূগর্ভস্থ ইস্পাতের সিন্দুকে রেখে দেওয়া যায়। জারকোনিয়ামের পিন এবং চুল্লির অন্যান্য অংশ হল অন্তর্বর্তী স্তরের বর্জ্য। এগুলি নিম্নমানের বর্জ্যের থেকে বেশি তেজস্ক্রিয়। এগুলি সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে ইস্পাতের কক্ষে মাটির নিচে রাখা হয়। খরচ হয়ে যাওয়া জ্বালানি হল উচ্চস্তরের বর্জ্য। কারণ এর মধ্যে থাকে বিভাজনজাত পদার্থ এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ। যখন চুল্লি থেকে বার করা হয় তখন এগুলি খুবই তপ্ত থাকে। আরও বিভাজন রোধ করতে এদের সঙ্গে বোরন মেশানো হয়, কারণ বোরন হল নিউট্রন শোষক। এবার এই বর্জ্যকে পেটিতে ভরে পুকুরের মধ্যে রাখা হয় ঠাণ্ডা করার জন্য। ১৫ থেকে ২০ মাস ধরে ঠাণ্ডা হওয়ার পর এই বর্জ্যকে অন্তর্বর্তী মজুতের জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়। এগুলি এই অবস্থায় থাকার কথা ৫০ থেকে ১০০ বছর যাতে অধিকাংশ তেজস্ক্রিয়তাই বিনষ্ট হয়। দীর্ঘ এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে এগুলিকে শেষপর্যন্ত বাক্স-বন্দি করা হবে, যাতে পরবর্তী কয়েক হাজার বছর ধরে তা মানুষের নাগালের বাইরে এবং নিরাপদ স্থানে থাকে।

পরমাণু শক্তির বাণিজ্যিক উৎপাদনের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু আজও কোনও দেশই উচ্চস্তরের বর্জ্যকে যথাযথভাবে স্থানান্তরিত করেনি। ব্রিটেন ১৯৫৬ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বর্জ্য নিষ্কাশন নীতি নির্ধারিত হয়নি, তাই নিয়ে আলাপ আলোচনাই চলছে। উচ্চস্তরের বর্জ্যকে মাটির কয়েকশো মিটার গভীরে জমিয়ে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে য়ুকা পর্বতকে এই কাজে লাগাবার কথা ভাবছে। পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করা হলেও আজ পর্যন্ত কোনও জায়গায় তা কার্যকর হয়নি। ১৯৯৮ সালের মধ্যে য়ুকার মজুত ভাণ্ডারের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা এখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উচ্চস্তরের বর্জ্যের জন্য যে ভূগর্ভস্থ আধার নির্মাণ করা হবে, সেখানে একটি সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন। তা হল, তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস যাতে ভূগর্ভস্থ জলে মিশে না যায়। এই পরিস্থিতি এড়াতে পরমাণু কেন্দ্রের নিচে বহু কিলোমিটার গভীরে

অথবা সমুদ্রের ভিতর অবস্থিত আধারে উচ্চস্তরের বর্জ্য মজুত রাখার কথা ভাবা হয়েছে। এছাড়াও এই বর্জ্য পদার্থকে বিভিন্ন মৌলে ভাগ করে পৃথকভাবে মজুত রাখার প্রস্তাবও করা হয়েছে। বিপজ্জনক মৌলগুলিকে দ্রুত-চুল্লিতে পুড়িয়ে তাদের রূপান্তর ঘটাবার পরিকল্পনাও রয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহার হয়নি। আবার এই ধরনের পৃথকিকরণের ফলে বোমা বানানোর আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে।

একটি পরমাণু চুল্লির কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে তাকে নিষ্ক্রিয় করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য দরকার সব যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত করে নিরাপদে রাখা, বাড়িটি ভেঙে ফেলা এবং মাটির বিষক্রিয়া দূর করা। এই নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ। এতে একশো বছরও লাগতে পারে। তাছাড়া এটি ব্যয়সাপেক্ষও বটে। ব্রিটেনে এইরকম ২০টি কেন্দ্র আছে যেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার খরচ হবে আনুমানিক ৫০০০ থেকে ৭০০০ কোটি পাউন্ড।

মেয়াদ-ফুরানো পরমাণু-চুল্লি এবং উচ্চস্তরের বর্জ্য নিষ্ক্রিয় করার খরচ না ধরলেও পরমাণু শক্তির দাম যথেষ্ট বেশি। বেশি দামের প্রথম কারণ হল চুল্লি নির্মাণের খরচ। পরমাণু চুল্লি বানানোর খরচ বেশি কারণ তা বানাতে হলে উচ্চ তাপ ও চরম পরিস্থিতি সহ্য করার মতো পদার্থ ব্যবহার করতে হয়। যেমন পুরু ইস্পাত ও জারকোনিয়াম। খরচ শুধু বেশিই নয়, তা অত্যন্ত অনিশ্চিতও। পরমাণু চুল্লি কারখানায় তৈরি করা যায় না। চুল্লির একটা বড় অংশই তৈরি করতে হয় প্রকল্পের জায়গাতেই। ফলে খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এছাড়াও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের আরোপিত শর্ত ঘন ঘন বদলায়, ফলে নির্মাণের সময় এবং খরচ দুটিই বাড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫টি পরমাণুকেন্দ্রের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, এগুলির প্রস্তাবিত খরচ ছিল ৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেগেছে ১৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। ব্রিটেনের সাম্প্রতিকতম পরমাণু কেন্দ্র সাইজওয়েল বি চালু হয় ১৯৯৫ সালে, খরচ হয়েছিল ৩০০ কোটি পাউন্ড। হিসাবমাফিক দাম ধরা হয়েছিল প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ৩ পেনস। কিন্তু কার্যকালে তা বেড়ে হয় ৬ পেনস। চুল্লির খরচ বেড়ে যাওয়াতেই এই দাম বাড়ে। ভারতীয় চুল্লিগুলির ক্ষেত্রেও এই খরচ বেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

নয়ের দশকে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিক্ষেত্রে যখন সংস্কার হয়, তখন উচ্চ উৎপাদন খরচ সম্পন্ন পরমাণু চুল্লিগুলি সমস্যায় পড়ে। ব্রিটিশ সরকার পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতির পুণর্বিন্যাস করে এবং এই খাতে সমস্ত লোকসান সামলে নেয়। ১৯৯৬ সালে ৮টি পরমাণু চুল্লি সহ ব্রিটিশ এনার্জি সংস্থা গঠিত হলেও তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ২০০২ সালে এটি দেউলিয়া হয়ে যায়। সেই বছরেই নতুন পরমাণু কেন্দ্রকে উৎসাহ দিতে এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে মার্কিন সরকার। উদ্দেশ্য ছিল, ২০১০ সালের মধ্যে নতুন কতকগুলি চুল্লি বসানো। এই প্রকল্পে সার্বিক সমর্থনের

আশ্বাস দেয় মার্কিন সরকার। ২০০৫ সালের এনার্জি পলিসি অ্যাক্ট-এ এই ব্যবস্থাগুলিকে আইনি রূপ দেওয়া হয়। এত বেশি সুবিধা সত্ত্বেও একটিও নতুন পরমাণু চুল্লি গড়ে ওঠেনি। এমনকি শেয়ারের দাম পড়ে যাবে, এই আশঙ্কায় বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি নতুন কোনো চুল্লির জন্য আবেদনও করতে চায়নি।

২০০৩ সালে পরমাণু শক্তি সম্পর্কে এক সুচিন্তিত এবং বিস্তারিত গবেষণাপত্র প্রকাশ করে এম আই টি। এই গবেষণায় পরমাণু শক্তির সঙ্গে অন্যান্য উৎসজাত শক্তির আজীবন খরচের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক মেগাওয়াটের উৎপাদনকেন্দ্রের খরচ ২০০ কোটি ডলার ধরে নিয়ে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ ধরা হয়েছে ৬.৭ সেন্ট। কয়লাজাত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই খরচ ৪.২ সেন্ট প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা। গ্যাসজাত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে, গ্যাসের দাম অনুযায়ী এই খরচ ৩.৮ থেকে ৫.৬ সেন্ট। এর থেকে এম আই টি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসে যে পরমাণু শক্তি বর্তমানে কোনও প্রতিযোগিতাতেই দাঁড়াতে পারে না। পরমাণু শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, নির্মাণের সময় এবং চালানোর খরচ কমাতে পারলেই তা কয়লা বা গ্যাস প্রকল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্রিটেনেও পরমাণু বিদ্যুতের দাম কয়লা বা গ্যাস জাত বিদ্যুতের থেকে বেশি। একমাত্র ফ্রান্সেই এই দাম কম। ভারতের কাইগায় অবস্থিত পরমাণু কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের সঙ্গে নিকটবর্তী রায়চুরের কয়লাজাত প্রকল্পের থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের খরচের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে রায়চুরের উৎপাদন কেন্দ্র কয়লাখনি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এখান থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের দাম কম। তবে পরমাণু বিজ্ঞানীরা এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে খরচের হিসাব স্বচ্ছ। কিন্তু ফ্রান্স বা ভারতে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। সেক্ষেত্রে লুকোনো ভর্তুকির ফলে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

৯.৫ পুনরুজ্জীবন? ●

আমরা দেখেছি, গত শতাব্দীর আটের দশক পর্যন্ত পশ্চিমী দুনিয়ায় পরমাণু শক্তি যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। তারপরেই তার অবনতির সূচনা। ১৯৭৮ সালের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও নতুন পরমাণু চুল্লি গড়ে ওঠেনি। পরমাণু চুল্লির জন্য কোনও জায়গা বাছা হলেই সেখানকার অধিবাসীরা প্রতিবাদ করেছেন। কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে ইউরোপেও একই ঘটনা ঘটেছে। তবে বর্তমানে দুটি পরমাণু চুল্লি এখানে নির্মীয়মাণ।

একটি ফ্রান্সে ও অপরটি ফিনল্যান্ডে। গত এক দশক ধরে অবশ্য পরমাণু শক্তির পুনরুজ্জীবন নিয়ে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হয়েছে। ধরে নেওয়া যায় যে বেশি খরচ এবং চেরনোবিল বা থ্রি মাইল আইল্যান্ডের মতো বিধ্বংসী দুর্ঘটনার ফলেই পরমাণু শক্তি শিল্প সঙ্কটে পড়েছে। তাহলে তার পুনরুজ্জীবন তখনই সম্ভব, যখন তার খরচ লগ্নিকারীদের পক্ষে স্বস্তির হবে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় অধিবাসীরা নিরাপত্তার আশ্বাস পাবে। এর মধ্যে যে কোনও একটি হলেই তা হবে যথেষ্ট উচ্ছ্বাসের কারণ—কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, এমন কিছুই ঘটেনি আর তাই পুনরুজ্জীবন মোটের উপর মরীচিকাই থেকে গেছে।

ঘটনা হল, ২০০০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে গ্যাসের প্রবল মূল্যবৃদ্ধির ফলে পুরানো পরমাণু চুল্লি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের দাম তুলনায় কমে। এতে পুরানো উৎপাদনকেন্দ্রগুলির ক্ষমতা ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যায়। সেইসঙ্গে উন্নত হয় তাদের আয় ব্যয়ের হিসাবও। দ্বিতীয়ত কারবন-ডাই-অক্সাইডের নির্গমণ বন্ধের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইউরোপিয় দেশগুলি তাদের পরমাণু কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় করার কর্মসূচী স্থগিত রাখে। এই সবই ফুকুশিমা দুর্ঘটনার আগেকার কথা। বর্তমানে যা মনে হচ্ছে, তাতে পরমাণুকেন্দ্র নিষ্ক্রিয় করার কাজ সময়মতোই হবে। এমনকি জার্মানি এবং ইতালিতে এই কাজ হবে নির্ধারিত সময়ের আগেই। ফ্রান্সের বিদ্যুৎ চাহিদার ৮০ শতাংশই পরমাণু শক্তির উপর নির্ভরশীল। ফ্রান্সকে তাই যেন তেন প্রকারেণ এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুধু বাঁচিয়ে রাখাই নয়, নতুন পরমাণু চুল্লিও তৈরি করতে হবে। ফ্রান্সের পক্ষে তা সম্ভব কেননা তাদের পরমাণু শিল্প রয়েছে রাষ্ট্রের হাতে। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো নানারকম সুযোগ সুবিধার কথা ঘোষণা করে অপেক্ষা করতে হলে ফ্রান্সেও কতটা উন্নয়ন হত সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। এই ফ্রান্সও এখন পরমাণুশক্তির অনুপাত কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

পরমাণু শক্তিশিল্পের সম্ভাবনার দিকটি এম আই টির গবেষণাপত্রে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই রিপোর্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিরাপত্তা, সংখ্যাবৃদ্ধি, বর্জ্য নিষ্কাশন এবং ব্যয়সাপেক্ষতা—এই চারটি সমস্যার কোনওটিরই সমাধান করতে পারেনি পরমাণু শিল্প। অতএব, এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের আগে এইসব সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজে বার করতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে জরুরি হল বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমানো। আর তা করতে হলে প্রকল্পের খরচ, নির্মাণের সময়, মূলধনের খরচ এবং পরিচালন ব্যয় —সবই কমাতে হবে। এরজন্য চাই ধারাবাহিক এবং ব্যয়সাপেক্ষ এক প্রয়াস। উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হলে তবেই কোনো শিল্প এই প্রয়াস গ্রহণ করতে পারে। এইখানেই স্ববিরোধ–উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য চাই একনিষ্ঠ প্রয়াস; আবার একনিষ্ঠ প্রয়াসের জন্য চাই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি। এখন বিশ্বের সবথেকে বেশি

প্রয়োজন কম কারবন নির্গমণকারী শক্তি। আর তা পাওয়া যেতে পারে চারটি সূত্র থেকে—শক্তি সাশ্রয়, নবীকরণীয় শক্তির ব্যবহার, কারবন আটক ও বন্দি এবং পরমাণু শক্তি। এম আই টির রিপোর্ট বলছে, পরমাণু শক্তির উৎসকে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। সমস্যা সমাধানের সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত এই শিল্পের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু, তা সম্ভব হবে কী উপায়ে?

৯.৬ ভারতের ত্রিপর্যায় কর্মসূচী ●

পরমাণু শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের নীতি নির্ধারিত হয় পাঁচের দশকে। এই নীতির রূপকার ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গির ভাবা এবং তা অনুমোদিত হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হাতে। এখানে ত্রিপর্যায়ের এক কর্মসূচীর রূপরেখা তৈরি হয়। প্রথম পর্যায়ে আমাদের সীমিত ইউরেনিয়ামের মজুতকে তাপ চুল্লিতে দিয়ে তার থেকে যত বেশি সম্ভব বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলা হয়। এই উৎপাদনের সময় চুল্লিগুলিতে প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্লুটোনিয়ামকে দ্রুত-চুল্লিতে দিয়ে বিদ্যুৎ এবং আরও বেশি প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন করা হবে। সেই সঙ্গে দ্রুতচুল্লিগুলিকে থোরিয়াম থেকে U 233 উৎপাদনের কাজেও লাগানো হবে। তৃতীয় পর্যায়ে U 233 থেকে আরও বেশি বিদ্যুৎ এবং থোরিয়াম থেকে আরও বেশি U 233 উৎপন্ন করা যাবে। এইভাবে আমাদের দেশের থোরিয়ামের সমৃদ্ধ মজুতভাণ্ডার থেকে কার্যত অপরিসীম বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখেন হোমি ভাবা।

প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয় ১৯৬৯ সালে যখন তারাপুরে ১৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি বি ডবলিউ আর বা ফুটন্ত জল-চুল্লি চালু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টিং হাউজ-এর সহায়তায় এই দুটি চুল্লি গড়ে ওঠে। কানাডার সহায়তায় রাজস্থানে দুটি পি এইচ ডবলিউ আর তৈরি হয়। এই দুটির মোট ক্ষমতা ৩০০ মেগাওয়াট। এরপর আমরা নিজেদের উদ্যোগেই মোট ১৬টি পি এইচ ডবলিউ আর তৈরি করি, যার মধ্যে তারাপুরের ৫৪০ মেগাওয়াটের দুটি প্রকল্পও আছে। কুডমকুলমে রাশিয়ার সহায়তায় দুটি ১০০০ মেগাওয়াটের ভি ভি ই আর প্রকল্প গড়ে উঠছে। ৭০০ মেগাওয়াটের চারটি পি এইচ ডবলিউ আর-এর কাজ সবে শুরু হয়েছে। ১৯৬২ সালে হিসাব করা হয়েছিল যে ১৯৮৭ সালের মধ্যে আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২০,০০০ মেগাওয়াট। ১৯৭৫ সালে তা সংশোধন করে হিসাব হয়, ২০০০ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৪৩, ৫০০ মেগাওয়াট। ২০১২ সালে আমাদের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ৪৭৮০ মেগাওয়াট—যা অতীতের এইসব হিসাবের ধারে কাছেও নেই।

ভারতে ইউরেনিয়ামের প্রমাণিত মজুত হল ৯০,০০০ টন। ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পি এইচ ডবলিউ আর প্রকল্পে বাৎসরিক ইউরেনিয়াম খরচ হয় ১৫০ টন। সুতরাং ৪০ বছর ধরে বছরে ১৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম আমাদের কাছে আছে। তবে আমাদের ইউরেনিয়ামের উৎপাদন কম। এর কারণ হল, স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিবাদের ফলে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মেঘালয়ে নতুন খনি তৈরি করা যায় নি। এর ফলে, আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি তাদের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেনি।

ক্ষমতার ৮০ শতাংশ সদ্ব্যবহারকারী ১০০০ মেগাওয়াটের একটি পি এইচ ডবলিউ আর প্রকল্প বছরে ৫০০ কিলো প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন করে। ৪০ বছর ১৫০০০ মেগাওয়াটের উৎপাদন ক্ষমতা থেকে আমাদের ৩০০ টন প্লুটোনিয়াম পাওয়া উচিত, যা দিয়ে দ্রুত-চুল্লির মাধ্যমে ৪০,০০০ মেগাওয়াট বা ৪০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এই চুল্লিগুলি নিজেদের চলার মতো যথেষ্ট প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন করার পরেও এইরকম আরও চুল্লিতে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে। ১৯৭৫ সালের হিসাবে ২০০০ সালের মধ্যে প্রস্তাবিত উৎপাদনের মাত্রা ধরা হয়েছিল ৪৩,৫০০ মেগাওয়াট। প্রথম পর্যায়ের ১৫,০০০ মেগাওয়াট বাদ দিয়ে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চুল্লি থেকে পাবার কথা ২৮,৫০০ মেগাওয়াট। কিন্তু এপর্যন্ত আমরা মাত্র ৩০ মেগাওয়াটের একটি দ্রুতচুল্লি পেয়েছি, যা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭৬ সালে চালু হওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে চালু হয় ১৯৮৫ সালে। এছাড়া ৫০০ মেগাওয়াটের একটি প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর (পি এফ বি আর) বর্তমানে নির্মিয়মান।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রথম পর্যায়ের থেকে কোনও অংশে কম সম্ভাবনাময় ছিল না। ২০২০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াটের চারটি এফ বি আর তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল। প্রথম পর্যায়ের বিলম্বের ফলে প্লুটোনিয়াম সরবরাহ কমে গেছে। তা সত্ত্বেও একটি প্রোটোটাইপ ব্রিডার এবং এই চারটি চুল্লির জন্য যথেষ্ট প্লুটোনিয়াম থাকা উচিত। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২০ সালের পর যেসব এফ বি আর তৈরি হবে, সেগুলি আগের মতো প্লুটোনিয়ামের অক্সাইডের পরিবর্তে তার ধাতব জ্বালানি ব্যবহার করবে। এতে উৎপাদনের মাত্রা বাড়বে দ্রুত। ২০২০ সালের মধ্যে স্থাপিত ২০০০ মেগাওয়াটের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে ২০৫০ সালে ৫০০,০০০ মেগাওয়াটে পৌঁছনোর কথা। তবে, যেসব বিজ্ঞানীরা এই হিসাব করেছেন, তারা এর ভিত্তি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছুই জানান নি। ফলে অনেক বিশেষজ্ঞই এই হিসাব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। আর সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া দুরকম। হয় তাঁরা এই অত্যাশ্চর্য হিসাবে অত্যন্ত স্বস্তিবোধ করেছেন, অথবা অভ্যাসবশত এব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থেকেছেন।

আগেই বলা হয়েছে, কেরল এবং ওড়িশা মিলিয়ে মোট প্রায় এক কোটি টন মোনাজাইট বালি আছে, যেখানে থোরিয়াম ছাড়াও আরও অনেক দুষ্প্রাপ্য মৌল পাওয়া যায়। ভারতীয় মোনাজাইটে ৮ থেকে ১০ শতাংশ থোরিয়াম থাকে এবং বিশ্বের থোরিয়াম মজুতের ৩০ শতাংশেরও বেশি পাওয়া যায় ভারতে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তাবিত দ্রুত চুল্লিগুলি অবশ্যই প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করবে। এছাড়াও থোরিয়ামকে U 233-তে রূপান্তরের কাজেও তাদের ব্যবহার করা হবে। চুল্লির জ্বালানি কেন্দ্রের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে U 233 উৎপন্ন হলেই তৃতীয় পর্যায়ের কর্মসূচীর সূচনা হতে পারে। এখানে জ্বালানিকেন্দ্রে থাকবে U 233 এবং বাইরের আবরণে থোরিয়াম। এই চুল্লিগুলি U 233 উৎপন্ন করবে, ঠিক যেমন দ্বিতীয় পর্যায়ের চুল্লিগুলির Pu 239 উৎপন্ন করার কথা। তবে তৃতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে এই উৎপাদনের মাত্রা কমে যাবে, ফলে উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির হারও পড়বে।

তৃতীয় পর্যায়ের কাজ এখনও পরীক্ষামূলক স্তরেই রয়েছে। আমরা থোরিয়াম অক্সাইডের 'পিন' তৈরি করে আমাদের চুল্লিতে ব্যবহার করেছি। এছাড়াও একটি দ্রুত চুল্লিতে ব্যবহৃত হয়েছে এই 'পিন'। বিভাজন প্রবণ U 233 সম্বলিত এই থোরিয়াম 'কামিনী' নামে এক ছোট পরীক্ষামূলক চুল্লির জ্বালানির কাজ করছে। এই 'কামিনী' হল বিশ্বের এক অনন্য চুল্লি। একটি উন্নতমানের ভারি-জল-চুল্লি বা অ্যাডভান্সড হেভি ওয়াটার রি অ্যাক্টর-এর (এ এইচ ডবলিউ আর) নকশা তৈরি করা হচ্ছে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী এটি থোরিয়াম এবং U 233-এর সম্মিলিত ব্যবহারে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে।

আমাদের ত্রিপর্যায় পরমাণু শক্তি কর্মসূচীর সুচিন্তিত দিকটি ছিল এই যে, এটি আমাদের ইউরেনিয়াম-থোরিয়ামের মজুত ভাণ্ডারের কথা মাথায় রেখেই ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এর মূল ত্রুটি হল, এখানে এমন প্রযুক্তির কথা ভাবা হয়েছিল, যার তখনও পর্যন্ত কোনো অস্তিত্বই ছিল না, এমন কি আজও যার রূপরেখা স্পষ্ট নয়। এর বদলে আমরা যদি ভাবতাম সমুদ্রের জল ছেঁকে ইউরেনিয়াম বার করব কিংবা সংযোজন বা ফিউসন থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করব তাহলে তা হত একইরকম অলীক। এই দুইয়ের পরিবর্তে ত্রিপর্যায়ের এই পরমাণু শক্তি কর্মসূচীর কথা ভাবার অন্যতম কারণই হল, আমরা পরমাণু বোমা বানাতে চেয়েছিলাম।

আমরা যদিও 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'-এর নীতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছিলাম, কিন্তু এ ব্যাপারে অন্যরা কতটা আস্থাশীল তা আমরা নিজেরাই জানতাম না। তাই পরমাণু অস্ত্রের আক্রমণকে প্রতিহত করার কাজে আমরা প্রথম থেকেই

মনোযোগী হতে চেয়েছি। এই প্রয়াসকে গোপন রাখা ছিল জরুরি, কেননা তা নাহলে পরমাণু প্রযুক্তির আমদানি বন্ধ হয়ে যেত। তাই, অস্ত্র নির্মাণ কর্মসূচীর ঢাল হিসেবে আমাদের একটি জনহিতকর প্রকল্পের প্রয়োজন ছিলই। অন্যান্য দেশের মতো আমরা হালকা বা সাধারণ জল-চুল্লির দিকে মনোনিবেশ না করে CANDU নকশাকেই বেছে নিই। এই ধরনের চুল্লিতে অনেক বেশি প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয়, যা বোমা বানানোর জন্য দরকার। প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম আমদানি না করে আমরা পুণঃ প্রক্রিয়াকরণের পথ বেছে নিই, যাতে আরও বেশি প্লুটোনিয়াম উদ্ধার করা যায়।

ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম-এই দুটির যেকোনও একটি ব্যবহার করেই পরমাণু বোমা বানানো যায়। অস্ত্রে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এতে অন্তত ৯৩ শতাংশ U 235 থাকে। এই সমৃদ্ধিকরণের প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং দুর্লভ। ভারতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম খুব কমই উৎপন্ন হয়। এই ইউরেনিয়াম সম্ভবত নিউক্লিয়ার সাবমেরিন এর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বোমায় ব্যবহৃত প্লুটোনিয়ামকেও একইরকম সমৃদ্ধ করতে হয়, যেখানে ৯০ শতাংশেরও বেশি Pu 239 থাকে। তবে সমৃদ্ধ প্লুটোনিয়াম বানানো অনেক সহজ। আমরা দেখেছি, তাপ চুল্লিতে U 238 একটি নিউট্রন শোষণ করলেই প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয়। এতে শুধু Pu 239 ই নয়, Pu 240, Pu 241 এবং Pu 242 ও উৎপন্ন হয়। সাধারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে জ্বালানি পুড়িয়ে তার থেকে প্রত্যাশিত উৎপাদন হওয়া পর্যন্ত সেটি চুল্লিতেই রাখা হয়। যেমন আমাদের পি এইচ ডবলিউ আর-এ জ্বালানি থাকে আট মাস। এইসময় কিছুটা Pu 239-এ বিভাজন হয় এবং চুল্লির খরচ হয়ে যাওয়া জ্বালানিতে Pu 239-এর অনুপাত কমে হয় মোট প্লুটোনিয়ামের প্রায় ৬০ শতাংশ। চুল্লির ব্যবহৃত জ্বালানি থেকে প্রাপ্ত প্লুটোনিয়ামকে বলা হয় 'রিঅ্যাক্টর গ্রেড প্লুটোনিয়াম' (আর জি পি ইউ), অর্থাৎ চুল্লির মানের প্লুটোনিয়াম।

কিছু চুল্লিকে অস্ত্র বানাবার উপযোগী প্লুটোনিয়াম বা ওয়েপনস গ্রেড প্লুটোনিয়াম (ডবলিউ জি পি ইউ) উৎপন্ন করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। এখানে শক্তি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার না দিয়ে জ্বালানিকে তাড়াতাড়ি বার করে আনা হয়, যাতে Pu 239 বিভাজনের সময় না পায়। ভারতে এইরকম দুটি চুল্লি আছে। ১৯৭৪ এবং ১৯৯৮ সালের অস্ত্র পরীক্ষার সময় এখান থেকেই প্লুটোনিয়াম সরবরাহ করা হয়েছিল। হিসাব অনুযায়ী, আমাদের হাতে আরও ৬০০ কেজিরও বেশি প্লুটোনিয়াম অবশিষ্ট আছে এবং প্রতি বছর আরও ৩০ কেজি করে জমা হচ্ছে। একটি ২০ কিলোটন বোমার জন্য মাত্র ৫ থেকে ৬ কেজি প্লুটোনিয়াম লাগে। পি এফ বি আরের মতো পরিমাণবর্ধক চুল্লি থেকেও অবশ্য ওয়েপন্‌স গ্রেড প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করা যায়। ২০২০ সালের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন যে চারটি এফ বি আর চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলি থেকে প্রতিবছর আরও ৫০০ কেজি ওয়েপন্‌স গ্রেড প্লুটোনিয়াম পাওয়া যেতে

পারে। দরকার হলে রিঅ্যাক্টার গ্রেড প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করেও বোমা বানানো যায়। আমাদের যে কটি চুল্লি আই-এ-ই-এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে, তাদের থেকে প্রতি বছর ১২৫০ কেজি আর জি পি ইউ উৎপন্ন হতে পারে। পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতাকে যদি সেই অনুপাতে বাড়ানো যায় তাহলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমরা একটা করে পরমাণু বোমা বানাতে পারি।

খরচ, নিরাপত্তা অথবা বর্জ্য নিষ্কাশনের সমস্যাগুলির কীভাবে সমাধান করেছে ভারতীয় পরমাণু কর্মসূচী? ভারতের নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন আর অস্ত্র কর্মসূচীকে ভিন্ন করে দেখার উপায় নেই। খরচের কোন অংশ অস্ত্র কর্মসূচীর উপর চাপানো হয়েছে আর কোনটি বিদ্যুতের দামে, তা জানা কঠিন। প্রাকৃতিক গ্যাস বা এল এন জির দামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারলেও কয়লাজাত বিদ্যুতের তুলনায় পরমাণু শক্তির দাম অনেকটাই বেশি। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী আরও ব্যয়সাপেক্ষ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। পরিমাণবর্ধক চুল্লি বানাবার খরচ বেশি, এছাড়া পুণঃ প্রক্রিয়াকরণের খরচ যোগ করা হয় বলে জ্বালানির মূল্যও অধিক। থোরিয়াম ব্যবহারকারী তৃতীয় পর্যায়ের চুল্লির থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের দামও বেশিই হবে।

ভারতের পরমাণু শিল্পের ৪০ বছরে বেশ কয়েকটি বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। তা সত্ত্বেও, ১০০টিরও বেশি দুর্ঘটনা হয়েছে। একটি ক্ষেত্রে প্রকল্পের কর্মীরা বিপজ্জনক মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি আমাদের পরমাণু কর্মসূচীর আরও ভয়াবহ পর্বে প্রবেশ করতে চলেছি? আমাদের দ্রুত-চুল্লিগুলি শীতলক হিসাবে গলিত সোডিয়াম ব্যবহার করবে। সুতরাং তাদের আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে। গলিত সোডিয়াম কোনওভাবে বাইরে বেরিয়ে গেলেই এটি সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে গিয়ে বাতাসে তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে থাকবে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সাল নাগাদ কার্যকর প্রায় সব দ্রুত চুল্লিতেই এই সমস্যা হয়েছে। একই দুর্ঘটনার সাম্প্রতিক শিকার জাপানের মোনজু পরমাণু কেন্দ্র।

আমরা যদি আমদানি করা চুল্লির সাহায্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ভাবি তাহলে কী হয়? বর্তমান সুরক্ষার মাত্রা বজায় রাখতে হলে এই চুল্লিগুলিকে আজকের চুল্লির দশগুণ বেশি নিরাপদ হতে হবে। তৃতীয় প্রজন্মের যেসব চুল্লি আমাদের আমদানি করতে হতে পারে, সেগুলি এখনও পর্যন্ত কোথাও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। সুতরাং এর কার্যকারিতার কোনও বিবরণ নেই। চতুর্থ প্রজন্মের চুল্লির নকশা এখন তৈরি হচ্ছে। এগুলি সুরক্ষার দিক থেকে যথাযথ হলেও ২০৩০ সালের আগে পাওয়া যাবে না। দুঃখের বিষয় হল, ভারত এমন একটা সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করল, যখন এই শিল্প প্রায় ৩০ বছর ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। পরমাণু চুক্তির সঠিক

সময়ের উপর ভারতের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না, কিন্তু পরমাণু চুল্লির আমদানির ক্ষেত্রে ‘ধীরে চলো’ নীতি নেওয়া এখনও সম্ভব। তাতে লাভ হবে এই যে, ভবিষ্যতের উন্নতমানের ও নিরাপদ চুল্লি পাওয়ার সুযোগ থেকে যাবে।

পরমাণু চুল্লির সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে সতর্ক হওয়ার বার্তা দিয়েছে ফুকুশিমার দুর্ঘটনা। আমাদের সবকটি পরমাণু চুল্লির সুরক্ষা ব্যবস্থার পুণর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। আরও বড় কথা হল, সুরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সংস্থা ‘এ ই আর বি’ কে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। অস্ত্র কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের অধীনস্থ ছিল ‘এ ই আর বি’। পণ্ডিত নেহরুও একথা স্বীকার করেছিলেন যে পারমাণবিক ক্ষেত্রে জনমুখী এবং অস্ত্র কর্মসূচীর মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া ভার। তবে, ভারত-মার্কিন চুক্তি এই দুটিকে পৃথক করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এছাড়া, এখন আর গোপন করার মতো প্রায় কিছুই নেই। অজানা আছে কেবল একটিই বিষয়—আমাদের বোমাগুলি কোথায় রাখা আছে? নারোরা বা রাওয়াতভাটার আশেপাশে গভীর তল্লাশি চালিয়েও এ ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানা যাবে না। তাই আমরা এখন আমাদের পরমাণু শক্তি প্রকল্পের জন্য একটি স্বাধীন এবং বৃহত্তর নিয়ন্ত্রকের কথা ভাবতে পারি। একই সঙ্গে আশা করতে পারি যে জাইতাপুরের মতো জনপ্রতিবাদের ঘটনা আমাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন কানুনকে আরও শক্তিশালী করবে।

পারমাণবিক সম্পদ চুরি এবং তার অপব্যবহার রুখতে ভারত যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা যেমন নিশ্ছিদ্র, তেমনই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতও। তবে আমাদের পৃথক করে রাখা প্লুটোনিয়ামের মজুত বাড়ছে এবং সম্ভবত ইতিমধ্যেই তা যথেষ্ট বেশি। এর থেকে চুরির আশঙ্কা থেকেই যায়। অন্যান্য দেশের মতো উচ্চস্তরের বর্জ্য পাকাপাকিভাবে নিষ্কাশণের ব্যাপারে ভারতেরও কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। ব্যবহার করা জ্বালানি এখন উৎপাদন কেন্দ্র বা পুণঃপ্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের কাছে অন্তর্বর্তী মজুত হিসেবেই থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে থোরিয়াম-চুল্লির সংখ্যা বাড়লে চুরির সমস্যা আরও দক্ষভাবে মোকাবিলা করা যাবে। সেক্ষেত্রে খরচ হয়ে যাওয়া জ্বালানিতে শক্তিশালী গামা এমিটর থাকবে। সুতরাং যেকারও পক্ষে এটিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এই বর্জ্যের তেজষ্ক্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। থোরিয়াম চুল্লি থেকে উচ্চস্তরের বর্জ্য নিষ্কাশণের কাজ আরও সহজ হবে।

এইসব ক্ষেত্রে ভাল কাজ করলেও উৎপাদনের মাত্রাবৃদ্ধি বা লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় পরমাণু শক্তি প্রকল্প বারবার বিফল হয়েছে। মোট ২ লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে পরমাণু শক্তির অবদান মাত্র ৫০০০ মেগাওয়াট। কোনও সময়েই একে বড়সড় অবদানের যোগ্য বলে মনে হয়নি। তাই ২০০৫ সালে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র যখন পরমাণু চুক্তির প্রস্তাব দেয়, তখন ভারতের পক্ষে সে বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। একদিকে ছিল ২০০,০০০ মেগাওয়াটের প্লুটোনিয়াম বিদ্যুতের আশ্বাস, অন্যদিকে ছিল ইউরেনিয়াম আমদানির সম্ভাবনা। সরকার বুঝতেই পেরেছিল যে, পরমাণু কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায় আসলে কল্পবিজ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। এর বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভব। সুতরাং এম আই টির পূর্ব-উল্লেখিত রিপোর্টে যে প্রশ্ন উঠে এসেছিল, তার সমাধান সম্ভব হল ভারত-মার্কিন চুক্তিতে। ভারত এবং অন্য অনুন্নত দেশে নিয়ন্ত্রকের শাষণ অতটা কড়া নয় আর জনমতের জোরও কম। এই দেশগুলিই আপাততঃ বাঁচিয়ে রাখুক এই শিল্পকে। পরে, চতুর্থ কি পঞ্চম জেনারেশনের নিরাপদ চুল্লি বাজারে এলে এই শিল্প আবার গ্রহণযোগ্য হবে উন্নত দেশগুলিতে। কন্ডোলিজা রাইসের কথায় এ ছিল এমনই এক সুযোগ, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে পারত না।

আমাদের ত্রিপর্যায় কর্মসূচীর ভবিষ্যত কী? যতদিন ইউরেনিয়াম সহজে আমদানি করা যাবে, ততদিন দ্রুতচুল্লির থেকে তাপ চুল্লিই হবে বেশি উপযোগী। তা সে চুল্লি দেশজই হোক বা আমদানি করা। এছাড়াও, আমাদের অস্ত্র-ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ হবে দ্রুত-চুল্লির প্রতি আমাদের আগ্রহ ততই যাবে কমে। প্রয়োজনে আমরা ফিসাইল মেটেরিয়াল কাট অফ ট্রিটিতে (এফ এম সি টি) স্বাক্ষরও করতে পারি। সেক্ষেত্রে ত্রিপর্যায় কর্মসূচীর নিঃশব্দ মৃত্যু ঘটবে। হয়তো হিমালয়ের গহনে কোনও ভূগর্ভস্থ কক্ষে তাকে সমাহিত করা হবে। যেমন হয়েছে নেহরু জমানার অন্যান্য বাতিল নীতির বেলায়। ■

দশম অধ্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস

১০.১ বিদ্যুৎ ●

আধুনিক কালের গৃহস্থালি বিদ্যুতের অভাবে প্রায় অচল। আমরা বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বালাই। পাখা, ফ্রিজ, এয়ার কণ্ডিশনার বা ওয়াশিং মেশিনও চলে বিদ্যুতে। এমনকি এখন রান্নবান্না অথবা ল্যাপটপ—সবের জন্যই চাই বিদ্যুৎ। ঘরের বাইরে, কলকারখানার মোটর, পাম্প, ক্রেন থেকে শুরু করে অন্যান্য যন্ত্রপাতিও বিদ্যুৎচালিত। ব্যবহার বা প্রয়োগ বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিদ্যুৎ এক কথায় অতুলনীয়। কয়েকশো কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সহজেই গৃহস্থের হাতের নাগালে পৌঁছতে বিদ্যুতের জুড়ি মেলা ভার। সরবরাহের সুবিধা এবং ব্যবহারিক পরিচ্ছন্নতার জন্যই বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতির নির্মাণ এবং প্রয়োগকে এত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বিদ্যুৎ প্রাথমিক শক্তির পর্যায়ে পড়ে না। অন্য কোনও শক্তির থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আর সেই কারণেই তাকে আনুষঙ্গিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস বলা যায়। স্কুলপাঠ্য পদার্থবিদ্যাই আমাদের শিখিয়েছে যে শক্তির কতগুলি মৌলিক রূপ আছে—যেমন তাপ, আলো, যন্ত্র, তড়িৎ, চৌম্বক, রাসায়নিক ও নিউক্লিয়ার বা পরমাণু শক্তি। এক ধরণের শক্তি অন্য একটিতে রূপান্তরিত হতে পারে। শক্তির অন্য কোনও রূপ থেকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরের উপরেই নির্ভর করে বিদ্যুতের বাণিজ্যিক উৎপাদন। কয়লায় মজুত আছে রাসায়নিক শক্তি, যা কয়লা পুড়লে তাপে পরিণত হয়। এই রাসায়নিক শক্তি আসে সূর্যের শক্তি থেকে। কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লাকে গুঁড়ো করে চুল্লিতে পুড়িয়ে উচ্চ তাপ এবং চাপে বাষ্প উৎপন্ন করা হয়। এই বাষ্পের সম্প্রসারণে টারবাইন ঘোরে। টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি জেনারেটর। এই জেনারেটরে থাকে একটি বৃহৎ চুম্বক ও চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে একটি তারের কুণ্ডলী। টারবাইনের সঙ্গে তারের কুণ্ডলীও ঘুরতে থাকে এবং তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণনের যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত হয় বৈদ্যুতিক শক্তিতে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা যে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সরবরাহ করা যায়, তা সর্বপ্রথম দেখিয়েছিলেন টমাস অ্যালভা এডিসন। ১৮৮২ সালে লন্ডন ও নিউইয়র্কে

দুটি জেনারেটর বসানো হয়। এর সাহায্যে কয়েকটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং বসতবাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছিল। এইসব বাড়ির জন্য এডিসন কারবন ফিলামেন্ট দিয়ে এক ধরনের বাল্‌ব তৈরি করেন। এই উৎপাদনকেন্দ্রগুলি ছিল ছোট, যার উৎপাদন ক্ষমতা আনুমানিক এক মেগাওয়াট। এখানে একমুখী প্রবাহ বা ডাইরেক্ট কারেন্ট (ডি সি) উৎপন্ন হয়। তারের ভিতরেই প্রচুর শক্তির অপচয় হওয়াতে এই বিদ্যুৎ বেশিদূর পরিবহন করা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে, টেসলা এবং ওয়েস্টিংহাউজ প্রতিবর্তী প্রবাহ বা অলটারনেটিং কারেন্ট উৎপাদন করেন। এর সুবিধা হল এতে শক্তির তেমন অপচয় না ঘটিয়ে অনেক বড় অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে।

এই আবিষ্কারের এক দশকের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের অধিকাংশ শহরে জনসাধারণের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়ে যায়। ভারতে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৮৯৭ সালে, দার্জিলিং-এ। এটি ছিল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় ১৮৯৯ সালে। কলকাতায়, প্রিন্সেপ* ঘাট-এর কাছে তৈরি হয় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রথম সারির গ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বড়লাট লর্ড কার্জন। সেই সঙ্গে ছিল চৌরঙ্গি এলাকার অভিজাত বেঙ্গল ক্লাবও। ১৯০২ সালে কলকাতার ট্রাম ঘোড়া ছেড়ে বিদ্যুতের শক্তিতে চলতে শুরু করে। তত দিনে বম্বে শহরেও বিদ্যুৎ এসে গেছে।

লম্বা পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহ করতে হলে আমরা উচ্চ চাপ থেকে শুরু করি। একই ভাবে বিদ্যুৎও আরও বেশিদূর প্রবাহিত হয়, যদি তার ভোল্টেজ বেশি থাকে। প্রতিবর্তী প্রবাহের সুবিধা হল এক্ষেত্রে ইচ্ছা মতো ভোল্টেজ কমানো বা বাড়ানো যায়। দেশ জুড়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হলে ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে ভোল্টেজ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, আবার গ্রাহকদের বাড়িতে তা পৌঁছে দিতে হলে ভোল্টেজ কমিয়ে নেওয়া হয় নিরাপত্তার স্বার্থে। সুতরাং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিভক্ত হয় তিনটি পৃথক ভাগে—উৎপাদন, উচ্চ ভোল্টেজ পরিবহন এবং নিম্ন ভোল্টেজ সরবরাহ।

বিদ্যুৎ প্রবাহের সীমা যত বেড়েছে, উৎপাদনকেন্দ্রগুলিও আকারে তত বড় হয়েছে। এডিসন গোড়াপত্তন করেছিলেন এক মেগাওয়াট দিয়ে। আজ ভারতেই চালু হচ্ছে ৮০০ মেগাওয়াটের উৎপাদনকেন্দ্র। এর ফলে উৎপাদনের খরচ কমেছে। বিদ্যুৎ আজ শিল্প এবং আর্থিক সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি। লেনিন বলেছিলেন সাম্যবাদ হল সোভিয়েত আর বিদ্যুৎ। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের সরকারই একে ক্ষমতার অন্যতম উৎস হিসাবে গণ্য করে এবং সেই কারণেই এই ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রের অধীনে রাখা হয়। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ বেসরকারি মালিকানায় থেকে যায়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র শুধু আকারেই বড় হয়নি, তার বৈচিত্র্যও বেড়েছে বহুগুণ। কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরে আসে জলবিদ্যুৎ। ১৯৫০ নাগাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজও শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কিছু অশোধিত তেলও ব্যবহার করা হত, বিশেষ করে জাপানে। কিন্তু পরে, আরও কার্যকর জ্বালানি পাওয়া যেতে, এই ব্যবহার বন্ধ হয়। যতদিন প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ সীমিত বলে মনে করা হত, ততদিন তা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগান হত না। পরে, নয়ের দশক নাগাদ যখন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সম্মিলিত উৎপাদন কেন্দ্রের (combined cycle plant) উদ্ভব হল, তখন আবার প্রাকৃতিক গ্যাসই চলে এল প্রথম পছন্দের জ্বালানির তালিকায়। মহাকাশযানগুলি সৌরশক্তি ব্যবহার করত। সৌরশক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় আটের দশকে। বর্তমানে বায়ুশক্তি, জিওথার্মাল বা ভূতাপীয় শক্তি, এবং জৈব পদার্থ থেকে প্রাপ্ত শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এবং তরঙ্গ বা স্রোতের মতো অপ্রচলিত উৎসকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস বা জ্বালানি নির্ভর করে উৎপাদনকেন্দ্রের অবস্থানের উপর। আমাদের দেশের যে কোনও অঞ্চলেই কয়লাচালিত উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে কেননা আমাদের বিস্তৃত রেলপথে ধানবাদ, ওড়িশা বা ছত্তিসগড়ের কয়লাখনি থেকে যে কোনও প্রান্তেই কয়লা সরবরাহ করা সম্ভব। প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর উৎপাদনকেন্দ্রের অবস্থান কোনও গ্যাস পাইপলাইন বা গ্যাস সমৃদ্ধ অঞ্চলের কাছাকাছিই হতে হবে। কেননা, নতুন পাইপলাইন বসানো যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে থাকতে হবে দুরন্ত স্রোতের কোনও নদী বা জলপ্রপাতের কাছে। বায়ুচালিত টারবাইন বসাতে হলে এমন জায়গা বাছতে হবে, যেখানে বেশিরভাগ সময়েই উচ্চগতিতে হাওয়া বয়। আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্রই সূর্যালোক পর্যাপ্ত এবং সেই কারণেই যে কোনও জায়গাতেই সৌর প্যানেল বসানো যেতে পারে। রাজস্থান এবং গুজরাতে সৌরতাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপযোগী একাধিক জায়গা রয়েছে।

শুধুমাত্র সস্তার জ্বালানি ব্যবহার করলেই যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমে, এমন নয়। যেহেতু উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণের খরচ সবক্ষেত্রে এক হয় না, তাই অনেক সময়েই দেখা যায়, জ্বালানির দাম বেশি হলেও মিলিত খরচ ততটা বেশি নয়। এই খরচের হিসাব করার একটা সাধারণ মানদণ্ড রয়েছে এবং তারই নিরিখে উৎপন্ন বিদ্যুতের দামও ধার্য করা হয়। কয়লা, গ্যাস বা জল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের দাম শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই কম। বায়ুশক্তিজাত বিদ্যুতের দাম আর একটু বেশি। এর পরেই আছে আমদানি করা এল এন জি এবং পরমাণু শক্তি। সৌরশক্তি এখনও অনেক বেশি দামী।

দামের এই হিসাব একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকে যদি না তার সঙ্গে পরিবেশ দূষণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। কয়লা চালিত প্রকল্পে দূষণের মাত্রা সবথেকে বেশি। ভারতীয় কয়লায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাই থাকে। তাকে যথাযথভাবে বার করে দিতে না পারলে উৎপাদনকেন্দ্রের নিকটবর্তী বেশ কয়েক মাইল অঞ্চলে ছাই-বৃষ্টি হবেই এবং তার ফলে ঘরবাড়ি, জমি-জমা, জলাশয়—সবেরই ক্ষতি। আটের দশকে এই সমস্যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক ছিল। এখন তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। কয়লার ছাই ফেলাটাও খুব বড় সমস্যা নয়, কারণ এই ছাই এখন পোজোলানা সিমেন্ট তৈরির কাজে লাগছে। তাই এর একটা নির্দিষ্ট বাজারও আছে। ভারতীয় কয়লায় সালফারের অংশ কম, এবং আমাদের উৎপাদন কেন্দ্র থেকে নিকটবর্তী বাংলাদেশে 'অ্যাসিড বৃষ্টি'ও হয় না। কিন্তু কারবন ডাই অক্সাইড নির্গমন একটা বড় সমস্যা। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী এই গ্যাসকে পৃথক করার প্রযুক্তি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা চলছে। আগামী ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে অধিকাংশ কয়লাচালিত উৎপাদনকেন্দ্রকেই এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। গ্যাস চালিত প্রকল্পে কারবন ডাই অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা কম, কিন্তু তাদেরকেও হয়তো, এই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কারবন ডাই অক্সাইডের সমস্যা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ জল আটকে রাখতে হয়। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলতে বহু গ্রাম এবং ছোট শহর জলাশয়ে তলিয়ে গেছে, যেমন উত্তরাখণ্ডের টেহরি। এছাড়া, বাঁধের আগে এবং পরে বিস্তৃত অঞ্চলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। পরমাণু শক্তি পরিচ্ছন্ন হলেও, এর উৎপাদনকেন্দ্রে কোনও সমস্যা বা ত্রুটি বিচ্যুতি হলে তার ফল হয় বিধ্বংসী। বায়ু বা সৌরশক্তির মতো নবীকরণীয় শক্তিই পরিবেশকে সবচেয়ে কম দূষিত করে।

যতদিন না পরিবেশ দূষণ দণ্ডনীয় বলে স্বীকৃত হচ্ছে, ততদিন প্রচলিত শক্তির উৎসগুলিই সব থেকে সুলভ এবং গরিষ্ঠ থাকবে। বর্তমানে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতা ২০৯,২৭৬ মেগাওয়াট বা ২০৯ গিগাওয়াট। এর মধ্যে কয়লা সরবরাহ করে ১২০,১০৩ মেগাওয়াট এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ১৮,৯০৩ মেগাওয়াট। জলবিদ্যুতের পরিমাণ ৩৯,২৯১ মেগাওয়াট এবং পরমাণু শক্তি প্রায় ৫০০০ মেগাওয়াট। ২৪,৯৯৮ মেগাওয়াট নবীকরণীয় শক্তির মধ্যে বায়ুশক্তির ভাগ ১৪০০০ মেগাওয়াট এবং তা ক্রমবর্ধমান। গোটা বিশ্বের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৫০০০ গিগাওয়াট। এর ৩২ শতাংশ আসে কয়লা থেকে,২৫ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, ১৯ শতাংশ জলবিদ্যুৎ, ৯ শতাংশ পরমাণু এবং মাত্র ৩ শতাংশ নবীকরণীয় উৎস থেকে। জ্বালানির এই হিসাব থেকেই বোঝা যায় কেন কারবন ডাই অক্সাইড নির্গমনের গরিষ্ঠাংশই হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে। ২০৫০ সালের মধ্যে এই নির্গমন অর্ধেক করতে হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির পরিবর্তন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয় ৩৩০০০ বা ৬৬০০০ ভোল্ট থেকে এবং যায় ১৩২০০০ এবং ৪০০,০০০ ভোল্ট পর্যন্ত। ভোল্টেজ বাড়া মানেই আরও দূরপাল্লায় আরও বেশি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। ভোল্টেজ আরও বাড়ালে তড়িৎচুম্বক-বিকিরণ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এইসব লাইনে একমুখী প্রবাহ ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের লাইনে ৮০০, ০০০ ভোল্ট পর্যন্ত যাওয়া গেছে।

সরবরাহের ব্যবস্থা সাধারণত ১১০০০ এবং ৪৪০ ভোল্টের নিরাপদ সীমার মধ্যে থাকে। এত কম ভোল্টেজে শক্তির অপচয় বাড়ে। এই ক্ষতি কমানোর জন্য যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগ করাই এক্ষেত্রে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিদ্যুৎ চুরি ধরা, তা রোধ করা এবং উন্নত মিটারের সাহায্যে সরবরাহের মাত্রা নির্ধারণ করা।

এডিসনের সময় থেকে ১০০ বছর ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থাগুলি ছিল অখণ্ড বা একক সংস্থা—তা সে সরকারি মালিকানাধীনই হোক, অথবা বেসরকারি। বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন বা সরবরাহ, সবই ছিল একই সংস্থার দায়িত্বে। ঠিক একই ব্যবস্থা চালু ছিল প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রেও। আমরা আগে দেখেছি এই সংস্থাগুলি তাদের দূরপাল্লার পাইপলাইনের মালিকানার জোরে প্রতিযোগীদের আটকে রাখত। মেক্সিকো উপসাগরে গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ার পর যখন খনির কাছে গ্যাসের দাম কমে গিয়েছিল, তখন তার সুফল নিউইয়র্কের কোনও ক্রেতার কাছে পৌঁছায়নি, কারণ গ্যাসের দামের নিয়ন্ত্রণ ছিল অর্ন্তদেশীয় পাইপলাইনের মালিকদের হাতে। আটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সহ বেশ কয়েকটি দেশ দূরপাল্লার পাইপলাইনে প্রবেশাধিকার অবাধ করে দেয়। ফলে উপসাগরীয় অঞ্চলের কোনও গ্যাস উৎপাদক নিউইয়র্কের কোনও ক্রেতাকে পারস্পরিক ভাবে গ্রহণযোগ্য যে কোনও দামে গ্যাস বিক্রি করতে পারল। একটি নিয়ন্ত্রিত মূল্যে এই গ্যাস পরিবহন বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হলে উৎপাদন, পরিবহন এবং সরবরাহকে পৃথক করা প্রয়োজন। পরে ঠিক একই নিয়ম চালু করা হয় বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং আরও বেশ কয়েকটি দেশে গ্যাস এবং বিদ্যুতের দাম কমে যায়।

ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন এবং সরবরাহের কাজ করত সরকারি মালিকানাধীন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি। পর্ষদের লোকসান নিয়ে সরকারের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। ফলে এই পর্ষদগুলি পরিবহন ও সরবরাহ সংক্রান্ত অপচয় (T&D losses) বিদ্যুৎ চুরি ও বকেয়া উদ্ধারের মতো বিষয়ে ছিল যথেষ্ট উদাসীন। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বেশি টাকা আয় করার ব্যাপারেও তাদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। ফলে ঘাটতি পূরণ করতে ঘন ঘন লোডশেডিং ছিল একমাত্র উপায়। ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশন (এন টি পি সি) এবং জলবিদ্যুতের জন্য এন এইচ পি

সি গঠন করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ভারত সরকার। কিন্তু সেখানেও ঋণের বোঝা ক্রমেই বাড়তে থাকে। নয়ের দশকে এই অবস্থার পরিবর্তন অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ঘাটতি পূরণ করার জন্য সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানাবার সিদ্ধান্ত নেয়। বিনিয়োগকারীরা কয়েকটি জরুরি সংস্কার চেয়েছিল। হাতের কাছেই ছিল ব্রিটেনের মডেল। তাই ব্রিটেনের আদলেই সংস্কার করা হয় ভারতের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনে এই সংস্কারকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে উৎপাদন, পরিবহন ও সরবরাহকারী তিন পৃথক সংস্থায় ভাগ করে, দাম নির্ধারণ এবং সংস্থাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়। উৎপাদনকেন্দ্র খুলতে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কোনও লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। তারা যে কোনও সরবরাহকারী সংস্থাকে অথবা বৃহৎ ক্রেতাকে বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারে। সরবরাহকারী সংস্থাকে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কিনতে হয়। সুতরাং, কম উৎপাদন খরচ সম্পন্ন যে কোনও প্রকল্পেরই বাজার নিশ্চিত হয়। ভারত সরকার বেসরকারি বিনিয়োগে বৃহৎ (১০০০ মেগাওয়াটের বেশি) এবং অতি বৃহৎ (৪০০০ মেগাওয়াটের বেশি) প্রকল্পে কিছু বিশেষ সুবিধা ও ছাড় দিয়েছে। বর্তমানে তিনটি অতি বৃহৎ প্রকল্প রূপায়ণের পথে। এই প্রকল্পগুলি প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে সেই বিনিয়োগকারীদের দেওয়া হয় যারা বিদ্যুত বিক্রি করবেন সবচেয়ে কম দামে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বিনিয়োগের পরিমাণ এবং নতুন প্রকল্প গঠনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় বিদ্যুৎ নীতির নির্ধারিত লক্ষ্য—২০১২ সালের মধ্যে ২০০,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন—পূরণে আমরা সক্ষম।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বা সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির হিসাব অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে উৎপাদনক্ষমতা ৩২৭ মেগাওয়াট হওয়া উচিত। যোজনা কমিশন হিসাব করেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা হবে ৮০০ মেগাওয়াট। এত বেশি চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কয়লার উৎপাদন প্রত্যাশিত পরিমাণের থেকে অনেকটাই কমে গেছে। গ্যাসের উৎপাদনও বর্তমানে কম। এর ফলে, আমাদের আমদানি করা জ্বালানির উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে, যা বিদ্যুতের দামও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সরবরাহকারী সংস্থাগুলির (ডিসকম) কাজকর্ম নিয়ে আরও গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সংস্কারের পূর্ববর্তী সময়ে পরিবহন ও সরবরাহ সংক্রান্ত অপচয় সম্পর্কে কারও কোনও ধারণাই ছিল না। নিয়ন্ত্রক কমিশনগুলি বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর দেখা গেল লোকসানের পরিমাণ ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ। বর্তমানে এই লোকসান কমে

হয়েছে ৩০ শতাংশ। এত বেশি অপচয়ের ফলে অধিকাংশ ডিসকমই বিপদে পড়েছে। এর উপর, কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতিতে ঋণের বোঝা আরও বাড়ছে। অনেক রাজ্যের সরকারই ডিসকমগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে যাতে তারা নিয়ন্ত্রক কমিশনের কাছে বিদ্যুতের দাম বাড়াবার আবেদন না করে। সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং সরবরাহকারী সংস্থাগুলির লোকসান কমানোর ব্যাপারে সহায়তা করবার জন্য এক বিশেষ প্রকল্প নিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে রাজ্য সরকারের আওতার বাইরে নিয়ে আসা। নিয়ন্ত্রক কমিশন এমনভাবে বিদ্যুতের দাম ঠিক করবে যাতে সব খরচ মিটিয়ে উৎপাদক, পরিবহনকারী সংস্থা বা ডিসকম-এর হাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে। দক্ষতার মানও ঠিক করবে কমিশন; যে সংস্থা এই দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না তার লোকসান হবে। আশা ছিল, এর ফলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং বেসরকারি বিনিয়োগের পথও সুগম হবে। অনেক রাজ্যেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব এখনও কায়েম রয়েছে এবং স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সরবরাহের ক্ষেত্রে যথাযথ উন্নতি না হলে, এই সাফল্যকে ধরে রাখা যাবে না। এক দশক আগে, লোডশেডিং হলেই আমরা বুঝতাম যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে। এখন আর সেই অবস্থা নেই; হয়তো উৎপাদন ঠিকই আছে কিন্তু ডিসকম তার লোকসান কমাচ্ছে।

জাতীয় বিদ্যুৎ নীতির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য রয়েছে। তা হল, প্রত্যেক গ্রামীণ গৃহে দৈনিক অন্তত এক ইউনিট করে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। ২০১২ সালের মধ্যে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী দুই কোটি ৪০ লক্ষ পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় আনার এক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এক কোটি ৭০ লক্ষ পরিবারকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যপূরণ হয়তো হবে কিন্তু কম ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রেতাদের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে কিনা সন্দেহ। সেক্ষেত্রে সম্পদের চূড়ান্ত অপচয় হবে, একথা বলাই যায়।

জৈব পদার্থ, বায়ু বা সৌরশক্তির সাহায্যে ছোট ছোট উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি করে নিকটবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাই, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য এই পন্থার কথাই ভাবা হয়েছিল। বৃহৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সবসময়েই বড় ক্রেতার চাহিদা পূরণকেই অগ্রাধিকার দেবে। স্বল্প ক্ষমতার ছোট উৎপাদনকেন্দ্র থেকে দরিদ্র জনসাধারণের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই জাতীয় ছোট উদ্যোগ সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু এই উদ্যোগ এখনও উল্লেখযোগ্য আকারে বেড়ে উঠতে পারে নি। একমাত্র প্রত্যন্ত গ্রামীণ

বৈদ্যুতিকরণের এক বিশেষ প্রকল্পই সাফল্যের সঙ্গে চলেছে। তবে তা মাত্র ১০,০০০ গ্রামেই সীমাবদ্ধ।

১০.২ হাইড্রোজেন ●

জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন অত্যন্ত উপযোগী কেননা এটি দ্রুত অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাপ উৎপন্ন করে। তবে, এটি কয়লা বা তেলের মতো প্রাথমিক উৎস নয়। পৃথিবীর বুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও, মৌলিক রূপে হাইড্রোজেনের দেখা পাওয়া যায় না। জল বা হাইড্রোকারবনের মতো যৌগিক পদার্থেই হাইড্রোজেন মেলে। কৃত্রিম উপায়ে অন্য কোনও প্রকারের শক্তি প্রয়োগ করে মৌলিক হাইড্রোজেন তৈরি করতে হয়। বিদ্যুতের মতো হাইড্রোজেনও শক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস।

সূর্যের অবস্থাটা কিন্তু পৃথিবীর মতো নয়। সূর্য এতটাই গরম যে সেখানে কোনও যৌগিক পদার্থই টিকে থাকতে পারে না। এমনকি মৌলিক পদার্থেরও কেবলমাত্র নিউক্লিয়াসটুকুই অবশিষ্ট থাকে। সূর্যের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই প্রবল উত্তাপে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এই সংযোজনই হল সৌরশক্তির উৎস। আবার, এই সৌরশক্তিই কার্যত পৃথিবীর সব তাপ এবং আলোর উৎস। জীবাশ্মজাত জ্বালানি, বায়ু বা তরঙ্গ শক্তি, অথবা জলবিদ্যুতের উৎসও কিন্তু সেই সৌরশক্তি। তবে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে যে উত্তাপ রয়েছে, তা সম্ভবত সৌরশক্তিজাত নয়। তেজষ্ক্রিয়তা বা বিভাজনের মাধ্যমে যে পারমাণবিক শক্তির প্রকাশ ঘটে, তা কোনও ভারী নিউক্লিয়াস থেকেই উৎপন্ন হয়। এই ভারী নিউক্লিয়াসগুলি পৃথিবীতে তৈরি হয়নি। কোথা থেকে এসেছে? সম্ভবত সূর্যের থেকে অনেক পুরানো দূরবর্তী কোনও নক্ষত্র থেকে। কীভাবে? হয়তো কোনও সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে। এই ব্যতিক্রমটুকু বাদ দিলে, আমরা যত ধরনের শক্তি ব্যবহার করি, সবই আসলে সৌরশক্তিরই প্রকারান্তর। সেদিক থেকে বিচার করলে হাইড্রোজেনই একমাত্র প্রাথমিক শক্তি। বাকি সবই দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের।

জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনের দুটি অত্যন্ত সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এটি সবথেকে হালকা জ্বালানি। এক কেজি হাইড্রোজেনকে পুরোপুরি জ্বালালে যতখানি শক্তি পাওয়া যায়, তা এক কেজি জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় অনেক বেশি। সেই কারণেই, নাসা তাদের মহাকাশযানের জ্বালানি হিসেবে তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করত। দ্বিতীয়ত, এর থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির মতো কারবন ডাই অক্সাইড বা অন্যান্য পরিবেশ দূষণকারী পদার্থ নির্গত হয় না। হাইড্রোজেন শুধু অক্সিজেনের সঙ্গে

মিশে জলে পরিণত হয়। ফলে যানবাহনের ধোঁয়াহীন জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন অত্যন্ত মূল্যবান। পেট্রোল বা ডিজেলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন ব্যবহার করার আগে অবশ্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে হবে। তবুও, বিদ্যুতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হাইড্রোজেনই জয়ী হবে বলে মনে হয়।

বর্তমানে খুব অল্প পরিমাণ হাইড্রোজেনই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বেশিরভাগই কাজে লাগে রাসায়নিক শিল্পে, যেমন শোধনাগারে সালফার বিযুক্তিকরণ এবং উৎপাদনের মান উন্নয়নে হাইড্রোজেন কাজে লাগে। সারের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামোনিয়া তৈরির ক্ষেত্রেও হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়। এই সব ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে বছরে প্রায় পাঁচ কোটি টনেরও বেশি হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। উৎসের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস বা মিথেন, যা 'সংশোধন' করে (reforming) তার থেকে হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।

এই সংশোধন বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন ৯০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং একটি অনুঘটক। কিছু পরিমাণ মিথেনকে জ্বালিয়ে এই বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ পাওয়া যায়। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস বা শুকনো কাঠের মতো জৈব পদার্থের আংশিক জারণ বা অক্সিডেশনের ফলে তৈরি হয় কারবন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের এক মিশ্রণ, যাকে বলা হয় সিনগ্যাস, প্রোডিউসার গ্যাস বা টাউন গ্যাস। এর কথা আগেই বলা হয়েছে। বর্তমানে সিনগ্যাসকে অন্তর্বর্তী জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যাকে পুড়িয়ে তাপ অথবা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কিংবা অন্তর্বর্তী রাসায়নিকের কাজও করে এই সিনগ্যাস। এর সাহায্যে মেথানল, পেট্রোল বা ডিজেল তৈরি হয়। হাইড্রোজেনের চাহিদা বাড়লে এই মিশ্রণ থেকে তাকে পৃথক করে নেওয়া যেতে পারে।

মিথেনের সংশোধন অথবা কয়লাকে গ্যাসে পরিণত করা—দুটি প্রক্রিয়াতেই কারবন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। কারবন ডাই অক্সাইডের নির্গমন রোধ করতে যদি হাইড্রোজেনের ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হয়, তাহলে এই কারবন ডাই অক্সাইডকে পৃথক করতে হবে। তাই যদি হয়, তাহলে মিথেন, কয়লা বা তেল ব্যবহার করা হবে না কেন? এদের হাইড্রোজেনে পরিণত করার প্রয়োজন কি? এই প্রক্রিয়া তখনই যুক্তিসঙ্গত হবে, যখন দক্ষতা অথবা সালফার অক্সাইড বা নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গমনের নিরিখে হাইড্রোজেনের ব্যবহার বেশি সুবিধাজনক প্রমাণিত হবে। একমাত্র সেক্ষেত্রেই এই অতিরিক্ত খরচ করার গ্রহণযোগ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

বর্তমানে ব্যয়সাপেক্ষ হলেও ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রক্রিয়া হল জলের বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাইড্রোজেন উৎপাদন। এই প্রক্রিয়া নানা ভাবে করা যায়। জলকে উত্তপ্ত করে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু এই প্রক্রিয়া শুরু হয় ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় খরচ বেশি। কম তাপমাত্রায়

হয় এমন কয়েকটি তাপ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও জল থেকে অক্সিজেন পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক হল সালফার আয়োডিন বিক্রিয়া। 'লৌহ-ক্লোরিন' বা 'ধাতু-অক্সাইড' চক্রের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যেও জল থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে পৃথক করা যায়। তবে এই সব বিক্রিয়ার ফলে উচ্চ তাপমাত্রায় নানা ধরণের অন্তর্বর্তী ক্ষয়িষ্ণু পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাই, বাণিজ্যিক ভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহারের আগে এইসব পদার্থ-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে।

এর থেকে অনেক কার্যকর পদ্ধতি হল তাড়িত বিশ্লেষণ বা ইলেকট্রোলিসিস। পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের মতো ক্ষারের জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন ও অ্যানোডে অক্সিজেন জমা হয়। একটি টর্চের ব্যাটারি ১.২ ভোল্ট বিদ্যুৎ দেয়। এইরকম দুটি ব্যাটারিকে ক্ষার বা অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের মধ্যে ডোবানো দুটি ইলেকট্রোডের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেই তাড়িত বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু বহুল পরিমাণ হাইড্রোজেন পেতে হলে অনেক বড় মাপের ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই পদ্ধতির বাণিজ্যিক ব্যবহারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল যন্ত্রপাতি বা ইলেকট্রোলাইজারের দাম এবং ইউনিট পিছু হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের খরচ। এই ইলেকট্রোলাইজার যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ কারণ তারা অনুঘটক হিসেবে প্ল্যাটিনামের মতো মহার্ঘ বস্তু ব্যবহার করে। দ্রবণের সঠিক ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা নির্বাচন করতে পারলে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো যায়। তাহলেও, এক কিলোগ্রামের এক দশমাংশ ওজনের এক ঘন মিটার হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পাঁচ ইউনিট (পাঁচ কিলোওয়াট ঘন্টা) বিদ্যুতের প্রয়োজন। এই খরচ, প্রাকৃতিক গ্যাস সংশোধন করে পাওয়া হাইড্রোজেনের তুলনায় পাঁচগুণ।

সংশোধন, তাপ-রাসায়নিক বিশ্লেষণ অথবা তাড়িত বিশ্লেষণ—হাইড্রোজেন উৎপাদনের যে কোনও পদ্ধতিতেই শক্তির খরচ প্রচুর। এর ফলে, দুরকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়—এক, চড়া দাম আর দুই, কারবন ডাই অক্সাইড নির্গমন। নবীকরণীয় শক্তি ব্যবহার করলে দ্বিতীয় সমস্যার বেশ কিছুটা সুরাহা হয়। উদাহরণ হিসাবে ব্রাজিলের কথা বলা যেতে পারে, যারা তাদের পর্যাপ্ত জলবিদ্যুৎকে এই কাজে লাগিয়েছে। আইসল্যান্ড তাদের ভূতাপীয় বা জিওথার্মাল শক্তির সদ্ব্যবহার করছে। কিন্তু এগুলি নেহাতই ব্যতিক্রম। সাধারণভাবে, সৌর বা বায়ুশক্তিকে কাজে লাগানো যায়। এই প্রকল্পগুলি অনেক সময় প্রয়োজনর বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ হাইড্রোজেন হিসেবে সঞ্চয় করে রাখা যায়।

পরমাণু শক্তি কারবন ডাই অক্সাইড ছড়ায় না। তাই, তাড়িত বিশ্লেষণের জন্য এই শক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। কয়েকটি পরমাণু চুল্লিকে ৯০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কাজ করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। তবে এখনও এগুলির বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়নি। এই ধরনের চুল্লির উদ্বৃত্ত উত্তাপকে উচ্চ তাপমাত্রার বাষ্প তৈরির

কাজে ব্যবহার করা যায়। এরপর এই বাষ্পের তাড়িত বিশ্লেষণ করার কথা ভাবা যেতে পারে, কারণ এত বেশি উত্তাপ থাকায় এই পদ্ধতিতে বিদ্যুতের খরচ কম। তবে অদূর ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর হবে বলে মনে হয় না।

জলের তাড়িত বিশ্লেষণে সৌরশক্তিকে নানা ভাবে ব্যবহার করা যায়। প্রথমত, সৌর বিদ্যুৎ তৈরি করে তাকে জলের মধ্যে প্রবাহিত করা যায়। এছাড়া, একটি আলোক প্রতিক্রিয়াশীল বা ফোটোসেনসিটিভ অর্ধপরিবাহীকে ইলেকট্রোড হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা জানি যে, এই ইলেকট্রোডের উপর সূর্যালোক পড়লে কিছু ইলেকট্রন এবং ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এই ছিদ্রগুলিকে তাড়িত দ্রব বা ইলেকট্রোলাইটের দিকে চালনা করা হয় এবং তা জলকে অক্সিজেন এবং পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত হাইড্রোজেন আয়নে বিভক্ত করে।

তাড়িত দ্রবের মধ্য দিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন দ্বিতীয় ইলেকট্রোডে পৌঁছায় এবং প্রথম ইলেকট্রোড থেকে একটি তারের মাধ্যমে আসা ইলেকট্রনের সাহায্যে হাইড্রোজেনে পরিণত হয়। টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইডের উপর আলোক প্রতিক্রিয়াশীল কোনও রাসায়নিকের প্রলেপ দিয়ে তা প্রথম ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয় ইলেকট্রোডটি তৈরি করা যায় প্ল্যাটিনাম দিয়ে। আরও একটি পদ্ধতি হল নীল-সবুজ শ্যাওলার (blue-green algae) ব্যবহার, যারা নির্দিষ্ট কয়েকটি অবস্থায় হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে পারলে, এই পদ্ধতি হাইড্রোজেন উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত সুলভ।

এই সব পদ্ধতির যে কোনও একটির মাধ্যমে হাইড্রোজেন উৎপাদন বর্তমানে পেট্রোলের অন্তত তিন গুণ খরচসাপেক্ষ। হাইড্রোজেন ওজনে হালকা হওয়ায় তার মজুত এবং পরিবহনও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সি এন জি মজুত করতে ১৫ অ্যাটমসফিয়ার চাপই যথেষ্ট। কিন্তু হাইড্রোজেন মজুত করতে হলে প্রয়োজন ৩৫০ অ্যাটমসফিয়ার চাপ। হাইড্রোজেন তরলীকৃত হয় মাইনাস ২৫৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অতএব তরলীকরণ নিঃসন্দেহে ব্যয়সাপেক্ষ। তরল হাইড্রোজেনকে ক্রায়োজেনিক আধারে রাখতে হয় এবং অনেকটাই বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। হাইড্রোজেন মজুতের তৃতীয় উপায় হল হাইড্রাইড, বিশেষত ধাতব হাইড্রাইডের আকারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রাইড তৈরি হয়। প্রয়োজনে, একে উত্তপ্ত করলে হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে। তবে ১০০ কিলো হাইড্রাইডে মাত্র পাঁচ কিলো হাইড্রোজেন মজুত করা যায়।

জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনকে নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। সূর্যের অভ্যন্তরে পরমাণুর যে সংযোজন প্রক্রিয়া চলে, তার জ্বালানির কাজ করে হাইড্রোজেন, কিন্তু গত

চার দশকের বিস্তারিত গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান সত্ত্বেও শক্তি উৎপাদনের কাজে সংযোজন প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করার উপযুক্ত পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। গ্যাস টারবাইন বা অন্তর্দহন ইঞ্জিনে হাইড্রোজেন ব্যবহার করা যায়, কিন্তু জ্বালানি হিসাবে এর আসল কার্যকারিতা রয়েছে 'ফুয়েল সেল' বা জ্বালানি কোষ-এ ব্যবহারের মাধ্যমে। ফুয়েল সেল কী করে? এর কাজ ইলেকট্রোলাইজারের ঠিক বিপরীত। ইলেকট্রোলাইজার বিদ্যুতের সাহায্যে জলকে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে বিভক্ত করে, আর ফুয়েল সেল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে যুক্ত করে জলে পরিণত করে এবং তার থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রেও একটি তাড়িত দ্রবের মধ্যে দুটি ইলেকট্রোড থাকে। একটি ইলেকট্রোডে হাইড্রোজেন সরবরাহ করা হয়, যার থেকে ইলেকট্রন বিযুক্ত হতে থাকে। হাইড্রোজেন আয়নগুলি দ্বিতীয় ইলেকট্রোডে গিয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন ইলেকট্রনগুলিকে তাড়িত দ্রবের মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া হয়না। বাইরের একটি তড়িৎবর্তনী বা সারকিটের মধ্য দিয়ে তাদের দ্বিতীয় ইলেকট্রোডে যেতে বাধ্য করা হয়। এই সারকিটে তারা আলো জ্বালানো বা মোটর চালানোর কাজও করতে পারে।

ফুয়েল সেলের মাধ্যমে কয়েক ওয়াট থেকে কয়েক মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফুয়েল সেল তৈরি করা হয়েছে। তবে, এর মধ্যে সব থেকে উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময় হল যাত্রীবাহী গাড়ি চালানোর কাজে এর ব্যবহার। পলিমার ইলেকট্রোলাইট মেমব্রেন (পি ই এম) ফুয়েল সেল হল গাড়ির জন্য সবচেয়ে উপযোগী। যে কোনও ধরনের ফুয়েল সেলই হল কার্যকর, নিঃশব্দ এবং দূষণমুক্ত। এর সঙ্গে পি ই এম সেলের বাড়তি সুবিধা হল—প্রথমত, এগুলি আয়তনে ছোট। দ্বিতীয়ত, এগুলি ৬০-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কাজ করে—তার বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ বাইরের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নীচে হলেও এগুলি সহজেই চালু হয়ে যায়। ইলেক্ট্রোলাইট বলতে আমরা ভাবি কাঁচের টাবে রাখা তরল দ্রবণের কথা। এই ধরনের সেল-এ কিন্তু তাড়িত দ্রব বা ইলেকট্রোলাইটের কাজ করে পলিমারের একটি পাতলা চাদর।

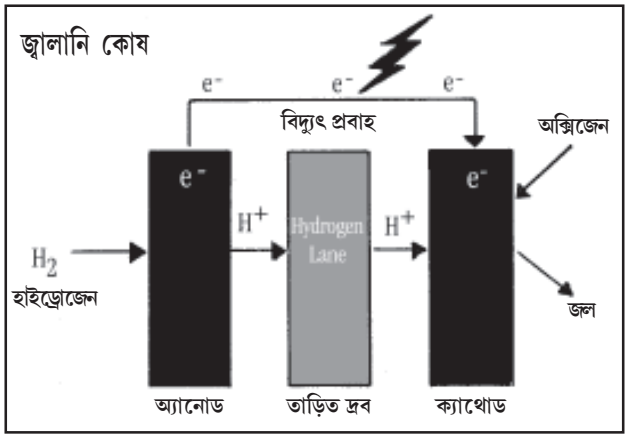

জ্বালানি কোষ যে ভাবে কাজ করে

ইলেকট্রোড তৈরি করা হয় কারবনের আস্তরণের উপর প্লাটিনাম বসিয়ে। পলিমারের চাদরের দুদিকে দুটি ইলেকট্রোড চেপে বসিয়ে তৈরি হয় আধ মিলিমিটার পুরু একটি সেল। প্রতিটি 'সেল'-এর উৎপাদন ক্ষমতা ০.৬ ভোল্ট। এইরকম ৪০টি সেল একত্র করে ২৪ ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্যাক পাওয়া যায়। গাড়ি চালানোর জন্য প্রয়োজন হয় ৭৫ কিলোওয়াট। বাসের চাহিদা আবার প্রায় ২৫০ কিলোওয়াট। সেলের মাপ বাড়াতে হয় সেই অনুপাতে।

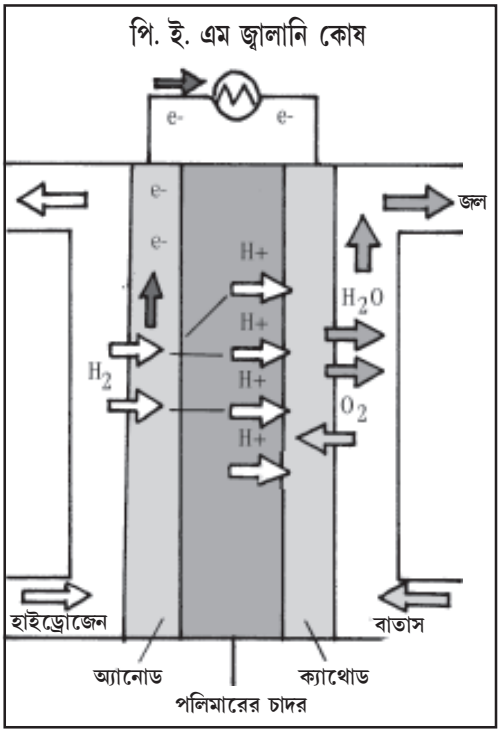

পি ই এম সেল যে ভাবে কাজ করে।

হন্ডা সহ বিশ্বের সব বড় মোটরগাড়ি নির্মাণ সংস্থাই ফুয়েল সেল চালিত গাড়ি তৈরি করেছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি গাড়িই একবার জ্বালানি ভরে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলেছে এবং সর্বাধিক গতিবেগ ছিল ঘন্টা প্রতি ১৫০ কিলোমিটার। তবে, ২০১১ পর্যন্ত কোনও গাড়িই বিক্রির জন্য বাজারে আসেনি। ক্যালিফোর্নিয়া, আইসল্যান্ড, ইউরোপ এবং জাপানে বেশ কয়েকটি হাইড্রোজেন চালিত গাড়ি ও বাস চলে। এগুলিতে হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয় অন্তর্দহন ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে। এগুলি একবার জ্বালানি ভরে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলেছে এবং ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতাও যথেষ্ট ভাল। গাড়িগুলি ৪/৫ কিলো হাইড্রোজেন নিয়ে চলা শুরু করে আর বাস মজুত রাখে প্রায় ১৫ কিলো। মজুত রাখার জন্য কমপ্রেসড হাইড্রোজেনই বেশি উপযোগী। তবে তরল হাইড্রোজেন বা ধাতব হাইড্রাইডও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পথচলতি মজুতের সমস্যা থেকেই গেছে। পেট্রোল চালিত গাড়ি যাত্রা শুরুর সময় ট্যাঙ্কে প্রায় ৫০ লিটার তেল ভরতে পারে। সমপরিমাণ হাইড্রোজেন মজুত করতে লাগবে ২০০ লিটারের ট্যাঙ্ক এবং ৭০০ অ্যাটমসফিয়ার চাপ। আর তরল হাইড্রোজেন মজুত করতে হলে চাই অন্তত ৩৫০ লিটার। ফুয়েল সেল-এর অত্যধিক দাম এবং হাইড্রোজেন মজুত রাখার অসুবিধার জন্যই ফুয়েল সেলের বহুল ব্যবহারের সম্ভাবনা ক্ষীণ। এমনকি ২০৫০ সালেও তা কতটা বাড়বে তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

তা সত্ত্বেও, এই প্রযুক্তির সম্ভাবনার দিকটি এতই উজ্জ্বল যে এই বিষয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব ধরনের উৎপাদন, মজুত এবং ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে ভারত। পরীক্ষামূলক একটি প্রকল্পে সি এন জি-এর সঙ্গে ১৮ শতাংশ হাইড্রোজেন মেশানো হচ্ছে। এর ফলে হাইড্রোজেন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা যেমন বাড়বে, তেমনই কমবে নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ। কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটি বাস এবং অটোরিকশাকে হাইড্রোজেনে চালিয়ে দেখা হবে। জৈবিক উপায়ে হাইড্রোজেন উৎপাদন সংক্রান্ত একটি গবেষণার পুরোভাগে রয়েছে আই আই টি খড়্গপুর। হাইড্রাইড-এর এবং কারবনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন মজুতের বিষয়ে গবেষণার কাজ চলছে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আই আই টি, চেন্নাইতে। হাইড্রোজেন চালিত অন্তর্দহন ইঞ্জিন তৈরি করার কাজ হচ্ছে আই আই টি দিল্লিতে। এছাড়াও পারমাণবিক উত্তাপকে কাজে লাগিয়ে তাপ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন উৎপাদনের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখছে বি এ আর সি। বেশ কয়েকটি সংস্থা উচ্চ তাপমাত্রার ফুয়েল সেল এবং মেথানল ও অ্যালকোহল ফুয়েল সেল নিয়ে কাজ করছে। REVA বৈদ্যুতিক গাড়ি যাতে আরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, তাতে পরীক্ষামূলক ভাবে ফুয়েল সেল ব্যবহার করা হচ্ছে। ■

একাদশ অধ্যায় অপ্রচলিত এবং কম প্রচলিত শক্তি

১১.১ স্বচ্ছতম উৎস — শক্তির সাশ্রয় ●

বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে তার দাম দিতে হয়। তাই যে কোনও ক্রেতাই চাইবেন বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করতে। ট্যাঙ্কে জল তোলার জন্য যে পাম্প আমরা ব্যবহার করি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কার্যকারিতা কমে। ট্যাঙ্ক ভর্তি করতে প্রথমে তার যতটা সময় লাগত, পরে সেই ট্যাঙ্ক ভর্তি করতেই আরও বেশি সময় লাগে। অর্থাৎ, একই কাজ করতে বিদ্যুৎ খরচ হয় আগের তুলনায় বেশি। আমরা বুঝতে পারি যে পাম্পের দক্ষতা কমে গেছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা একটা নতুন পাম্প কেনার চেষ্টা করি। আবার প্রতিবেশীর কাছে যখন শুনি যে কমপ্যাক্ট ফ্লোরসেন্ট ল্যাম্প (সি এফ এল) ব্যবহার করলে বিদ্যুতের বিল কমে অর্ধেক হতে পারে, তখন অবিলম্বে আমরা তা কিনে ফেলি। দুটি ক্ষেত্রেই আমাদের কিছু টাকা লগ্নি করতে হয়। পরে অবশ্য বিদ্যুতের খরচ কমিয়ে সেই টাকা আমরা ফেরতও পেয়ে যাই। তাই বলে, প্রতিবার বাজারে কোনও নতুন পণ্য এলেই তা কিনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

প্রথমবার ফ্রিজ বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কিনছেন, এমন ক্রেতার কাছে অবশ্য বিষয়টি ভিন্ন। দাম, আকার এবং পরিষেবার মতো অন্যান্য দিকগুলি যদি এক থাকে, তাহলে ক্রেতা সবসময়েই সব থেকে কর্মদক্ষ অর্থাৎ বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী যন্ত্রই কিনবেন। তবে একথাও নিশ্চিত যে 'অন্যান্য' দিকগুলি কখনই সমান হয় না এবং অদক্ষ যন্ত্র সবসময়েই বাজারের একটা বড় অংশ দখল করে থাকে। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতির গড় দক্ষতা বাড়লেও এই বৃদ্ধির হার খুবই মন্থর হয়।

১৯৭৩-৭৪ সালে আমরা প্রথমবার তেলের সঙ্কট দেখি। ওপেক দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। রাতারাতি তেলের দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই সঙ্কটের পূর্ববর্তী বেশ কয়েক দশক ধরেই তেলের যোগান ছিল প্রচুর, সেই সঙ্গে দামও ছিল কম। ক্রেতারাও তেল ব্যবহার করতেন নির্দ্বিধায়, নিশ্চিন্তে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সঙ্কট আসতেই বিভিন্ন দেশের সরকার নড়েচড়ে বসল। প্রয়োজন হয়ে পড়ল তেলের উপর এতদিনের অপার নির্ভরতা কমাবার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া।

সরকারের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। এক, সাধারণ মানুষকে সতর্ক হতে বলা, যা সবসময়েই যথেষ্ট দুরূহ। দ্বিতীয় পথ ছিল, প্রযুক্তিগত উন্নতি যাতে মানুষের জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত রেখেও তেলের খরচ কমানো যায়। স্বভাবতই সব দেশের সরকারই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করে। আর সেই সময় থেকেই শক্তি সাশ্রয়ের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে আরম্ভ করল। শুধু তাই নয়, বিষয়টি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের থেকে সরকারি নীতির এক্তিয়ারে চলে আসে। শক্তি সাশ্রয় যথার্থভাবেই শক্তির উৎস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এক মেগাওয়াট সাশ্রয় করলে তাকে বলা হয় 'নেগাওয়াট'। ১০০ ইউনিট তাপশক্তি সম্পন্ন কোনো কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ৪০ ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করে। ক্রেতার কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে পরিবহন এবং সরবরাহে এই বিদ্যুতের ৩০ শতাংশ অপচয় হয়। সুতরাং ক্রেতারা পায় ২৮ ইউনিট। আমরা যদি আমাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা রেফ্রিজারেটরকে এতটা উন্নত করতে পারি যাতে ২.৮ ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়, তাহলে তা ৪ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ১০ ইউনিট কয়লা বাঁচাবে। সর্বস্তরেই এই সাশ্রয় হওয়া প্রয়োজন, তবে চূড়ান্ত স্তরে অর্থাৎ ক্রেতাদের হাতে হলে এটি বিশেষভাবে উপযোগী।

১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আইন পাশ করে। তাতে বলা হয়েছিল, ১৯৮৫ সালের যাত্রীবাহী গাড়ির জ্বালানির খরচ কমিয়ে গড়ে ১৯৭৫ সালের অর্ধেক করতে হবে, অর্থাৎ প্রতি গ্যালনে গাড়ি চলবে ২৭.৫ মাইল। মার্কিন বাজারে বিক্রি করতে হলে সব গাড়ি উৎপাদনকারী সংস্থাকেই এই মানদণ্ডের শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হত। একে বলা হত CAFE বা কর্পোরেট অ্যাভারেজ ফুয়েল ইকনমি। বহু সংস্থা এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে, অনেকে তা অতিক্রমও করেছে। যারা পারে নি, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে তেলের দামের ওঠাপড়া চলতে থাকে। ১৯৮০ সালে তেলের দাম ছিল ব্যারেল পিছু ৪০ ডলার; ১৯৮৬ সালে তা ১০ ডলারে নেমে আসে। তাই জ্বালানি সাশ্রয়ের মানদণ্ডকে আরও কঠোর করার প্রয়োজন তখনকার মতো কমে যায়। আবার, ২০০০ সালের পর তেলের দাম বাড়তে থাকে। ফলে, ২০০৭ সালে জ্বালানি সাশ্রয়ের মানদণ্ডেও পরিবর্তন আসে। ২০২০ সালের জন্য CAFE এর সীমা রাখা হয়েছে গ্যালন প্রতি ৩৫ মাইল। যাত্রীবাহী গাড়ির সঙ্গে হালকা বাণিজ্যিক যানবাহনকেও এই আইনের আওতায় এনে এর পরিধি বাড়ানো হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করেছে ইউরোপিয় ইউনিয়ন এবং জাপান। ২০২০ সালের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় জাপান আরও কঠিন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের দেশগুলিও হয়তো তাই করবে। ইউরোপিয় ইউনিয়ন বা জাপানের তুলনায় গ্যাসোলিন

ও ডিজেলের দাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কম। সেই কারণে এদেশে জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্যোগ নেওয়াও শক্ত। ২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্যালন পিছু ৪৮ মাইল চলা গাড়ি যেমন চালু করা হচ্ছে তেমনই আবার গ্যালন পিছু ১৮ মাইলের মডেলও রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে শক্তি নিরাপত্তার খাতিরে অগ্রাধিকার পেলেও জ্বালানি সাশ্রয় কিন্তু পরিবেশ রক্ষার জন্যও অত্যন্ত উপযোগী এক পদক্ষেপ। শক্তি উৎপাদন বা ব্যবহার, —যাই হোক না কেন তা থেকে বহুল পরিমাণ কারবন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। সুতরাং এই নির্গমন কমাতে হলে শক্তির খরচও কমাতে হবে। ইউরোপে জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা গ্যালন প্রতি মাইলের পরিবর্তে কিলোমিটার প্রতি কত গ্রাম কারবন ডাই অক্সাইড নির্গত হচ্ছে, তার ভিত্তিতে করা হয়। জ্বালানি সাশ্রয়ের স্বপক্ষে পরিবেশ রক্ষার এই যুক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু শুধু জ্বালানি সাশ্রয়কারী পদক্ষেপ জ্বালানির ব্যবহার কমাতে পারবে না। এর সঙ্গে জ্বালানির দামও চড়া থাকতে হবে। জ্বালানির দাম কম থাকলে ক্রেতা কখনওই বেশি দাম দিয়ে বেশি দক্ষ গাড়ি কিনবে না। কিনলেও হয়তো সে আরও বেশি গাড়ি চালাবে। অফিস থেকে গাড়ি করে বাড়ি এসে মধ্যাহ্ন ভোজ সারবে। কিংবা ছুটির দিনে কাছের কোনও শহরে থাকা বন্ধুর বাড়িতে যাবে। গাড়ির দক্ষতা তখনই কার্যকর হয়, যখন জ্বালানির দাম বেশি থাকে।

বাড়িতে আমরা বিদ্যুতের ব্যবহার করি নানা ভাবে, নানা কারণে। আলো, পাখা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, রান্না, রেফ্রিজারেটর—সবই চলে বিদ্যুতে। ভারতে বিক্রি হওয়া সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য দক্ষতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয় ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি। যন্ত্রের উপরে লেবেল এঁটে তার দক্ষতা সম্বন্ধে তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসি, রেফ্রিজারেটর এবং ফ্লোরসেন্ট টিউব লাইটের ক্ষেত্রে এই লেবেলিং বাধ্যতামূলক। লেবেলে দেখানো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাত্রার ভিত্তিতে এইসব সরঞ্জামকে এক থেকে পাঁচের মধ্যে নম্বর দেওয়া হয়। এই 'স্ট্যান্ডার্ড এবং লেবেলিং' প্রোগ্রাম হ'ল ক্রেতা-সচেতনতা বাড়ানোর এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। বাজারে আরও সাশ্রয়কারী সরঞ্জাম আসার সঙ্গে সঙ্গে মানদণ্ডেরও রদবদল করা হয়। ব্যুরোর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করলে ২০১৫ সালের মধ্যে আমরা ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারব।

অফিস বা বড় শপিং কমপ্লেক্সেও প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ হয়। এই ধরনের বড় বাড়ির নকশার কিছু রদবদল করলে বিদ্যুতের খরচ কিছুটা কমানো যায়। উন্নত নকশা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন না থাকলে বিদ্যুতের ব্যবহার বন্ধ রাখার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ২০ শতাংশ শক্তি সাশ্রয় করা যেতে পারে। বর্তমানে সরকার নতুন তৈরি হওয়া বাড়িগুলিকে শক্তি সাশ্রয়ের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারি ভবনের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক। আগে তৈরি হওয়া বাড়ির ক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ খরচের হিসাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উৎপাদন শিল্পেই বিদ্যুতের খরচ হয় সব থেকে বেশি। তাই, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের সাশ্রয়কে সবসময়েই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভারত সরকার আটটি ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে শক্তি-নির্ভর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সেগুলি হল—ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, সিমেন্ট, সার, কাগজ এবং মন্ড, বস্ত্র এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ৪৬২টি বৃহৎ কেন্দ্রকে ২০০১ সালের শক্তি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী 'নির্দিষ্ট ক্রেতা' হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এদের জন্য শক্তি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে যা তাদের ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। যারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার থেকেও বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারবে, তারা অন্যান্য পিছিয়ে থাকা কেন্দ্রকে স্বত্ব বিক্রি করতে পারবে। এই কর্মসূচীর নাম পারফর্ম অ্যাচিভ অ্যান্ড ট্রেড (সংক্ষেপে প্যাট বা PAT)। এর মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ টন তেলের সমপরিমাণ শক্তি সংরক্ষণ করা যাবে। তবে, আমাদের দেশে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এরা সংখ্যায় এতই বেশি যে শক্তি সংরক্ষণের সম্ভাবনার বিষয়ে এদের সচেতন করতে হলে অনেক বড় প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আকারে ছোট হওয়ার ফলে এরা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে লগ্নি করতে চায় না। এই ক্ষেত্রকে 'প্যাট'-এর মতো কর্মসূচীর আওতায় আনাটাই সরকারের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

সাশ্রয় কর্মসূচীর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে এনার্জি সার্ভিস কোম্পানির (ESCO) গঠনের উপর। এইসব সংস্থার ব্যবসাই হল ক্রেতাদের হয়ে উন্নতমানের সাশ্রয়কারী প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা। ক্রেতাদের বিদ্যুতের বিল কমানোই এদের মূল দায়িত্ব এবং তাদের এই বিনিয়োগ ও পরিষেবার জন্য তারা পারিশ্রমিকও পায়। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলিই এই পরিষেবা দিতে পারে, যদি নিয়ন্ত্রকদের তরফ থেকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়। ডিসকম এবং অন্যান্য সংস্থা যাতে ESCO-র কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছে ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি।

গত দু দশক ধরে ভারতীয় গাড়ির ধোঁয়া নির্গমন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরও কঠোর করা হয়েছে। দেশে ১২টি বড় শহরে ভারত ৪ বা ইউরো ৪ মানের গাড়ি ছাড়া অন্য গাড়ি নথিভূক্ত করা হচ্ছে না। সেই সঙ্গে রয়েছে সি এন জি বা কম সালফারের ডিজেলের মতো পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার। ফলে এই সব শহরের বায়ু দূষণের মাত্রা কমেছে। কিন্তু গাড়ির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। গত বছরই প্রায় ২০ লক্ষ গাড়ি রাস্তায় নেমেছে। কারবন ডাই অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে গাড়িতে জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। গৃহস্থালির সরঞ্জামের ক্ষেত্রে

যেমন একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি রাখা হয়, গাড়ির ক্ষেত্রেও তেমনটা করার কথা ভাবছে ব্যুরো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন সহ অনেক দেশেই এই ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে যেখানে ক্রেতারা তাদের পছন্দমাফিক যে কোনও মানের জ্বালানি সাশ্রয়কারী গাড়ি কিনতে পারেন। ২০১৫ সালের মধ্যে ভারতেও এই ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে শক্তি সাশ্রয় নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। সাশ্রয়ের দিক থেকে সব থেকে কম কার্যকর কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন। উন্নতমানের উৎপাদনকেন্দ্র ৪০ শতাংশ তাপ-শক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করে, আর পুরানো কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যায় ৩০ শতাংশ। এর প্রাথমিক কারণই হল ৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঊর্ধ্বে বাষ্প ব্যবহারের অসুবিধা।

কয়েকটি বিশেষ ধাতু ব্যবহার করলে ৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রার বাষ্পকে কাজে লাগিয়ে ৫০ শতাংশেরও বেশি কার্যকারিতা অর্জন করা যায়। পেট্রোরাসায়নিক পদার্থ তৈরির কাজে জৈব পদার্থ ব্যবহার করলে তা পেট্রোলিয়ম বাঁচায়। গাড়ির ক্ষেত্রে অন্তর্দহন ইঞ্জিনের পরিবর্তে ফুয়েল সেল ব্যবহার করলে তা জ্বালানি সাশ্রয় করে। এইসব বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা নেহাতই সামান্য।

শক্তি সাশ্রয়ের প্রচলিত সংজ্ঞা হল, কম শক্তি ব্যবহার করে একই কাজ করা। ঠিক যেমন, দক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত নকশার বাড়িতে কম শক্তি খরচ হয়, অথবা সুপরিকল্পিত শহরে বাসিন্দাদের দৈনন্দিন যাতায়াত কম করতে হয়। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি মানুষকে ঘরে বসেই কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। উন্নতমানের গণপরিবহন ব্যবস্থা এবং রেলযোগাযোগ ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে। ফলে, শক্তিরও সাশ্রয় হয়। এইসব ব্যবস্থা কার্যকর করতে জ্বালানির দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে মানুষের সদিচ্ছারও প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে নির্দিষ্ট একটি সময়ে বৈদ্যুতিক আলো বন্ধ রাখা বা 'বিনা পেট্রোল দিবস' পালন করার মতো পদক্ষেপ তেমন কার্যকর বলে মনে না হলেও আমাদের দেশে এই ধরনের সদভাবনামূলক পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে।

অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রেই শক্তি সাশ্রয়ের প্রচেষ্টা হলে তার প্রতিফলন দেখা যাবে মোট দেশজ উৎপাদন (জি ডি পি)ও শক্তি খরচের পারস্পরিক সম্বন্ধে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রতি ডলারে খরচ হওয়া শক্তির পরিমাণ কমে আসবে। ভারতে এই খরচ কমেছে। গত এক দশকে আমাদের অর্থনীতিতে বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হয়েছে, অথচ শক্তির ব্যবহার বেড়েছে মাত্র ৪ শতাংশ। এর কিছুটা হয়েছে অর্থনীতির গঠনমূলক পরিবর্তনের ফলে; শক্তি সাশ্রয়ের কর্মসূচী কতটা কার্যকর হয়েছে তা বুঝতে গেলে বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন।

১১.২ অপ্রচলিত তেল ●

যে তেলের মূলগত বৈশিষ্ট্য অন্যরকম অথবা যে তেল ভিন্ন ধরনের অঞ্চলে পাওয়া যায়, সাধারণত তাকেই অপ্রচলিত তেল বলা হয়। কানাডার আথাবাস্কা বা তার নিকটবর্তী অঞ্চল অথবা ভেনেজুয়েলার ওরিনোকো অঞ্চলে যে অতি ভারী (আল্ট্রা হেভি) তেল পাওয়া যায়, তাকে অপ্রচলিত তেল বলা চলে। জৈবপদার্থ যখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তেলে পরিণত হয়, তখন তার অন্তর্বর্তী পর্যায়ে পাওয়া যায় শেল অয়েল (Shale Oil), যা ঠিক তেল নয়, বরং কেরোজেন। এই শেল অয়েলও অপ্রচলিত তেল। অপ্রচলিত তেল অথবা তাদের প্রাপ্তিস্থলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য এগুলি উৎপাদন করতে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়। সাধারণভাবে, প্রচলিত তেলের তুলনায় এদের উৎপাদনের খরচ বেশি। একমাত্র, যখন তেলের দাম অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখনই এই অপ্রচলিত তেলের অনুসন্ধান বা উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠে শিল্পমহল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১৯৮০ অথবা ২০০০ সালের কথা।

কানাডার বালুকাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে আঠালো সান্দ্র (viscous) তেল আর বিটুমেন পাওয়া যায়। আনুমানিক ২ লক্ষ কোটি ব্যারেল তেল এখানে রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই বেশি। প্রমাণিত মজুত হল ১৭ হাজার কোটি ব্যারেল। ১৯৬০ সাল থেকেই এই মজুত ভাণ্ডারে বাণিজ্যিক উৎপাদনের কাজ চলছে এবং বর্তমানে এই উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক ১০ লক্ষ ব্যারেল। উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধিত করার প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে এই পরিমাণ বেড়ে দৈনিক ৪০ লক্ষ ব্যারেলে পৌঁছে যেতে পারে। তবে, এই প্রকল্পের কাজ অব্যাহত থাকবে কিনা তা নির্ভর করছে দুটি বিষয়ের উপর। প্রথমত, তেলের দাম। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পরিবহনের ফলে পরিবেশজনিত যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তার সমাধান।

বিটুমেনের অগভীর সংগ্রহকে সহজেই মাটির তলা থেকে বার করা যায়, ঠিক 'ওপেন কাস্ট' কয়লা খনির মতো, তবে, ৭০ মিটার গভীরতার পরে আর এই প্রযুক্তি কাজ করে না। সেক্ষেত্রে ভিতরে বাষ্প প্রবেশ করিয়ে তেলের সান্দ্রতা কমাতে হয়, যাতে তা প্রবাহিত হতে পারে। খনি থেকে বার করে এই তেল আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরও তরল করা হয় যাতে তাকে পরিবহন করা যায়। তারপরে এই তেলকে পাইপলাইনের মাধ্যমে শোধানাগারে পাঠানো হয়।

সান্দ্র তেল উৎপাদনে শক্তি এবং জল দুইয়ের খরচই বেশি। যে কোনও ধরনের অপ্রচলিত তেল বা গ্যাসের উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হই। প্রচলিত তেল বা গ্যাসের তুলনায় এই উৎপাদনে কারবন ডাই অক্সাইড নির্গমনও

অনেক বেশি হতে পারে। বাষ্প উৎপন্ন করতে প্রতি ব্যারেল তেলের জন্য এক ব্যারেল করে জল লাগে। বিটুমেন ধুতে বা তা উন্নত করতেও ব্যারেল পিছু ৩-৫ ব্যারেল জল লাগে। জলের এই বিপুল চাহিদার বেশিরভাগই মেটানো হয় ভূগর্ভস্থ নোনা জল দিয়ে। কিন্তু তাতেও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। এছাড়াও বিটুমেনের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলের দূষণও একটি বড় সমস্যা যার সমাধান প্রয়োজন।

ভেনেজুয়েলার ওরিনোকো অঞ্চলে বিটুমেনের মজুতভাণ্ডার হল অপ্রচলিত তেলের ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। এখানে রয়েছে ১ লক্ষ কোটি ব্যারেল তেল। তবে প্রমাণিত মজুত সেই ১৭ হাজার কোটি ব্যারেলই। বর্তমানে এখানে উৎপাদনের হার দৈনিক ৪ লক্ষ ব্যারেল। তবে, এই হার বেড়ে দৈনিক ২০ লক্ষ ব্যারেলেরও বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অশোধিত তৈলাক্ত পদার্থ জলের সঙ্গে মিশিয়ে 'ওরিমালসান' নামে এক দ্রব তৈরি করে রপ্তানি করা হয়। ভারতও এই দ্রব আমদানি করে কয়েকটি শোধনাগারে ব্যবহার করেছে। অপ্রচলিত তেল ভবিষ্যতের জ্বালানির বাজারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে—এই প্রত্যাশা নিয়ে সব দেশের শোধনাগারেই এই সান্দ্র তেলে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এই অধ্যায়ে শেল অয়েল এবং শেল গ্যাস নিয়েও আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও আই ই এ আরও দুধরনের তেলকে অপ্রচলিত তেলের পর্যায়ভুক্ত করেছে। এই দুটি হল—কয়লাজাত তেল এবং গ্যাসজাত তেল। কয়লা থেকে তেল উৎপন্ন করার প্রযুক্তি যথেষ্ট প্রচলিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি এই প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল কারণ তেলের নিয়ন্ত্রণ ছিল মিত্রশক্তির হাতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তেলের রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ায় সেদেশ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাকে আরও উন্নত করেছিল। তেলের দাম বেড়ে ব্যারেল পিছু ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার পর এই প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ আবার বাড়তে থাকে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বেশ কয়েকটি এই ধরনের বড় প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই সব প্রকল্পের মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক চার লক্ষ ব্যারেল বা বাৎসরিক দুই কোটি টন। ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এই প্রকল্পগুলি কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কয়লাকে তরলে পরিণত করার প্রথম ধাপ হল তাকে গ্যাসে পরিণত করা। আমরা দেখেছি যে কয়লাকে অপর্যাপ্ত অক্সিজেনে পোড়ালে তা কারবন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ 'সিনগ্যাসে' পরিণত হয়। দ্বিতীয় ধাপে ফিশার-ট্রপস পদ্ধতি অবলম্বন করে সিন গ্যাসকে ডিজেলে পরিণত করা হয়। বিকল্প পদ্ধতিতে সিনগ্যাসকে পেট্রোল বা ডাই-মিথাইল ইথারে (ডি এম ই) পরিণত করা যায়, যা এল পি জি-র পরিবর্তে রান্নার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অপর একটি পদ্ধতিতে এক ধাপেই কয়লা ও হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় এক কৃত্রিম অশোধিত তেল উৎপন্ন করা

যায়। এই তেল শোধন করে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি পাওয়া যায়।

প্রতি ব্যারেল কয়লাজাত অপ্রচলিত তেল উৎপাদনে সমপরিমাণ প্রচলিত তেলের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি কারবন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। এই কারবনকে পৃথক করার অতিরিক্ত খরচ বাদ দিলেও কয়লা থেকে তরলে রূপান্তরের প্রক্রিয়া যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। সবচেয়ে দক্ষ প্রকল্পের খরচ মেটাতে গেলেও তেলের দাম ব্যারেল পিছু ৬০ ডলার হতে হবে। দক্ষতা কম হলে তেলের দাম হতে হবে ব্যারেল পিছু ১০০ ডলার। এই প্রক্রিয়ায়, প্রতি ব্যারেল তেল উৎপন্ন করতে হলে ১০ ব্যারেল জল প্রয়োজন। এই পরিমাণ যথেষ্ট বেশি এবং একে যথাযথ পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে কমিয়ে ১ থেকে ২ ব্যারেলে নিয়ে আসতে হবে। একই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক গ্যাসকেও সিনগ্যাস এবং ডিজেল, পেট্রোল বা ডি এম ইতে পরিণত করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া এবং কাতারে এই ধরনের তিনটি প্রকল্প চালু আছে। আরও বেশ কয়েকটি বৃহদাকার প্রকল্প নির্মিয়মান। গ্যাস থেকে তরলে রূপান্তরের প্রকল্পের পূর্ণ সুফল পাওয়া যাবে যদি এগুলি ছোট এবং বিচ্ছিন্ন খনির গ্যাস ব্যবহার করতে পারে কারণ, পাইপলাইন এবং বাজারের অভাবে এই গ্যাসের অধকাংশই পুড়িয়ে দিতে হয়।

১১.৩ অপ্রচলিত গ্যাস ●

আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা তিন ধরনের গ্যাসকে অপ্রচলিত গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল টাইট গ্যাস, কোল বেড মিথেন এবং শেল গ্যাস। প্রচলিত গ্যাস পাওয়া যায় বেলে পাথরের মজুত ভাণ্ডার থেকে। এই পাথর সহজ প্রবেশ্য হওয়ায় গ্যাস খুব সহজেই পাথরের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে। এতে গ্যাস উৎপাদনে সুবিধা হয়, কারণ অনেকখানি এলাকার গ্যাস একটি কূপের থেকেই পাওয়া যায়। এতে খনিটির চরিত্র বুঝতেও সুবিধা হয়, কেননা একটি কূপই বিস্তৃত অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তিন ধরনের অপ্রচলিত গ্যাসই পাওয়া যায় ভিন্ন প্রকারের মজুতভাণ্ডার থেকে। এক্ষেত্রে গ্যাসের চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে প্রথামাফিক প্রযুক্তির সাহায্যে এই ধরনের গ্যাস উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তাই পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে অপ্রচলিত গ্যাসের মজুত সম্পর্কে জানা থাকলেও উৎপাদনের কোনও চেষ্টাই করা হয়নি।

গত শতকের নয়ের দশকে অবস্থাটা পাল্টে যায়। এই সময়ে, দুই ধরনের প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে, যাতে অপ্রচলিত গ্যাস উৎপাদনের খরচ কমে যায়। প্রথমটি হল আনুভূমিক কূপ-খনন, বা হরাইজন্টাল ড্রিলিং। এই পদ্ধতিতে একই উৎস থেকে বিভিন্ন দিকে যাওয়া একাধিক কূপ থেকে তেল সন্ধান বা বার করা অনেক সহজ হয়ে যায়। দ্বিতীয়

পদ্ধতির নাম হাইড্রোফ্র্যাকচারিং। এক্ষেত্রে মজুতভাণ্ডারের ভিতরে উচ্চচাপে জল আর বালি প্রবেশ করানো হয়। জলের চাপে মজুতভাণ্ডারের বন্ধ থাকা ছিদ্রের মুখ খুলে যায়। এই ছিদ্র দিয়ে গ্যাস (অথবা তেল) সহজেই প্রবাহিত হতে পারে। ১৯৯৮ সালের পর গ্যাসের দাম যখন বাড়তে থাকে, তখনই অপ্রচলিত গ্যাসের উৎস সন্ধানের আগ্রহ দেখা দেয়। ফলে প্রমাণিত মজুত এবং উৎপাদন দুইই বৃদ্ধি পায় দ্রুত। বর্তমানে, বিশ্বের মোট মজুত গ্যাসের ৪ শতাংশ হল অপ্রচলিত গ্যাস। ২০০৮ সালে বিশ্বের মোট উৎপন্ন গ্যাসের ১২ শতাংশ ছিল অপ্রচলিত গ্যাস। এর অর্ধেক আসত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং এক তৃতীয়াংশ কানাডা থেকে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী প্রচলিত গ্যাসের মোট উৎপাদনযোগ্য মজুত হল ৪০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার। অপ্রচলিত গ্যাসের মোট উৎপাদনযোগ্য মজুতের পরিমাণও প্রায় সমান। এর মধ্যে আছে ৮৪ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার টাইট গ্যাস, ১১৮ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার কোল বেড মিথেন এবং ২০৪ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার শেল গ্যাস।

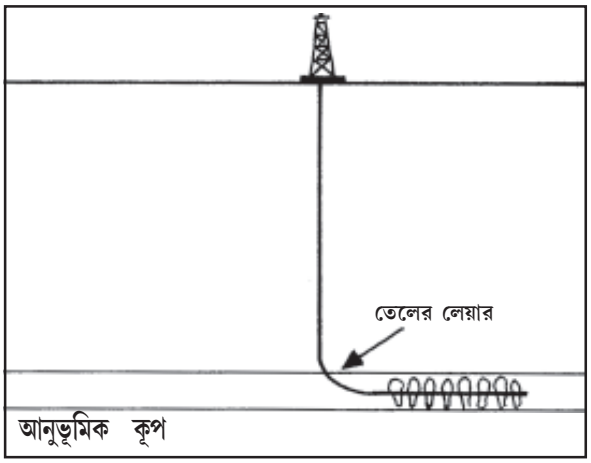

আনুভূমিক খনন। একটি খননে দীর্ঘ এলাকায় অনুসন্ধান

অপ্রচলিত গ্যাসের মজুত ভাণ্ডার বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকলেও উৎপাদন সীমিত রয়েছে মূলত উত্তর আমেরিকায়। উৎপাদন কত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে তা নির্ভর করছে বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর। মজুতভাণ্ডারের নাগাল পাওয়া এবং পাইপলাইনের সুবিধা থাকাটা জরুরি এবং জলের যথেষ্ট সরবরাহ চাই। হাইড্রোফ্র্যাকচারিং-এ কিছু রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়। তাই, জল ব্যবহারের পর তার উপযুক্ত শোধন প্রয়োজন, যাতে বর্জিত জল আশেপাশের জলভাগ এবং ভূগর্ভের জলকে দূষিত না করে। জল দূষণের অভিযোগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি জায়গায় শেল গ্যাস উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছে।

১১.৪ কোল বেড মিথেন ●

প্রাকৃতিক গ্যাস যেমন পাওয়া যায় অশোধিত তেলের সঙ্গে, তেমনই কয়লার সঙ্গেও কিছুটা প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। যে কয়লা খনিতে কয়লা তোলার কাজ শুরু হয়নি, তার মধ্যে প্রাপ্ত গ্যাসকে বলা হয় কোল বেড মিথেন (সি বি এম)। চালু কয়লাখনিতে

যে মিথেন পাওয়া যায় তাকে বলা হয় কোল মাইন মিথেন (সি. এম. এম)। মিথেন হল কয়লার উপজাত দ্রব্য। এর কিছুটা তৈরি হয় কয়লা তৈরি হওয়ার একেবারে গোড়ার দিকে। একে বলা হয় জৈবজনিত বা বায়োজেনিক মিথেন। কয়লা গঠনের শেষের দিকে যে মিথেন তৈরি হয়, তা হল তাপজনিত বা থার্মোজেনিক মিথেন। বিটুমিনাস বা অ্যান্থ্রাসাইটের মতো উচ্চমানের কয়লার গভীর মজুতভাণ্ডারে এই গ্যাস পাওয়া যায়। ভারতে লিগনাইট কয়লার সঙ্গেও সি বি এম পাওয়া যায়, তবে হতে পারে এই গ্যাস লিগনাইটের নিচের পেট্রোলিয়ম সমৃদ্ধ শিলা থেকে উঠে আসছে। সাধারণ ভাবে উচ্চমানের কয়লার গভীর মজুত ভাণ্ডার থেকেই সি বি এম পাওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি।

কয়লাখনির মালিকরা মিথেনকে বিপজ্জনক রকমের দাহ্য গ্যাস হিসেবে গণ্য করত। এই গ্যাস থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যই হামফ্রি ডেভি এক বিশেষ ধরনের নিরাপদ আলো তৈরি করেছিলেন। জ্বালানি হিসেবে মিথেনের উপযোগিতা অনুভূত হয় অনেক পরে। ১৯৮০ নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সি বি এম উৎপাদনের কাজ শুরু করে। গ্যাসের ক্রমবর্ধমান দামের জন্য এই উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উৎপাদনের হার বাড়তে বাড়তে ২০০৪ সালের মধ্যে তা বছরে ৫০০০ কোটি কিউবিক মিটারে পৌঁছায় এবং তারপর থেকে একই হারে উৎপাদন চলছে। বর্তমানে এই অপ্রচলিত গ্যাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদিত গ্যাসের ১০ শতাংশ দখল করে আছে। কানাডায় বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় ২০০৩ সালে। বর্তমানে উৎপাদনের হার বছরে ৮০০ কোটি কিউবিক মিটার। অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে ৩.৫ বি সি এম উৎপন্ন করে এবং অদূর ভবিষ্যতে সি বি এম থেকে এল এন জি উৎপাদনের পরিকল্পনাও আছে তাদের। চীন তাদের একাদশ এবং দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সি বি এম উৎপাদনকে অগ্রাধিকারে রেখেছে।

১৯৮০ নাগাদ ভারতে সি বি এম উৎপাদনের কিছু বিচ্ছিন্ন প্রয়াস নেওয়া হলেও তা সাফল্যের মুখ দেখেনি। ১৯৯৭ সালে সম্পদ বা জ্বালানি হিসেবে সি বি এমের সুসংহত উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার এক পৃথক নীতি প্রণয়ন করে। আমাদের দেশের সর্বোৎকৃষ্ট কয়লার মজুতভাণ্ডার, অর্থাৎ ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো এবং করণপুরার কয়লাখনিকে সি বি এমের জন্য সম্ভাবনাময় অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সব অঞ্চলে অনুসন্ধানের জন্য কিছু এলাকা নির্দিষ্ট করা হয় এবং এই এলাকাগুলি আন্তর্জাতিক নিলামের মাধ্যমে সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পূর্ণ বিদেশি মালিকানার অনুমতি দেওয়া হয় এবং আরও অনেক আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উদ্যোগী হয় সরকার। ইতিমধ্যে চারদফা নিলাম হয়ে গেছে। ২৬টি এলাকা বিতরণ করা হয়েছে, বাকি আছে আরও আটটি এলাকা, যা শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে। বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে অনুসন্ধানের কাজ এগোচ্ছে, এর মধ্যে তিনটি উন্নয়নমূলক স্তরে পৌঁছেছে। ভারতের প্রমাণিত মজুত ৩০০ বি সি এম । এই প্রমাণিত মজুত থেকে দৈনিক এক কোটি কিউবিক মিটার গ্যাস

উৎপন্ন হতে পারে। অথচ বাস্তবে উৎপন্ন হয় দৈনিক মাত্র এক লক্ষ কিউবিক মিটার। সি বি এম উৎপাদনে খামতির অনেকগুলি কারণ। তার মধ্যে আছে জমি অধিগ্রহণ জনিত সমস্যা, গ্যাস পরিবহন পরিকাঠামোর অভাব এবং কম চাহিদা। এছাড়া, একই কেন্দ্রে কয়লার সঙ্গে সি বি এম বা সি এম এম উৎপাদনে কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক অসুবিধাও আছে। এই সব সমস্যার মীমাংসা হতে হবে কয়লা এবং পেট্রোলিয়ম মন্ত্রকের মিলিত উদ্যোগে। মুনিডি কয়লাখনিতে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু সি এম এম উৎপন্ন হচ্ছে। এক্ষেত্রে মজুতভাণ্ডার নির্ণয় করার যথাযথ প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে আরও উন্নতির প্রয়োজন।

ভূগর্ভস্থ জমা কয়লায় সূক্ষ্ম ফাটল, অথবা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় বড় ফাটলও থাকতে পারে। এই ফাটলের মধ্যেই সি বি এম ধরা থাকে। এখানে উচ্চ চাপের মধ্যে সি বি এম থাকে, কেননা কয়লার স্তর প্রায়শই জলে নিমজ্জিত হয়। কয়লাখনিতে কূপ খনন করে তার থেকে কয়লার খণ্ড বার করে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষা থেকে জানা যায় কয়লায় কত পরিমাণ গ্যাস আছে। প্রতি টন কয়লায় ৪-৫ কিউবিক মিটার গ্যাস পাওয়া গেলে তা যথেষ্ট ভাল। সাধারণ ভাবে একটি কূপ থেকে খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হয়, আর তাই নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস পেতে হলে বহু সংখ্যক কূপ খনন করতে হয়। কয়লার স্তরে হাইড্রোফ্র্যাকচার করতে হলে যে জল ব্যবহৃত হয়, তা গ্যাসের সঙ্গে উপরে উঠে আসে। অনেক সময় কয়লার স্তর জলমুক্ত করারও প্রয়োজন হয়। উভয় ক্ষেত্রেই জলকে পরিবেশ রক্ষার আইন মেনে সতর্কতার সঙ্গে বার করতে হয়।

১১.৫ শেল তেল ও গ্যাস ●

শেল হল সব তেল ও গ্যাসের উৎস শিলা। এখানেই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে উচ্চ তাপ ও চাপে জৈব পদার্থ একটু একটু করে অশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়। একবার তৈরি হলে এই তেল বা গ্যাস শেল থেকে বেরিয়ে বেলে পাথরের মজুতভাণ্ডারে গিয়ে জমা হয়। এখান থেকেই সাধারণত আমরা এদের সন্ধান পাই। তবে কিছুটা তেল এবং গ্যাস শেলের মধ্যে থেকে যায়। এছাড়া অপরিণত শেলে 'কেরোজেন' নামে এক পদার্থ থাকে। এই কেরোজেন হল জৈবপদার্থ থেকে তেলে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার এক অন্তর্বর্তী পদার্থ। এই পদার্থ কালো ও কঠিন। আকারে ঠিক তেলের মতো নয়। খনির ভিতর থেকে বার করে এনে তপ্ত করলে এর থেকে তেল পাওয়া যায়। কেরোজেনকে বলা হয় শেল তেল। শেলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ শেল তেল এবং সামান্য পরিমাণ অশোধিত তেল থাকে। এই অশোধিত তেলকে বলা হয় 'অয়েল ইন শেল' বা 'শেলের ভিতরকার তেল' এর সঙ্গে শেলে প্রচুর গ্যাস থাকে যা প্রচলিত প্রাকৃতিক গ্যাসেরই মতো।

গত দশকে শেল গ্যাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ১৯৮০ নাগাদ শেল গ্যাসের বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি কিউবিক মিটার। নয়ের দশকে এই উৎপাদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ২০০০ সালের পরে উৎপাদনে চাঞ্চল্যকর বৃদ্ধি হয় এবং ২০০৮ সালে তা পৌঁছায় ৫০০০ কোটি কিউবিক মিটারে। এর পিছনে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির একটা বড় ভূমিকা ছিল। অন্যদিকে তেলের বর্ধিত দাম শেল তেলের সম্পর্কেও আগ্রহ বাড়ায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই তেল অনুসন্ধানের গতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তবে শেল তেল উৎপাদন কিন্তু কমই হয়েছে। ব্রাজিল এবং চীনেও সামান্য পরিমাণ শেল তেল উৎপন্ন হয়। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে শেল গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে নেতৃত্ব দেয় পোল্যান্ড।

শেল গ্যাসের দাম বেশি হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, হাইড্রোফ্র্যাকচারিং বা জলের সাহায্যে ফাটল ধরানোর প্রযুক্তি এবং তার জন্য পরিবেশের ক্ষতি সামলানোর অতিরিক্ত খরচ। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত গ্যাসের মতো শেলের মজুতভাণ্ডার তত সুসংহত নয়, অর্থাৎ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে একই পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যায় না। তাই প্রচলিত গ্যাসের অন্তত দশগুণ বেশি কূপ খনন করতে হয়। তৃতীয়ত, আনুভূমিক খনন বা হাইড্রোফ্র্যাকচারিং সত্ত্বেও মজুত পরিমাণের মাত্র ৩০ শতাংশই সংগ্রহ করা যায়। প্রচলিত গ্যাসের ক্ষেত্রে তা ৮০ শতাংশ। এই উচ্চমূল্যের জন্যই শেল গ্যাস অন্তবর্তী জ্বালানি (swing fuel) হিসেবে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ, গ্যাসের দাম বাড়লে এর উৎপাদন বাড়ে আবার দাম কমলেই উৎপাদন কমে যায়।

অসম ও অরুণাচল প্রদেশে প্রচুর শেল তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই মজুতভাণ্ডার চিহ্নিত করা এবং এর সদ্ব্যবহারের উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছে। ২০১১ সালের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে শেল গ্যাস খুঁজে পায় ও এন জি সি । সংবাদ মাধ্যম এই খবরে উল্লসিত হয়ে প্রচার করতে শুরু করে যে, এতে আমাদের শক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান হবে। এত আশাবাদী হওয়ার অবশ্য কোনও কারণ নেই। আমাদের দেশে শেল গ্যাসের মজুতভাণ্ডার খতিয়ে দেখার জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। এর থেকে উৎপাদন করতে আরও বেশি সময় চাই। ইতিমধ্যেই পরিবেশবিদরা শেল গ্যাস উৎপাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ জলের চাহিদা সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছেন। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় খতিয়ে না দেখে এই সম্পদ ব্যবহার করা উচিত হবে না।

১১.৬ গ্যাস হাইড্রেট ●

গ্যাস হাইড্রেট বা মিথেন হাইড্রেট হল বরফের মতো কেলাস (ক্রিস্টাল), যার ভিতরে মিথেন অনু রয়েছে। গোড়ার দিকে, সম্পদের বদলে সমস্যা হিসেবেই গণ্য হত

হাইড্রেট। অনেকটা কয়লাখনির মিথেনের মতো। কারণ এগুলি শীতকালে গ্যাসের পাইপের ভিতরে আটকে থেকে বাধা সৃষ্টি করত। ছয়ের দশকে চির হিমায়িত অঞ্চলে (permafrost) এবং পরে, সাতের দশকে মহাসাগরের তলদেশে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হাইড্রেটের সন্ধান মেলে। দুটি ক্ষেত্রেই উচ্চচাপ এবং প্রায় শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটি উৎপন্ন হয়। জলের নিচে হাইড্রেট পাওয়া যায় ৪৫০ মিটার বা তারও বেশি গভীরতায়। গোটা বিশ্বে যত গ্যাস হাইড্রেট আছে তার থেকে প্রায় ৫০০০ টি সি এম গ্যাস পাওয়া যেতে পারে। এটি প্রচলিত গ্যাসের অবশিষ্ট মজুতের ১০ গুণেরও বেশি। তবে, এই সম্পদের কতখানি উদ্ধার করা সম্ভব তা এখনও স্পষ্ট নয়, কারণ এ পর্যন্ত হাইড্রেট থেকে গ্যাস উৎপন্ন হয় নি।

এত বেশি গ্যাসের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে, হাইড্রেট নিয়ে একটি সুপরিকল্পিত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী আরম্ভ হয়েছে। সমুদ্র গভীরে কতখানি হাইড্রেট পাওয়া যায়, আর তার থেকে কোন প্রযুক্তিতে গ্যাস উৎপাদন করা যেতে পারে তা খতিয়ে দেখতে জাপান বেশ কয়েকটি কূপ খনন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলাস্কা অঞ্চলে ২৪০০ বি সি এম হাইড্রেট গ্যাসের প্রমাণিত মজুত পেয়েছে। আর্কটিক অঞ্চলে ১০,০০০ বি সি এম পেয়েছে কানাডা। এইসব মজুত ভাণ্ডারই রয়েছে প্রচলিত গ্যাসের মজুতের উপর। গ্যাসের সন্ধানে খোঁড়া কূপ থেকেই এই হাইড্রেটের সন্ধান পাওয়া যায়। সাইবেরিয়ার মেসোয়াখাতেও হাইড্রেটের অবস্থান প্রচলিত গ্যাসের মজুতের উপরে। প্রচলিত গ্যাসের উৎপাদন বহুদিন চালু থাকায় এখানে প্রচলিত গ্যাসের খনিতে চাপ কমে গেছে এবং গ্যাসের সঙ্গে সম্ভবত কিছুটা হাইড্রেট গ্যাসও বেরিয়ে এসেছে। মেক্সিকো উপসাগরে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, সেখানে আনুমানিক ৬০০ টি সি এম হাইড্রেট গ্যাস পাওয়া যেতে পারে।

এখনও পর্যন্ত হাইড্রেট থেকে গ্যাস উৎপাদনের কোনও পদ্ধতিই পরীক্ষা করে দেখা না হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে একটি পেটেন্ট নিয়েছে। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে তাপজনিত উদ্দীপনা বা 'থারমাল স্টিমুলেশন'। হাইড্রেটের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ প্রবেশ করালে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং বরফ গলে গ্যাস নির্গত হতে থাকে। আরও একটি পদ্ধতির কথা ভাবা হচ্ছে, যেখানে চাপ কমিয়ে গ্যাস বার করা হবে। যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক, পরিবেশ রক্ষার কথা মাথায় রাখতে হবে। বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত মিথেন নির্গমনকে যে কোনও উপায়েই আটকাতে হবে। মিথেন উৎপাদনের ফলে জলজ প্রাণীর বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। গ্যাস উৎপন্ন হলে তাকে তীরে বা কূলে নিয়ে আসতে হবে। এজন্যে নানা ধরনের পন্থা অবলম্বন করা যায়। এর মধ্যে একটি উপযোগী উপায় হল, পরিবহনের সুবিধার্থে উৎপন্ন গ্যাসকে আবার হাইড্রেটে রূপান্তরিত করা!

১৯৯৭ সালে ভারতে জাতীয় গ্যাস হাইড্রেট উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পের দায়িত্বে আছেন ডিরেক্টর জেনারেল অফ হাইড্রোকারবনস এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক

সংস্থা যারা প্রযুক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা করে। যেমন ন্যাশনাল জিওফিজিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোগ্রাফি এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশন টেকনোলজি। গোটা বিশ্বের হাইড্রেট সংক্রান্ত গবেষণার বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছেন ডিরেক্টর জেনারেল অফ হাইড্রোকারবনস। আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে ২০টি অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা হয়েছে, এবং এর মধ্যে ১১টিতে হাইড্রেটের অস্তিত্বের প্রমাণও মিলেছে। মহানদী অববাহিকা, অন্ধ্র এবং আন্দামান সংলগ্ন সমুদ্রে হাইড্রেটের মজুত যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ভারতীয় জলভূমির সম্ভাব্য সম্পদ এদেশের প্রচলিত গ্যাসের প্রমাণিত মজুতের পঞ্চাশ গুণ বেশি বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে হাইড্রেট থেকে গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে ভারত।

১১.৭ আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশন (ভূগর্ভস্থ কয়লার গ্যাসে রূপান্তর) ●

হাইড্রোজেন এবং কারবন মনোক্সাইডের মিশ্রণ হল প্রোডিউসার গ্যাস বা উৎপাদক গ্যাস। কয়লার উপর দিয়ে বাষ্প চালিয়ে এই গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। একে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি-বাড়ি সরবরাহ করে ঘর গরম করার ও রান্নার কাজে ব্যবহারও করা যায়। আমরা আগেই জেনেছি, প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার চালু হওয়ার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে 'টাউন গ্যাস' যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বাড়িতে কয়লা বয়ে নিয়ে গিয়ে পোড়ানোর বদলে টাউন গ্যাসের ব্যবহার ছিল অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। কয়লাকে যদি খনির ভিতরেই পুড়িয়ে তার থেকে গ্যাস উৎপাদন করা যায়, তা হয় আরও পরিচ্ছন্ন। একই পদ্ধতিতে কয়লা তোলা বা পরিবহন সহ অন্যান্য কারণে যে দূষণ ছড়ায় তা এড়ানো যায়। অগভীর কয়লা খনির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয়, কেননা সেক্ষেত্রে গ্যাসের দাম খনি থেকে তোলা কয়লার দামের থেকে অনেক বেশি হবে। কিন্তু গভীর কয়লা খনির বেলায় অঙ্কটা আলাদা, কারণ খনি যত গভীর হবে, তার থেকে কয়লা তোলার খরচ ততই বেশি। তাই, গ্যাসে পরিণত করলে খরচ কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ভারতে 'ওপেন কাস্ট' কয়লাখনির গভীরতা ৩০০ মিটার পর্যন্ত। ভূগর্ভস্থ বা আন্ডারগ্রাউন্ড খনির গভীরতা ৫০০-৫৫০ মিটার হলেও কয়লার স্তর আছে আরও গভীরে। এত গভীর স্তর থেকে কয়লা তোলা বাস্তবসম্মত নয়। বরং গ্যাসে পরিবর্তনের মাধ্যমেই এই সম্পদের যথার্থ সদ্ব্যবহার হতে পারে।

আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশনে (ইউ সি জি) কয়লার স্তরে একটি 'প্রবেশ কূপ' বা 'ইঞ্জেকশন ওয়েল' খনন করা হয়। এর মাধ্যমে উচ্চ তাপমাত্রার বাষ্প অথবা

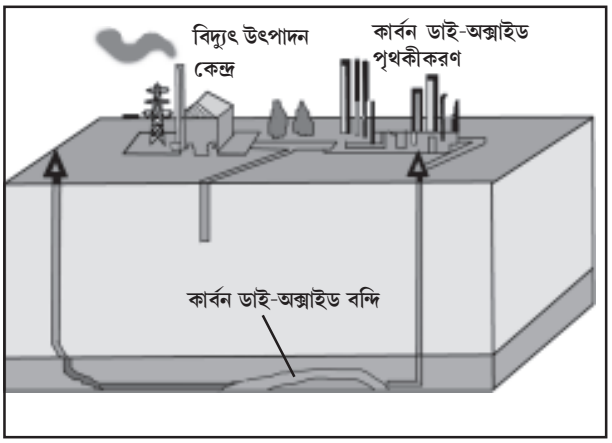

ভূগর্ভস্থ কয়লার গ্যাসে রূপান্তর

প্রোপেনের মতো দাহ্য বস্তু কয়লার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। সঙ্গে থাকে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় অক্সিজেন, যাতে পোড়ানোর কাজ শুরু করা যায়। প্রবেশ কূপের কাছাকাছি উপযুক্ত একটি জায়গায় 'উৎপাদন কূপ' বা 'প্রোডাকশান ওয়েল' খনন করা হয়। এখানে গ্যাস সংগৃহীত হয়ে ক্রমে তা মাটির উপরে উঠে আসে। এই গ্যাসই বিদ্যুৎ উৎপাদন বা মেথানলের মতো রাসায়নিক তৈরির কাজে লাগে। প্রবেশ কূপ থেকে উৎপাদন কূপ পর্যন্ত আসতে হলে গ্যাসের একটি পথ প্রয়োজন, কেননা সাধারণত কয়লার মধ্য দিয়ে গ্যাস সহজে যেতে পারে না। 'প্রবেশ কূপ'কে আনুভূমিক পথে খনন করলে তা 'উৎপাদন কূপ'-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। অথবা দুটি কূপের মধ্যবর্তী কয়লায় বিস্ফোরকের সাহায্য ফাটল ধরানো যায়। ১৯৩০ নাগাদ এই পদ্ধতি জানা ছিল না। তখন খনির কর্মীরা কয়লার স্তরের মধ্যে গিয়ে তা কেটে দুটি কূপের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করত। একটি 'প্রবেশ কূপ'-এর সঙ্গে একাধিক 'উৎপাদন কূপ'ও তৈরি করা যেতে পারে। সব থেকে দূরে থাকা উৎপাদন কূপের কাছাকাছি দহন শুরু করা হলে, আগুনের শিখা ধীরে ধীরে 'প্রবেশ কূপ'-এর দিকে চলে যাবে এবং অন্যান্য 'উৎপাদন কূপ'গুলি তার থেকে গ্যাস সংগ্রহ করে নেবে।

এই রকম সহজ, সাদামাটা পদ্ধতিতে কি কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে? উত্তর হল হ্যাঁ, আর সবথেকে বিপজ্জনক হল ধ্বস নামার আশঙ্কা। কয়লার স্তরের উপরে সাধারণত মাটি ও পাথর থাকে। নীচে থাকা কয়লা গ্যাসে রূপান্তরিত হলে উপরে থাকা পাথরের আস্তরণ আচমকা ভেঙে পড়তে পারে। সেই কারণেই প্রথাগত ভূগর্ভস্থ খনিতে স্তম্ভাকারে কয়লা অবিকৃত রেখে দেওয়া হয়, যাতে তা উপরের স্তরকে ধরে রাখতে পারে। আরেকটি বিপদ হল, কয়লার দহনের সময় বেনজিন এবং ফেনলের মতো ক্ষতিকর রাসায়নিক তৈরি হয়। উপরের স্তরের পাথর ভেঙে পড়লে ভূগর্ভস্থ জলাধারের সঙ্গে এইসব রাসায়নিকের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে জল দূষিত হতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে ভূগর্ভস্থ কয়লার গ্যাসে রূপান্তরের সময় এই সব সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই পরীক্ষা যথেষ্ট বড়

আকারে হয়েছে। শোনা যায়, স্বয়ং লেনিন এই সম্ভাবনার বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার অনেক কয়লা খনিতেই বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উৎপন্ন হত। পরে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সম্ভবত, বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ায় তা করা হয়। উজবেকিস্তানে এই গ্যাসের বাণিজ্যিক উৎপাদন অব্যাহত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, চীন এবং ইউরোপেও পরীক্ষামূলকভাবে এই উৎপাদনের কাজ চলছে।

ভূগর্ভস্থ কয়লার গ্যাসে রূপান্তর ভারতের জন্যও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের দেশে কয়লার প্রমাণিত মজুত প্রায় ১১০০০ কোটি টন কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৫২০০ কোটি টন নিষ্কাশনযোগ্য বলে মনে করা হয়। তার মানে বর্তমানে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, তার দ্বারা বাকি ৬০০০ কোটি টন কয়লা নিষ্কাশন সম্ভব নয়। ইউ সি জির সাহায্যে এই বিপুল পরিমাণ অধরা সম্পদের অন্তত কিছুটা ব্যবহার করা যাবে। আটের দশকে গুজরাতে তেলের অনুসন্ধানের সময় কয়লার এক গভীর মজুতভাণ্ডার আবিষ্কার করে ও এন জি সি এবং পরীক্ষামূলকভাবে তার থেকে গ্যাস উৎপাদনের চেষ্টাও চালায়। ১০০০ মিটার গভীরে 'প্রবেশ কূপ'-এর মাধ্যমে গরম হাওয়া প্রবেশ করানো হয়। গত এক দশক ধরেই গ্যাসের দাম উর্ধ্বমুখী। এর ফলে গেইল, কোল ইন্ডিয়া, রিলায়েন্স সহ বিভিন্ন সংস্থা ইউ সি জি নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। রাজস্থান এবং পূর্ব ভারতে বাণিজ্যিক উৎপাদনের চেষ্টাও চালাচ্ছে গেইল।

ইউ সি জি নিয়ে যে কোনও গবেষণাকেই দুটি প্রধান সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। প্রথমত, এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন গ্যাসের দাম। ভূস্তরের অত গভীরে যে প্রক্রিয়া চলে, তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা মুস্কিল, আর সেই কারণেই দামের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। দামের হিসাব হতে হবে আরও নির্ভুল। সেই সঙ্গে উৎপাদন ক্ষেত্র বা মজুতভাণ্ডারের স্থান নির্বাচনের বিষয়েও আরও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে ধ্বস নামা বা ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ এড়ানো যায়। গ্যাসের ক্রমবর্ধমান দাম এবং পরিবেশ রক্ষার প্রয়াস, ইউ সি জির গবেষণাকে আরও অনুপ্রেরণা দেবে। ভারতীয় কয়লাতে ছাইয়ের ভাগ বেশি। সালফার অক্সাইড বা নাইট্রোজেন অক্সাইড জনিত সমস্যা ছাড়াও এই ছাই ফেলাও একটা বড় সমস্যা। ফলে ইউ সি জির প্রযুক্তি ভারতের পক্ষে আরও গ্রহণযোগ্য। কয়লার দহনের ফলে যে বড় আকারে শূন্যস্থান তৈরি হয়, তা বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে উৎপন্ন কারবন ডাই অক্সাইড মজুতের কাজে লাগানো যায়। বিদ্যুৎ প্রকল্পটি যদি খনির আশেপাশেই অবস্থিত হয়, তাহলে কারবন ডাই অক্সাইড পরিবহনের খরচ অনেক কম হয়। 'প্রবেশ কূপ'-এর সাহায্যেই কারবন ডাই অক্সাইডকে নিচে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কাজেই কারবন ডাই অক্সাইডের নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইউ সি জি একটি উপযোগী উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

১১.৮ ভূতাপীয় শক্তি ●

ভূতাপীয় শক্তির প্রমাণ পাওয়া খুব কঠিন নয়। আমাদের দেশে বহু উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে, যার জলের নানা উপকারিতার কথা কথিত। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া গোটা দেশে মোট ৩৫০টি স্থান নির্দিষ্ট করেছে, যেখান থেকে ভূতাপীয় শক্তি পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশের উষ্ণ প্রস্রবণের জলের তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অনেক দেশেই এই জলের তাপমাত্রা ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও বেশি। বহু জায়গায় এই উত্তপ্ত জল বা বাষ্প প্রবলবেগে বেরিয়ে আসে ঝরনার মতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের 'ওল্ড ফেইথফুল' উষ্ণ প্রস্রবণই সম্ভবত সব থেকে বিখ্যাত।

পৃথিবীর বাইরের স্তর, অর্থাৎ ভূত্বকেই আমাদের বসবাস। এই স্তর গড়ে ৩৫ কিলোমিটার গভীর। গভীর ভূত্বকের নিচে রয়েছে গুরুমণ্ডল বা ম্যান্টল, যার তাপমাত্রা ভূত্বকের তুলনায় অনেক বেশি। দুটি স্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রা ১১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটারে ভূত্বকের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল, এই উত্তাপের উৎস কোথায়? দুটি উৎস থেকে পাওয়া যায় এই উত্তাপ। প্রথমটি হল তেজস্ক্রিয়তা। ভূত্বকে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম এবং পোটাশিয়ামের একটি তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক আছে। এদের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় ভূত্বককে সর্বদাই উত্তপ্ত করছে। দ্বিতীয় উৎস, উষ্ণতর গুরুমণ্ডল। গুরুমণ্ডল আবার তার উত্তাপ পায় আরও উষ্ণ কেন্দ্রমণ্ডল বা কোর থেকে, এবং সংবহনের মাধ্যমে তা ভূত্বকে ছড়িয়ে দেয়।

অভ্যন্তরীণ উত্তাপের উপরে ওঠার আরও একটি বিচিত্র এবং চাঞ্চল্যকর উপায় আছে। চাপ ও তাপের প্রভাবে গুরুমণ্ডল কঠিন অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোনও জায়গায় চাপ কমে গেলেই এই উত্তপ্ত শিলা গলতে থাকে এবং ভূত্বকের কোনও একটি ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভূত্বকের নীচে রয়েছে বড় বড় ভূকম্পীয় পাত বা 'টেকটনিক প্লেট', যা অবিরাম গতিশিল। এই গতি অত্যন্ত ধীরে হলেও এর ফলে পাতগুলির প্রান্তরেখা বরাবর ঘর্ষণ এবং সংঘর্ষ চলে। একদিকে এই ঘর্ষণের ফলে ভূমিকম্প হতে পারে। অন্যদিকে, এরফলে, ভূত্বকে ছোট ছোট ফাটলের সৃষ্টি হয়, যার মধ্য দিয়ে ভিতরকার তপ্ত, গলিত শিলা বেরিয়ে আসে। একে বলে ম্যাগমা। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে যে তপ্ত, গলিত শিলাখণ্ড বা ধাতব পদার্থ বেরোয় তাকে বলে লাভা। আগ্নেয়গিরির নীচে গহ্বরেও কিছুটা ম্যাগমা জমা হয়। এই গহ্বরের নাম ম্যাগমা চেম্বার। অত্যন্ত উত্তপ্ত এই ম্যাগমা চেম্বারের তাপমাত্রা ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসও হতে পারে। ফলে, তা নিকটবর্তী শিলাকে উত্তপ্ত করে দেয়। এই উত্তপ্ত অঞ্চলের কাছাকাছি ভূগর্ভস্থ জলাধার থাকলে তা গরম হয়ে উঠবে, কিংবা বাষ্পে পরিণত হবে আর বেরিয়ে আসার পথ পাওয়া গেলে জন্ম হবে স্বাভাবিক উষ্ণ প্রস্রবনের।

এই কারণেই ভূতাপীয় শক্তির উৎস থাকে আগ্নেয়গিরি বা ভূকম্পীয় অঞ্চলের আশেপাশে। জাপানের সাম্প্রতিক ভূমিকম্প আমাদের আরও একবার মনে করিয়ে দিল যে এই দেশ প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয়গিরি মেখলার (প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ার) উপর অবস্থিত। শুধু তাই নয়, গোটা বিশ্বের জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ১০ শতাংশ রয়েছে জাপানে। তাই এই দেশ ৫০০ মেগাওয়াটেরও বেশি ভূতাপীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। আবার আইসল্যান্ডের অবস্থান মধ্য আটলান্টিক গিরিশ্রেণীর উপরে। সম্প্রতি, এখানকার আগ্নেয়গিরি থেকে ছড়িয়ে পড়া ছাই-এর জন্য গোটা ইউরোপের আকাশপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েক সপ্তাহ। আইসল্যান্ডের অধিকাংশ বিদ্যুৎই আসে ভূতাপীয় উৎস থেকে। প্রশান্ত মহাসাগর এবং ফিলিপাইন পাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ফিলিপিন্সেও বিদ্যুতের প্রধান উৎস ভূতাপ। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান অ্যানড্রিয়াস চ্যুতিরেখার (ফল্ট) কাছে যে উষ্ণ প্রস্রবণগুলি আছে সেগুলিই বিশ্বে ভূতাপীয় শক্তির বৃহত্তম উৎপাদক। এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি আবিষ্কৃত হয় ১৮৪৫ সালে। ইলিয়ট নামে এক ব্যক্তি এই অঞ্চলে ভালুক শিকার করতে গিয়ে এগুলি দেখতে পান। অনেকটা ১৮১৯ সালে এক ব্রিটিশ অফিসারের বাঘ শিকার করতে গিয়ে অজন্তার গুহাচিত্র আবিষ্কারের মতো। ১৯০৪ সালে ইতালির লারডেরেলো উপত্যকায় প্রথমবার ভূতাপীয় উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই অঞ্চল ইউরোপ এবং আফ্রিকার সীমান্তবর্তী আগ্নেয়গিরি এলাকায় অবস্থিত। ভারতের একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে আন্দামানের ব্যারেন আইল্যান্ডে। এটি ভূতাপীয় শক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অঞ্চল। কিন্তু এই জায়গাটির অবস্থান শক্তি ব্যবহারের এক্তিয়ার থেকে অনেক দূরে। হিমালয়ের জন্ম হয়েছিল ভারতীয় এবং ইউরেশিয় পাতের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে। তাই এই পবর্তশ্রেণীর নিচে রয়েছে এক সক্রিয় অঞ্চল। এখানকার লাদাখের পুগা উপত্যকা এবং হিমাচল প্রদেশের মণিকরণ অঞ্চল ভূতাপীয় শক্তিতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

ভূগর্ভ থেকে বেরনো গরম জল বা বাষ্পের তাপমাত্রার উপরেই নির্ভর করে তাকে কীভাবে ব্যবহার করা যাবে। ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি তাপমাত্রায় যথেষ্ট পরিমাণ বাষ্প বেরোলে তাকে সরাসরি টারবাইনে পাঠিয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। তাপমাত্রা কম হলেও তা থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে, যুগ্ম চক্র বা বাইনারি সাইকেলের সাহায্যে। গরম জল দিয়ে এমন একটি তরলকে উত্তপ্ত করা হয়, যার স্ফুটনাঙ্ক কম। তারপর সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চলে। জলের তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকলেও তাতে বাইনারি সাইকেল চালানো যায়। যেখানে তাপমাত্রা অথবা জল কিংবা বাষ্পের প্রবাহ টারবাইন চালাবার পক্ষে কম থাকে, সেখানে উত্তাপ সরাসরিভাবে ঘর গরম করা, শিল্প বা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করার কাজে

লাগে। ভূতাপীয় উৎস থেকে বর্তমানে ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এবং ৩০,০০০ মেগাওয়াট তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, যা ঘর গরম করা, কৃষি, মৎস চাষ, ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যায়।

১৯৭০ সালে ৭০০ মেগাওয়াট দিয়ে শুরু করে, গত ৪০ বছরে ভূতাপীয় শক্তির উৎপাদনের মাত্রা বেড়েছে বহু গুণ। এই সম্প্রসারণ ভবিষ্যতে চলবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এখন যে সব কূপ ব্যবহৃত হয়, তার কোনওটাই তিন কিলোমিটারের বেশি গভীর নয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত খনন করতে পারলে আরও বেশি উৎস আবিষ্কৃত হবে, উৎপাদনও হবে আরও বেশি। একটি কূপে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল না থাকলে, অথবা জল ফুরিয়ে গেলে, প্রবেশ কূপের সাহায্যে জল ঢুকিয়ে উৎপাদক কূপের সাহায্যে বাষ্প তুলে আনা যায়। বর্তমানে এ ধরণের বহু উষ্ণ প্রস্রবণে জল দেওয়ার কাজ হচ্ছে। ইতালির এমনই একটি কূপে জল ভরা হয় ৪০ কিলোমিটার দূর থেকে। পাইপলাইনের মাধ্যমে পৌরসভার বর্জ্য জল এখানে আসে। ভূতাপীয় শক্তি উৎপাদনে মূলধনের খরচ যথেষ্ট বেশি, কেননা এর মধ্যে খনন বা ড্রিলিং-এর খরচও ধরা থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবে এই শক্তি বেশ খরচসাপেক্ষ। প্রতি মেগাওয়াটের উৎপাদনের খরচ ১৫ লক্ষ ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

ভূতাপীয় শক্তি ব্যবহারের এক চমকপ্রদ উপায় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কী সে উপায়? 'তাপ শোষণকারী পাম্প' বা 'হিট পাম্প'-এর সাহায্যে ঘর-বাড়িকে উষ্ণ বা শীতল রাখা। ভূপৃষ্ঠের ৪ বা ৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খুঁড়লে দেখা যাবে সেখানকার তাপমাত্রা সারা বছর ধরেই একই রকম থাকে। নয়াদিল্লির আশেপাশে এই তাপমাত্রা থাকে ২৫-২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। বাড়ির নিচে দিয়ে ৪-৫ মিটার গভীর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তার মধ্য দিয়ে বাতাস চালালে, তার তাপমাত্রাও হবে এইরকমই। গ্রীষ্মকালে যখন বাইরের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি থাকবে, তখন এই বাতাস ঘরকে ঠাণ্ডা করবে আর ১০ ডিগ্রি বা তার কম তাপমাত্রার শীতকালে ঘরকে গরম রাখতে পারবে। বাতাসের প্রবাহ চালু রাখার জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন। তবে যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সাবেক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের তুলনায় খরচ কম হবে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১০ লক্ষেরও বেশি বাড়িতে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

পুগা এবং মণিকরণ ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের তত্ত্বপানি এলাকা, গুজরাতের ক্যাম্বে, পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর, অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরি এবং মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিকে ভূতাপীয় শক্তি উৎপাদনে সম্ভাবনাময় বলে মনে করা হচ্ছে। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়। মোট উৎপাদনের মাত্রা ১০,০০০ মেগাওয়াট বলে হিসাব করা হচ্ছে।

১৯৭০ নাগাদ তেলের দাম উর্ধ্বমুখী হওয়ায় ভারতে ভূতাপীয় শক্তি নিয়ে প্রচুর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখা দেয়। কিন্তু, তার পরবর্তী পর্যায়ে এই উৎস নিয়ে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। জি এস আই মণিকরণে পাঁচ কিলোওয়াটের এক পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালায়। তত্ত্বপানিতে তিন কিলোওয়াটের এক প্রকল্পের পরিকল্পনা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি এই অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। খবরে প্রকাশ, ভূতাপীয় শক্তিক্ষেত্রকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার এক বিশেষ প্রকল্প তৈরি করছে। শিল্পমহল এতে উৎসাহিত হচ্ছে বলেও মনে হচ্ছে। থারম্যাক্স সংস্থা আইসল্যান্ডের এক সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে লাদাখে তিন মেগাওয়াটের এক উৎপাদনকেন্দ্র এবং রত্নগিরিতে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করতে চলেছে। টাটা পাওয়ার গুজরাতে পাঁচ মেগাওয়াটের এক প্রকল্প চালু করার কথা বলেছে। এভিন এনার্জিরও একই পরিকল্পনা রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে ২৫ মেগাওয়াটের এক উৎপাদনকেন্দ্র খোলার কথা ভাবা হচ্ছে।

১১.৯ বর্জ্য পদার্থ থেকে শক্তি ●

আমরা চলতিকথায় যাকে বর্জ্য পদার্থ বলি— অর্থাৎ শস্য বা সবজির অবশিষ্টাংশ, পুরসভার জঞ্জাল বা কলকারখানার বর্জ্য ইত্যাদি—সেগুলির সবটাই কিন্তু পরিত্যাজ্য নয়। জঞ্জালের মধ্যে ধাতু, কাচ বা প্লাস্টিকের যে অংশবিশেষ থাকে, তা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য। কাগজ, কাপড়, সবজির খোসা, জৈবিক বর্জ্য ইত্যাদিকে সহজেই পচিয়ে মূল্যবান সার হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনার থেকেও তৈরি করা যায় সার। শুকনো জঞ্জালকে উপযুক্ত চুল্লিতে পুড়িয়ে তার থেকে তাপ উৎপাদন করে নানাভাবে তার সদ্ব্যবহার সম্ভব। বর্জ্যপদার্থের জৈবিক অবক্ষয়ের ফলে উৎপন্ন মিথেন গ্যাসকে সংগ্রহ করে তাকে কাজে লাগিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ভারতে এইসব প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় প্রকল্পও গঠিত হয়েছে।

যত বড় শহর, ততই বেশি তার জঞ্জাল। শুধু তাই নয়, সেই জঞ্জাল সংগ্রহ এবং তার নিষ্কাশন ব্যবস্থাও বড় শহরের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুপরিকল্পিত। তাই জঞ্জাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জাতীয় বৃহৎ পরিকল্পনা বা 'মাস্টার প্ল্যান'-এর মূল লক্ষ্যই হল দেশের বৃহৎ শহরগুলি। আমাদের দেশের ২৯৯টি প্রথম শ্রেণীর শহরে মাথাপিছু উৎপাদিত জঞ্জালের পরিমাণ দৈনিক ৫০০ গ্রাম। উন্নত দেশগুলির তুলনায় এই পরিমাণ নেহাতই নগণ্য। আমাদের দেশের যে কোনও শহর ঘুরে দেখলে অবশ্য অন্য কথা মনে হবে। কিন্তু তার কারণ আলাদা--রাস্তার ধারেই জঞ্জাল পড়ে থাকে অনেকদিন। এই

জঞ্জালের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতাও কম। নিকাশি ব্যবস্থার আরও একটি ত্রুটি হল, জঞ্জাল সংগ্রহের সময়ে তাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয় না।

ভারতের মাত্র ১৭টি শহরে দৈনিক ১০০০ টনেরও বেশি এবং ৮০টি শহরে দৈনিক ১৫০ থেকে ১০০০ টন কঠিন বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। গোটা দেশে এক বছরে উৎপন্ন তিন কোটি টন পৌর কঠিন জঞ্জালের প্রায় অর্ধেকই আসে এই শহরগুলি থেকে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী এই জঞ্জাল থেকে ১৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। এরজন্য তিন ধরনের প্রযুক্তি অবলম্বন করা যায়—বায়োমিথেনেশন, গ্যাসিফিকেশন এবং ইনসিনারেশন। তবে দৈনিক ১০০০ টন বা তার বেশি জঞ্জালের ক্ষেত্রেই এইসব প্রযুক্তি ব্যবহারযোগ্য। দৈনিক ১৫০ টনের কম জঞ্জাল উৎপন্ন হলে কোনও প্রযুক্তিই কাজে লাগে না।

বায়োমিথেনেশন হল সেই অক্সিজেন বিহীন পাচনক্রিয়া, যার কথা আমরা আগেই পড়েছি। বর্জ্য পদার্থের জৈবিক অংশগুলিকে পাচক যন্ত্রে দিয়ে তার জৈবিক অবক্ষয় করানো হয় ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতিতে, যার থেকে উৎপন্ন হয় মিথেন। এই পাচকযন্ত্রগুলিকে বিপুল পরিমাণ জঞ্জাল ধারণ করার উপযুক্ত বড় এবং অসমপ্রকৃতির বস্তুকে কাজে লাগানোর মতো দক্ষ হতে হবে। পাচক থেকে যে জৈব গ্যাস উৎপন্ন হয় তা মিথেনে সমৃদ্ধ। তারপর যে পাঁক বা কাদা বেরোয় তা সার হিসেবে অত্যন্ত উপযোগী। গ্যাসিফিকেশনের জন্য জৈব জঞ্জালকে অপর্যাপ্ত অক্সিজেনে পুড়িয়ে তার থেকে গ্যাসের এক মিশ্রণ উৎপন্ন করা হয়। এর ৪০ শতাংশ হল সিনগ্যাস যা টারবাইনে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ইনসিনারেশন হয় প্রায় ৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। কয়েকটি ইনসিনারেটরে জঞ্জালকে অবিকৃত অবস্থাতেই দিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য যন্ত্রে জঞ্জাল শুকনো করে ছোট ছোট পেলেটের আকারে ব্যবহার করা হয়। এই জঞ্জালের মন্ডের সঙ্গে দেওয়া হয় কাঠ বা কয়লা। এর থেকে উৎপন্ন বাষ্প দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

পুরসভার এই জঞ্জাল শক্তির উৎস হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ২০১৭ সালের মধ্যে এর থেকে ৫০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম কয়েকটি প্রকল্প সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি কারণ, জঞ্জালের পরিমাণ এবং ক্ষমতা যেমন কম ছিল, তেমনই ছিল পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি। দিল্লির ওখলা ইনসিনারেশন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের আপত্তির কারণে কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্জ্য থেকে বিদ্যুতের কর্মসূচীও কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে এবং বর্তমানে মাত্র পাঁচটি নতুন প্রকল্পকে ছাড়পত্র দেওয়ার

নির্দেশ দিয়েছে সরকারকে। এই পাঁচ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাই এই কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সাহায্য করবে।

এইসব প্রকল্পের প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তাই উৎপাদনকেন্দ্রগুলি যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। বায়োমিথেনেশন এবং গ্যাসিফিকেশনে প্রতি মেগাওয়াটের খরচ ৮-৯ কোটি টাকা এবং ইনসিনারেশনে তা ৬-৭ কোটি টাকা। তুলনামূলকভাবে, কয়লাচালিত প্রকল্পের খরচ প্রতি মেগাওয়াট ৪.৫-৫ কোটি টাকা। ইনসিনারেশন অপেক্ষাকৃত কম খরচের বলে বেশিরভাগ শহরই এই প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। তবে ইনসিনারেশনের বিপদ হল, জঞ্জালকে ঠিকমতো বাছাই না করলে এর থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হবে। উন্নত দেশে এইধরনের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যথেষ্ট বেশি। মানুষের উদ্বেগ এবং বিপদের আশঙ্কা দূর করতে ফিল্টারের সাহায্যে গ্যাস পরিশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষকে সস্তায় বিদ্যুতের সুবিধাও দেওয়া হয়েছে।

পুরসভার তরল জঞ্জাল অর্থাৎ নর্দমার জল ইত্যাদি জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ এবং মিথেনের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তরল বর্জ্যের ক্ষেত্রে গ্যাসিফিকেশন বা ইনসিনারেশনের প্রযুক্তি অবলম্বন করা যাবে না। সম্ভব কেবল বায়োমিথেনেশন। দিল্লি, চেন্নাই এবং সুরাটে চারটি প্রকল্প গড়ে উঠেছে, যেখানে তরল জঞ্জাল থেকে উৎপন্ন জৈব গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এই প্রকল্পগুলি ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। তবে কঠিন বর্জ্যের তুলনায় তরল বর্জ্যের উৎপাদন সম্ভাবনা কম। অনুমান, এই উৎস থেকে প্রায় ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে।

কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ থেকে আরও বেশি শক্তি উৎপাদন সম্ভব। ২০১৭ সালের মধ্যে ওখান থেকে প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে। মদের কারখানা, চিনিকল বা মাড় উৎপাদনকারী কারখানাগুলি হল প্রধান সম্ভাব্য উৎস। ডেয়ারি, কাগজ কারখানা, পোলট্রি এবং কষাইখানা থেকেও উৎস সন্ধান করা যেতে পারে। ভারত সরকার বেশ কয়েকটি শিল্পকেন্দ্রেকে তাদের বর্জ্য পদার্থ ব্যবহারের কাজে সাহায্য করেছে। গুজরাতের একটি মদের কারখানায় জৈবগ্যাস থেকে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এছাড়াও বাষ্প উৎপাদন করে তারা তাদের তাপের প্রয়োজন মেটায়। তামিলনাড়ুর একটি কাগজের কারখানা প্রতিদিন ১২০০০ কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপাদন করে এবং ১২ কিলোলিটার জ্বালানি তেলের পরিবর্তে এই গ্যাসকে কাজে লাগায়। ভুট্টা এবং ট্যাপিওকা থেকে মাড় প্রস্তুতকারী অন্ধ্রপ্রদেশের এক কারখানা ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রিডের মাধ্যমে পরিবহণও করে। মোট ৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে ২০১০-১১ সালে।

১১.১০ সাগরজাত শক্তি ●

সমুদ্রের জলে মানুষের পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। নতুন পথের সন্ধান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র আমাদের আরও অনেক কিছু দিয়েছে। সমুদ্রের জল থেকে আমরা মাছ পাই, পাই আরও নানা সামুদ্রিক প্রাণী, যা আমাদের খাদ্যতালিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার তিমি মাছের মতো সামুদ্রিক প্রাণীর তেল আমাদের জ্বালানির প্রয়োজনও মিটিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, দীর্ঘদিনের এই অন্বেষেণের পরেও সমুদ্রজাত সম্পদ আজও প্রায় অফুরান। সমুদ্রের জলে বিপুল পরিমাণ খনিজ এবং ধাতু মিশে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তা স্থলভাগের সম্পদ ভাণ্ডারের থেকেও বেশি। এই সমুদ্র আবার বহুল পরিমাণ শক্তিরও উৎস। ভূপৃষ্ঠের ৭০ শতাংশেরও বেশি অধিকার করে থাকা সমুদ্রে সূর্যালোকও পৌঁছায় যথেষ্ট বেশি। বাতাসের জোরে জলের প্রবাহ বাড়ে এবং বায়ুশক্তি পরিণত হয় তরঙ্গ শক্তিতে। স্বাভাবিকভাবেই এই শক্তি কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে অনেকদিন এবং বেশ কিছুটা অগ্রগতিও হয়েছে। তিনধরনের শক্তি হল সবথেকে সম্ভাবনাময়

- জোয়ার এবং সমুদ্রস্রোত-জাত শক্তি
- তরঙ্গ শক্তি
- মহাসাগরীয় তাপ শক্তি

১১.১১ জোয়ার এবং সমুদ্রস্রোত জাত শক্তি ●

জোয়ার জাত শক্তি দুভাবে সংগ্রহ করা যায়। সরু খাঁড়িতে জোয়ার এলে জলের স্তর উঠে যায়। সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় এটি হয়। উদাহরণ হিসেবে সুন্দরবনের কথা বলা যায়, যেখানে জলস্তর ৫ মিটার বা তার বেশিও বেড়ে যায়। নিচু বাঁধের সাহায্যে জলের বহির্মুখী প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই বহির্প্রবাহের সময়েই জলের গতিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘোরানো এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ সম্ভবপর। গোড়ার দিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বাঁধের সাহায্যেই জোয়ারজাত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হত। এইধরনের প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ফ্রান্সের লে রান্স প্রকল্প। ১৯৬০ নাগাদ গড়ে ওঠা এই প্রকল্পে ২৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হত। অন্যান্য চালু প্রকল্পগুলি ছোট মাপের। সেভের্ন নদীর মোহানায় ৮০০০ মেগাওয়াটের এক বিশাল প্রকল্প গড়ে তুলতে চেয়েছিল ব্রিটেন। ৪০ মেগাওয়াটের ২০০টি টারবাইন তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল। আনুমানিক খরচের হিসাব ১৫০০ থেকে ৩০০০ কোটি

পাউন্ড। এই বিপুল খরচ এবং পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য প্রভাবের কারণেই প্রকল্পটি শেষপর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। অন্যান্য দেশের প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও একইধরনের বাধা এসেছে। একমাত্র দক্ষিণ কোরিয়াতেই দুটি বড় প্রকল্পের কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এরমধ্যে একটির উৎপাদন ক্ষমতা ৪১২ মেগাওয়াট, এবং অপরটির ১৩২০ মেগাওয়াট। সুন্দরবনের দুর্গাদুয়ানি খাঁড়িতে প্রস্তাবিত ৩ মেগাওয়াটের প্রকল্পও ব্যয়সাপেক্ষতার কারণে বাতিল হয়েছে।

বর্তমানে বাঁধের ধারণা তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। এখন অধিকাংশ প্রকল্পই জোয়ারের স্রোতের শক্তিকে ধরতে চাইছে। সমুদ্রতলে বা তার কাছে টারবাইন বসিয়ে এই কাজ করা যায়। এগুলি অনেকটা বায়ুচালিত টারবাইনেরই মতো, কোনও স্তম্ভের উপর বসানো থাকে। জলের গভীরতা অনুযায়ী এটি দাঁড়িয়ে বা ভেসে থাকে। জলের গতি একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে উঠলেই বায়ুচালিত টারবাইনের মতোই এগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে দেয়। জলের গতির ঘনফলের অনুপাতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বায়ুচালিত টারবাইনের মতো এগুলির তত বড় হওয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা প্রবহমান জলে শক্তির ঘনত্ব অনেক বেশি। আরও একটি সুবিধাজনক দিক হল, বায়ুশক্তির তুলনায় এর উৎপাদনের পরিমাণ অনেক স্থিতিশীল এবং নিশ্চিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে বেশ কয়েকটি জোয়ার স্রোতচালিত জেনারেটর বর্তমানে কাজ করছে। মোট ৪০ মেগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্যে এইধরনের একাধিক প্রকল্পে সায় দিয়েছে স্কটল্যান্ডও। ইউরোপিয় কমিশন মোট ১০৬টি জায়গা চিহ্নিত করেছে যেখান থেকে বছরে ৪৮ টেরাওয়াট (১ টেরাওয়াট = ১,০০০,০০০ মেগাওয়াট) জোয়ারজাত বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে। গুজরাতের কচ্ছ উপসাগরে জেনারেটর বসিয়ে ৫০ মেগাওয়াট জোয়ারজাত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। আনুমানিক খরচ ৩০ লক্ষ ডলার প্রতি মেগাওয়াট।

গভীর সমুদ্র বা মহাসাগরের স্রোত সাধারণত ধীরগতির। তবে বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যবর্তী কিছু অঞ্চলে এই স্রোত শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই শক্তিকে কাজে লাগানো মুস্কিল, কেননা এর খরচ অনেক বেশী। তবে দ্বীপে বসবাসকারী মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সাধারণত বহুমূল্যই হয়। সেক্ষেত্রে এই শক্তি তাদের জন্য নতুন একটি উৎসের সন্ধান দিতে পারে।

১১.১২ তরঙ্গ শক্তি ●

গভীর সমুদ্রে বড় এবং শক্তিশালী ঢেউ বা তরঙ্গ দেখা যায়। এই তরঙ্গে যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। উপকূলের কাছে এসে এই শক্তির পরিমাণ কমে যায়। নর্থ সি-এর গভীরে

তরঙ্গ শক্তির পরিমাণ প্রায় ৭০ কিলোওয়াট প্রতি মিটার। স্কটল্যান্ড উপকূলের কাছে এটি কমে ২০-৩০ কিলোওয়াট প্রতি মিটার হয়ে যায়। এই কমে যাওয়া শক্তি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব এবং এর জন্য বেশ কয়েকটি প্রযুক্তির কথাও ভাবা হয়েছে। অসিলেটিং ওয়াটার কলাম (ও ডাবলিউ সি) প্রযুক্তিতে একটি কংক্রিটের আধারকে তরঙ্গের মুখোমুখি রাখা হয়। তরঙ্গের আঘাতে আধারের ভিতরকার বাতাস চাপে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এই সঙ্কুচিত বাতাস একটি নলের মধ্যে দিয়ে বেরোবার সময়ে টারবাইন চালায়। জল কমে গেলে বাতাস আবার আধারে ফিরে আসে এবং এই গতিতে টারবাইন আবার ঘোরে। শুনতে সহজ হলেও কার্যক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি যথেষ্ট জটিল। জাপান, ভারত এবং ব্রিটেনের উপকূলে কয়েকটি এই ধরনের প্রকল্প আছে। মোট উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ১ মেগাওয়াট। নির্মাণের খরচ যথেষ্ট বেশি কেননা আধারকে জলের প্রবল গতিকে সহ্য করার মতো শক্তিশালী হতে হয়।

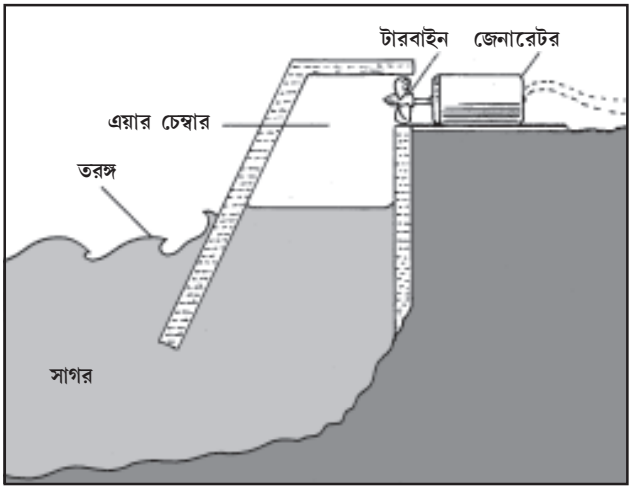

তরঙ্গ-শক্তি উৎপাদন পদ্ধতি

কয়লাচালিত প্রকল্পের তুলনায় এই খরচ দশগুণও বেশি হতে পারে। সমুদ্র গভীরের প্রকল্প আরও বেশি শক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারলেও সেক্ষেত্রে নির্মাণগত দিক থেকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত হওয়া প্রয়োজন, কেননা জলের গতি সেখানে আরও বেশি। তরঙ্গ শক্তির পরিমাণ সবসময় একরকম থাকে না। এর ফলে জেনারেটর যুক্ত করা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ করা আরও সমস্যাজনক হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও এই প্রযুক্তির মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ৫০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে।

দীর্ঘ উপকূল রেখা থাকায় ভারত তরঙ্গ শক্তি উৎপাদনে যথেষ্ট আগ্রহী। গবেষণামূলক প্রয়াস হিসাবে তিরুবনন্তপুরমের কাছে ভিজিনজ্যাম-এ ১৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এক ও ডবলিউ সি জেনারেটর বসানো হয়েছে। এখান থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে নিকটবর্তী এক লবণমুক্তকরণ (disalination) প্রকল্পের কাজ চলে, যার ক্ষমতা দিন প্রতি ১০,০০০ লিটার।

১১.১৩ মহাসাগরীয় তাপশক্তি রূপান্তর (ও টি ই সি) ●

মহাসাগরের উপরিভাগের জল সবসময়েই তার গভীরের জলের থেকে উষ্ণ। তাপকে যদি উষ্ণ থেকে শীতল অঞ্চলে প্রবাহিত করা যায়, তাহলে সেই তাপের একটি অংশকে কোনও ফলপ্রদ কাজে লাগানো সম্ভব। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে তাপমাত্রার পার্থক্য অন্তত ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে মহাসাগরীয় তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে। উষ্ণ অঞ্চলের মহাসাগরে তাপমাত্রার এই পার্থক্য দেখা যায়, যেখানে উপরিভাগের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১০০০ মিটার গভীরে তা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে।

তাপমাত্রার এই পার্থক্যকে কাজে লাগানোর সম্ভাব্য উপায় হল উপরিভাগের উষ্ণ জলকে একটি শূন্য (ভ্যাকুয়াম) আধারে বাষ্পীভূত করা এবং এই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ও জেনারেটর চালানো। সমুদ্রগভীর থেকে পাম্প করে তোলা ঠাণ্ডা জল আবার সেই বাষ্পকে জলে পরিণত করবে। এইভাবে চলবে চক্র। কাজের সুবিধার জন্য এই পুরো ব্যবস্থাকেই জলযানের উপর বসিয়ে তাকে দূরবর্তী সমুদ্রে স্থাপিত করা যেতে পারে। ঠাণ্ডা জল পাম্প করা, শূন্যতার সৃষ্টি করে গরম জলকে বাষ্পীভূত করা—এইসব কিছুর জন্য অবশ্যই প্রচুর শক্তি খরচ হবে। তাই এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হল সব চাহিদা পূরণ করার পরেও কিছু নিট শক্তি উৎপাদন করা। প্রথম ও টি ই সি প্রকল্পটি তৈরি হয় ১৯৩০ সালে। জলযানে প্রতিষ্ঠিত এই প্রকল্পে ২২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলেও কোনও নিট শক্তি উৎপন্ন হয়নি। বস্তুত, বহু প্রচেষ্টার পর সাতের দশকে একটি প্রকল্প থেকে এই কাজ সম্পন্ন হয়। এইভাবে উৎপন্ন বিদ্যুতের দাম এখনও যথেষ্ট বেশি। উপকূল পর্যন্ত পরিবহনের খরচও বেশি। ফলে দ্বীপ অঞ্চলের উপকূলে এই প্রকল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

ভারতের নিজস্ব অর্থনৈতিক অঞ্চলে (এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন) ও টি ই সি-র সম্ভাব্য হিসাব ২০০,০০০ মেগাওয়াট। স্বভাবতই, ভারতে এ ব্যাপারে বিশদ গবেষণা চলছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনও অত্যন্ত ব্যয়সপেক্ষ, তবে, এই প্রযুক্তিকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদনেই ব্যবহার করতে হবে, এমন কোনও মানে নেই। সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করার কাজেও একে ব্যবহার করা যায়। বাষ্পীভূত হওয়ার পরে সমুদ্রজল লবণমুক্ত হয়ে যায়। আমরা দৈনিক ১০০,০০০ লিটারের প্রকল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম আর বর্তমানে দৈনিক ১০ লক্ষ লিটারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের খুব কাছাকাছি রয়েছি। লাক্ষাদ্বীপ এর কাভারাত্তি সহ সবকটি প্রকল্পই এখন ডিজেলে চলে। ভবিষ্যতে ও টি ই সি থেকে প্রাপ্ত শক্তি দিয়েই এগুলি স্বনির্ভরভাবে চলতে পারে। মজার ব্যাপার হল,

মিষ্টি জল সমুদ্রের জলের উপর ভাসে এবং তাকে জলযান থেকে উপকূলে আনা বিশেষ সমস্যাজনক নয়।

ও টি ই সি প্রযুক্তিকে বৃহদাকারে ব্যবহার করতে হলে এর খরচ কমা প্রয়োজন। এর জন্য লবণমুক্তির মতো পাশ্ববর্তী সুবিধা অনেক সাহায্য করতে পারে। লবণমুক্ত জল উৎপাদন, গভীর সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার ইত্যাদি করা যেতে পারে। এই জল পুষ্টিগুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, তাই এতে মৎস্যচাষও করা যায়। তবে পরিবেশগত সুরক্ষার দিকগুলি বিবেচনা করা দরকার, কারণ সমুদ্র গভীরের জল উপরিভাগে আনার কাজে জলে দ্রবীভূত কারবন ডাই অক্সাইড নির্গত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। ■

চতুর্থ ভাগ শক্তি ব্যবহারের সমস্যা

- শক্তি ও বিশ্ব উষ্ণায়ন
- শক্তি নিরাপত্তার অর্থ

দ্বাদশ অধ্যায় শক্তি ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

১২.১ বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যা ●

জলবায়ু (ক্লাইমেট) হল গড়পড়তা আবহাওয়া (ওয়েদার) যা ধীরে হলেও সর্বদাই পরিবর্তনশীল। গত ১০ লক্ষ বছরে পৃথিবী একাধিকবার বরফের চাদরে ঢেকে গেছে। এই তুষার যুগগুলির অর্ন্তবর্তী সময়ে তাপমাত্রা বেড়েছে এবং হিমবাহও গলেছে। শেষবার এই ঘটনা ঘটেছিল ২০,০০০ বছর আগে। একমাত্র মেরু অঞ্চল ছাড়া ১০, ০০০ বছরে বরফ গলেছে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে এবং তা চলেছে ১৭৫০ সাল পর্যন্ত। এই নির্দিষ্ট বছরে প্রাক-শিল্প যুগের অবসান ঘটে। তারপর থেকেই পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে শুরু করে। ১৯০০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিংশ শতাব্দীর গড় তাপমাত্রা ১৮ শতাব্দীর তুলনায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। ১৯০০ থেকে ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫০ থেকে ২০০০ সালে তাপমাত্রা বাড়ার হার প্রায় ১০ গুণ বেশি। ১৮৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে উষ্ণ ১১টি বছর এসেছে ১৯৯৫ সালের পরে।

০.৬ বা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস সংখ্যা হিসাবে আমাদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও গড় তাপমাত্রায় এই পরিমাণ পরিবর্তন যথেষ্ট বেশি এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এতটাই, যে এর কিছু ভয়াবহ প্রভাব আছে। তাপমাত্রা বাড়ার ফলে হিমশৈল গলছে এবং জলের তাপীয় প্রসারণ হচ্ছে। সেই কারণেই বাড়ছে সমুদ্রের জলস্তর। ছয়ের দশকে এই বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ১.৮ মিলিমিটার। নয়ের দশকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩.১ মিলিমিটার প্রতিবছর। ফলে দ্বীপ এবং উপকূলবর্তী বিস্তৃত এলাকা জলের তলায় চলে গেছে, বিপন্ন হয়েছে জনবসতি। এরসঙ্গে জলের আবর্তন, লবণের অনুপাত এবং অক্সিজেনের পরিমাণেও তারতম্য ঘটেছে আর তাতে বিপন্ন হয়েছে বহু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব। কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়লেও খরাকবলিত হয়েছে বিস্তৃত অঞ্চল। কীটপতঙ্গ বাহিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে। শুধু তাই নয়, ক্রান্তীয় সাইক্লোনের উপদ্রবও বেড়েছে।

লিপ ইয়ার ●

বছরের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার পরিবর্তনে আমরা অভ্যস্ত। জানুয়ারি মাসে ঠাণ্ডা থাকবে, জুন মাসে গরম—এসবই আমাদের জানা। কিন্তু আগস্ট মাসের মতো বৃষ্টি যদি ডিসেম্বরে হয়, তাহলে আমরা অবাক হব। অপরদিকে এই বছরের আবহাওয়া মোটামুটিভাবে গত বছরের মতো থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলেই আমরা বিরক্ত হই। যেহেতু সৌর তাপই আবহাওয়ার মূল নির্ধারক এবং বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে (ধরা যাক মে মাস) সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব একই থাকে, তাই এইধরনের প্রত্যাশা যথেষ্ট স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বছরের সংজ্ঞা একটি সমস্যা সৃষ্টি করে। সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে এক বছরের একটু বেশী, ৩৬৫ দিন এবং এক দিনের এক চতুর্থাংশ। কাজেই ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি পৃথিবীর অবস্থান ২০১১ সালের ১ জানুয়ারির তুলনায় এক দিনের এক চতুর্থাংশ পিছনে ছিল। আবার ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারির তুলনায় তা ছিল এক দিনের তিন চতুর্থাংশ পিছনে। ৭২০ বছর পরে এই অবস্থান ১৮০ দিন পিছিয়ে যাবে। সুতরাং ২৭২৯ সালের ১ জানুয়ারি হবে তপ্ত একটি গ্রীষ্মের দিন! আবহাওয়ার এই বিধ্বংসী পরিবর্তনকে রুখতে আমরা প্রতি চার বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসে একটি দিন যোগ করে তাকে অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার হিসেবে চিহ্নিত করি। ২০১২ হল অধিবর্ষ, তাই ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি পৃথিবীর অবস্থান ঠিক সেইখানেই থাকবে যেখানে ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারিতে ছিল। কিন্তু সমস্যা হল আবহাওয়ার উপর মানুষের সব ধরনের প্রভাবই অত সহজে মুছে ফেলা যায় না।

তাপমাত্রায় এতখানি পরিবর্তনের কারণ কী? সূর্য থেকে আসা উত্তাপের পরিবর্তন হয় চক্রাকারে। এরমধ্যে ১১ বছরের চক্রই হল সব থেকে বেশি পরিচিত। কিন্তু তাহলেও দীর্ঘ সময় ধরলে গড় তাপমাত্রা একই থাকে। পৃথিবীর কক্ষপথে সামান্য পরিবর্তন হলেও গড় তাপমাত্রা বদলায়, কিন্তু তা এই পরিমাণে নয়। এই পরিবর্তনের কারণ হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জমা হওয়া গ্রিনহাউজ গ্যাস। গ্রিনহাউজ গ্যাসের মধ্যে কারবন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ—যা সৌর বিকিরণকে আসতে দেয় কিন্তু পৃথিবী থেকে বিকীর্ণ হওয়া তাপকে বাইরে যেতে দেয় না। এর ফলে পৃথিবী অনেক দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বায়ুমণ্ডলে এইসব গ্যাসের পরিমাণ যত বাড়বে, ততই দ্রুত উত্তপ্ত হবে পৃথিবী। একেই বলা হয় 'গ্রিনহাউজ এফেক্ট' অর্থাৎ গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাব। প্রাক-শিল্প যুগে এইসব গ্যাসের স্তরে খুব সামান্য পরিবর্তন হত। ১৭৫০ সাল পর্যন্ত কয়েক হাজার বছর ধরে কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ছিল প্রতি ১০

লক্ষে ১৮০ অংশ থেকে ৩০০ অংশ (পি পি এম)। কিন্তু বর্তমানে এই প্রায়-ভারসাম্যের অবস্থা আর নেই। গত ২৫০ বছরের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা এখন ৩৮০ পিপিএম। শিল্পায়ন মানেই শক্তির বর্ধিত ব্যবহার, আর তা হয়েছে জীবাশ্ম-জাত জ্বালানি পুড়িয়ে। কয়লা, পেট্রোলিয়ম বা গ্যাস পোড়ানোর ফলে বাতাসে কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়েছে।

জলবায়ুতে গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাব নিয়ে গবেষণা চলছে সেই ১৭ শতাব্দী থেকেই। ১৮ এবং ১৯ শতাব্দীতে জলবায়ুর বিভিন্ন পরিবর্তনশীল উপাদান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরমধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাপমাত্রা। বিশিষ্ট ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জন ডলটন ১৭৮৭ থেকে দীর্ঘ ৫৭ বছর ধরে তাপমাত্রার পরিমাণের তথ্য রেখেছিলেন। এই তথ্য রাখা ছিল তাঁর মৃত্যুর বছর ১৮৪৪ পর্যন্ত। তিনিই প্রথম পদার্থের পারমাণবিক তত্ত্বের কথা বলেন। সেই তত্ত্ব কোনও নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব নয়, সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। এই তত্ত্বের মাধ্যমেই তিনি বুঝিয়েছিলেন কেন মৌলিক পদার্থগুলি কোন এক নির্দিষ্ট অনুপাতেই যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ গঠন করে। কেন ১২ গ্রাম কারবন ১৬ অথবা ৩২ গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারবন মনোক্সাইড বা কারবন-ডাই-অক্সাইড গঠন করে। শুধু তাই নয়, তিনি আংশিক চাপের সূত্রও আবিষ্কার করেন, যার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়।

১৮৫০ নাগাদ, সুপরিকল্পিত এবং বৃহত্তরভাবে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, হাওয়ার গতিবেগ এবং আর্দ্রতার পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা চালু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর কাজ শুরু করে ১৮৮৯ সালে। বাতাসে কারবন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের পর্যবেক্ষণ শুরু হয় ১৯৫০-এর পরে। এরপরেই আসে গ্রিনহাউজ গ্যাস পর্যবেক্ষণের পালা। ১৯৫০ সালের আগে কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা নির্ধারিত হত পরোক্ষ উপায়ে, বিভিন্ন সময়ে গঠিত বরফের মধ্যে আটকে পড়া বাতাসের বিশ্লেষণ করে। গাছের গুঁড়িতে থাকা চক্র বা প্রবাল প্রাচীরের থেকে জানা যায়, এগুলি যখন তৈরি হয়েছিল তখন বাতাসে কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কতখানি ছিল। তাপমাত্রার সঙ্গে কারবন-ডাই-অক্সাইডের সম্পর্ক নির্ধারণের গাণিতিক যোগসূত্র তৈরি হয় চারের দশকে। তবে এগুলি কতটা সঠিক তা বিচার করার মতো যথেষ্ট তথ্য নয়ের দশকের আগে পাওয়া যায়নি। ১৯৮৮ সালে ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন এবং ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম যৌথভাবে আই পি সি সি (ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) গঠন করে। আবহাওয়ার পরিবর্তন

সংক্রান্ত গবেষণা এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার মূল্যায়ন করাই ছিল এই সংগঠনের দায়িত্ব। আই পি সি সি এ ব্যাপারে একাধিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টগুলি একদিকে যেমন গবেষণার কাজে উৎসাহ দিয়েছে, তেমনই সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রয়াসের ভিত্তিও স্থাপন করেছে।

বায়ুমণ্ডলে কারবনের মাত্রা বদলায় নানা প্রাকৃতিক কারণে। সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে উদ্ভিদ কারবন-ডাই-অক্সাইডকে জটিল কর্বোহাইড্রেটে পরিণত করে। এই অণুগুলি উদ্ভিদ এবং গাছের মধ্যে ততদিন আটকে থাকে যতদিন না তাকে পচানো বা পোড়ানো হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বসন থেকে অথবা তাদের মৃত্যুর পর দেহে পচন ঘটলে বাতাসে কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। সমুদ্র বা মহাসাগরের মধ্যে রয়েছে কারবন-ডাই-অক্সাইডের বিশাল মজুতভাণ্ডার। উপরিভাগের জলস্তর কারবন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং সেই জল সমুদ্রগভীরে, তলদেশ পর্যন্ত গিয়ে কারবন- ডাই-অক্সাইডের সঞ্চয় গড়ে তোলে। সমুদ্র থেকেও কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, বিশেষ করে জল যখন উষ্ণ থাকে। বায়ুমণ্ডলের ভিতরে ও বাইরের এই প্রবাহ অত্যন্ত বৃহৎ হলেও তা যথেষ্ট সুষম। গত ২৫০ বছরে কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা প্রাকৃতিক কারণে বাড়েনি। এর কারণ জীবাশ্ম জ্বালানির দহন, বনভূমি ধ্বংস হওয়া এবং কৃষি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পরিবেশের উপর তার প্রভাব রুখতে হলে মানুষের দ্বারা কারবন নির্গমণ নিয়ন্ত্রন করতেই হবে।

আই পি সি সি-র যুক্তি অনুযায়ী, প্রাক-শিল্প যুগের থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যাতে না বাড়ে, তা নিশ্চিত করতে হলে কারবন ও অন্যান্য গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন কমাতেই হবে। এই নির্ধারিত ২ ডিগ্রির বৃদ্ধির ফলেও খরা হতে পারে, বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা অনেক উপকূলবর্তী অঞ্চলের। কিন্তু তাও, মোটামুটিভাবে বড়সড় দুর্যোগ এড়ানো যাবে। এরজন্য বায়ুমণ্ডলে কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৪৫০ পি পি এম-এ সীমিত রাখা প্রয়োজন। যাঁরা মনে করেন এই মাত্রা অর্জন করা অসম্ভব, তাঁরা ৫৫০ পিপিএম-এর কথা বলেন। বর্তমানে কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৩৮০ পি পি এম, আর আমরা প্রতিবছর ২ পি পি এম বৃদ্ধি করছি—এই দুটি তথ্য মাথায় রাখলে সহজেই বোঝা যায় যে উপরের দুটি লক্ষ্যমাত্রার যে কোনও একটি অর্জন করতে হলে আমাদের অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আই পি সি সি-র হিসাব অনুযায়ী কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৪৫০ পি পি এম-এ স্থিতিশীল রাখতে হলে, ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে নির্গমনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে, ২০৫০ সালের মধ্যে তা ৫০ থেকে ৮৫ শতাংশ কমানো প্রয়োজন। তারপর ২১০০ সালের মধ্যে তা পৌঁছাতে হবে শূন্যতে। আই পি সি সি আমাদের জন্য এই লক্ষ্যমাত্রাই ধার্য করেছে।

১২.২ ব্যর্থতার দণ্ড ●

এই লক্ষ্যমাত্রা যদি আমরা অর্জন করতে না পারি, তাহলে কী হবে? স্থিতিশীলতার মাত্রা ৫৫০ পি পি এম বা তার বেশিতে থাকলে তাপমাত্রা বাড়বে (প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায়) ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি বা তারও বেশি। নির্গমনের বর্তমান মাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি এবং এই শতকের শেষে ৫ থেকে ৬ ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। তাপমাত্রায় ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি হলে তার ফলাফল সম্পর্কে একটা আগাম ধারণা তৈরি করা আছে। কিন্তু তার বেশি হলে নানাধরনের অনির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটবে, যার পূর্বাভাস দেওয়াও কঠিন।

পৃথিবীর উপরিভাগ যত গরম হবে, তত বেশি জল বাষ্পীভূত হবে। উষ্ণ বাতাস আরও বেশি জলীয় বাষ্প বহন করতে পারবে। ফলে বেশি বৃষ্টিপাত হবে। আবার বহু এলাকা বাষ্প হারাবেও। তাই কিছু জায়গায় অধিক বৃষ্টিপাত হবে। শুকনো এলাকাগুলি আরও শুকনো হবে। এমনিতেই আমাদের স্থলভাগের ১০ শতাংশ অঞ্চল যে কোনও সময়েই খরা কবলিত হয়ে যায়। তাপমাত্রায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি হলে তা বেড়ে ৪০ শতাংশও হতে পারে। জলকষ্টে ভুগবে ১০০ থেকে ৪০০ কোটি মানুষ।

ভারতের প্রায় ৫০ কোটি, চীনের ২৫ কোটি এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েক কোটি মানুষ গ্রীষ্মকালে জলের জন্য হিমালয়, হিন্দুকুশ বা অ্যান্ডিজ-এর হিমবাহ থেকে পাওয়া জলের উপর নির্ভর করে। এই হিমবাহগুলি গলতে শুরু করেছে। গত ৩০ বছরে অ্যান্ডিজ-এর হিমবাহের এলাকা ২৫ শতাংশ কমে গেছে। আরও উষ্ণতার ফলে জলের প্রবাহ উদ্বেগজনকভাবে কমে যাবে।

উচ্চতর অক্ষাংশে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃষ্টিপাতের মাত্রা বাড়বে। কিন্তু বৃষ্টিমুখর দিনের সংখ্যা কমবে। সিক্ত মরসুম হবে আরও সিক্ত, আবার শুকনো মরসুমের শুষ্কতা বৃদ্ধি পাবে। বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে ভারী বৃষ্টিপাত সোজা সাগর অভিমুখে চলে যাবে। শুষ্ক মরসুমে জলের অভাব পূরণে কোনও কাজেই লাগবে না।

প্রাপ্ত জলের ৭০ শতাংশই ব্যবহার হয় সেচের কাজে। শিল্প ও শক্তি উৎপাদনে লাগে ২২ শতাংশ এবং গৃহস্থালির কাজে মাত্র ৮ শতাংশ। তাই জলের অভাবে কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদন সবথেকে বেশি প্রভাবিত হবে। উষ্ণ বাতাবরণ এবং কারবন-ডাই-অক্সাইডের অতিরিক্ত যোগানের ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভাল হওয়া উচিত। কিন্তু তাতে তাপ বৃদ্ধি বা জলাভাবের প্রভাব দূর হয়না। ক্রান্তীয় অঞ্চলে তাপমাত্রার সামান্য বৃদ্ধি হলেও খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। ইউরোপ বা মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের মতো ঠাণ্ডা অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে। শুধু তাই নয়, কৃষির আওতায় আসবে আরও নতুন অঞ্চল। বর্তমানে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ অনাহার ও অপুষ্টির শিকার। তাপমাত্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বৃদ্ধি হলে ক্রান্তীয় অঞ্চলের আরও ২০ কোটি মানুষ এই দুর্দশার সম্মুখীন হবে। ভারতের মতো দেশে বর্ষাকাল অনিয়মিত হয়ে পড়তে পারে। ফলে বর্ষাকালের উপর নির্ভরশীল ভারতীয় কৃষিও বিপন্ন হয়ে পড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের বিনা সেচের খরিফ চাষ।

বাতাসে কারবন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়লে সমুদ্রের জলে অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে। এতে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবাল বা শ্যাওলা ও অন্যান্য ভাসমান জীবাণুর ক্ষতি হলে সামন, ম্যাকারেল বা তিমির মতো বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান প্রাণীও বিপন্ন হয়ে যায়।

ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গির মতো কীটপতঙ্গবাহিত রোগ তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের উপর অত্যন্ত বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল। সাহারা মরুভূমির দক্ষিণভাগে অবস্থিত আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সহ অন্যান্য বহু এলাকায় এইসব রোগের প্রকোপ বাড়বে। তাপপ্রবাহে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে আর কমে যাবে শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যুর হার। অতিরিক্ত তাপের ফলে যেহেতু খাদ্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাই অপুষ্টিতে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন আরও ধ্বংসাত্মক এবং আরও ঘনঘন হয়ে যাওয়ার ফলে তার কারণে মৃত্যু ও মহামারীর ঘটনাও হবে অনেক বেশি।

বরফের গলনের এবং জলের তাপীয় সম্প্রসারণের ফলে সমুদ্রের জলস্তর বাড়বে। তাতে বন্যা কবলিত হবে উপকূলবর্তী অঞ্চল। বর্তমানে ২০ কোটিরও বেশি মানুষ উপকূলবর্তী সমতলে বাস করেন। ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের উচ্চতা ১ মিটার বা তারও কম। কয়েক কোটি মানুষের ঘরবাড়ি বন্যাকবলিত হয়ে পড়বে। গুরুতরভাবে বিপন্ন হবে বাংলাদেশ, ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ। কোলকাতা, মুম্বাই, টোকিও, নিউ ইয়র্ক এবং লন্ডনের মতো বহু শহরে দেখা দেবে বন্যার আশঙ্কা। প্লাবন সমভূমিতে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষকেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে।

উষ্ণায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধির ফলে বহু প্রজাতিই অবলুপ্তির পথে চলে যাবে। যতদূর সম্ভব, বিপন্ন প্রাণীরা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে। কিন্তু সবসময় তা সম্ভব নয়। তাই তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লেই স্থলভূমির ১০ শতাংশ প্রাণীর অবলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি হলেই বিপন্ন হবে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ প্রাণী এবং ৩ ডিগ্রি বাড়লে বিপন্ন হবে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ প্রাণী।

তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়লে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যেতে পারে। অথবা আমাজনের জঙ্গল শুকোতে শুরু করতে পারে। আটলান্টিক মহাসাগরের এক বিশেষ প্রবাহ বা আটলান্টিক থার্মোহেলাইন সার্কুলেশন দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। ফলে বর্ষাকালের চরিত্র হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে।

একথা স্পষ্ট, যে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উন্নয়নশীল দেশের কোটি কোটি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে তার প্রভাব ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই। সুতরাং এর ফল হবে অপুষ্টি, অনাহার, ব্যাপক হারে স্থান ত্যাগ এবং পারস্পরিক বিরোধের মতো ভয়াবহ।

১২.৩ শক্তি ব্যবহারের ফল ●

গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমনের একটি বড় কারণ হল শক্তির উৎপাদন, পরিবহন এবং ব্যবহার। ২০০৫ সালে কারবন-ডাই-অক্সাইডের শক্তি সংক্রান্ত নির্গমনের পরিমাণ ছিল ২৮ $GtCO_2$ (গিগাটন বা ১০০ কোটি টন কারবন-ডাই-অক্সাইড)। আই ই এ-র হিসাব অনুযায়ী ২০৫০ সালে আমাদের শক্তি ব্যবহারের মাত্রা ২০০৫ সালের দ্বিগুণ হবে। আমাদের শক্তি ব্যবহারের কারবন নির্ভরতা কমাবার জন্য আমরা যদি আর কিছুই না করি, তাহলে প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় গড় তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে, যা বিধিবদ্ধ সর্বাধিক ২ ডিগ্রির থেকে অনেক বেশি। ২ ডিগ্রির মধ্যে থাকতে হলে ২০৫০ সালের মধ্যে আমাদের শক্তি সংক্রান্ত নির্গমণের মাত্রা কমিয়ে ১৪ গিগাটন করতে হবে। অর্থাৎ শক্তি সরবরাহ দ্বিগুণ হলেও নির্গমণ অর্ধেক হওয়া চাই।

আমরা আগেই দেখেছি, এইধরনের যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করতে হবে :

- শক্তি সাশ্রয় বৃদ্ধি
- কারবন পৃথকীকরণ
- নতুন ও নবীকরণীয় শক্তির ব্যবহার
- পরমাণু শক্তির বিকাশ

শক্তি সংক্রান্ত নির্গমনের ৬০ শতাংশেরও বেশি হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন (কয়লা ও গ্যাস পোড়ানো) এবং পরিবহন (পেট্রোল ও ডিজেল পোড়ানো) থেকে। এরপরেই

আছে সিমেন্ট ও ইস্পাতের মতো শক্তি কেন্দ্রিক শিল্প এবং বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে তাপ ও আলোর ব্যবহার। শক্তি সাশ্রয়ের প্রয়াসকে এইসব ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে হবে। ২০৫০ সাল পর্যন্ত যতটা নির্গমন কমানো প্রয়োজন তার অর্ধেক কমানো যাবে সাশ্রয়কারী ব্যবস্থার মাধ্যমে।

কয়লা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটে সবথেকে বেশি পরিমাণ কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। কয়লার গ্যাসে রূপান্তর সহ অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে কয়লার উৎপাদনক্ষমতা যেমন বাড়বে, তেমনই কমবে নির্গমনের মাত্রা। পুরানো প্রকল্পের ৩০ শতাংশের তুলনায় আধুনিক প্রকল্পে কয়লার বয়লারের দক্ষতা ৪০ শতাংশ হয়ে গেছে। যেসব পরীক্ষামূলক প্রকল্পে উচ্চতাপে বাষ্প ব্যবহৃত হয়, সেখানে কার্যকারিতা ৫০ শতাংশ হয়ে গেছে। যেহেতু ২০৫০ সালের মধ্যে কয়লার ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব নয়, তাই কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৪৫০ পি পি এম-এর লক্ষ্যমাত্রার জন্য শক্তি উৎপাদনের কারবন নির্ভরতার বর্তমান মাত্রা ইউনিট পিছু ৫০০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ইউনিট পিছু ১৩০ গ্রাম করতে হবে।

শক্তি উৎপাদনে যেমন কয়লার আধিপত্য, ঠিক তেমনই পরিবহনে আধিপত্য তেলের। গাড়ির ধোঁয়া কমাবার প্রথম রাস্তাই হল তেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়। এক্ষেত্রে প্রথম প্রেরণা দেয় ১৯৭৩ সালের তেলের সঙ্কট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য উন্নত দেশগুলি যানবাহনের জ্বালানি সাশ্রয়কে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। বিশেষ করে যাত্রীবাহী গাড়িগুলির ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে তাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় আটের দশকের মাঝামাঝি। কিন্তু ততদিনে তেলের বাজারের সঙ্কট কেটে গেছে। ফলে কমে যায় প্রয়োজনের তাগিদও। পছন্দের তালিকায় উঠে আসে এস ইউ ভি। ১৯৮৫ সালে জ্বালানির কার্যকারিতা ছিল গ্যালন প্রতি ২৭.৫ মাইল (এম পি জি)। কুড়ি বছর পরে এই লক্ষ্যমাত্রা হয়েছে ৩৫.৫ এম পি জি। উচ্চ এম পি জি-র গাড়ি বাজারে পাওয়া গেলেও, সুন্দর গড়ন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য কম এম পি জি-র গাড়ির চাহিদা রয়েছে। ফলে গড় এম পি জি বাড়ছে ধীরলয়ে। গাড়ি নির্মাণকারী একাধিক সংস্থা ৪০ থেকে ৬০ এম পি জি-র গাড়ি তৈরির কথা ঘোষণা করেছে। ২০০৮ সালে ফোক্সওয়াগন সংস্থা তাদের নিজস্ব নির্মাণকৌশল এবং ভাবনা থেকে ২৩৫ এম পি জি-র এক বিশেষ গাড়ি তৈরির কথা ঘোষণা করেছিল। তখন তেলের দাম ছিল ব্যারেল পিছু ১৩৫ ডলার। সেই গাড়ি এখনও পর্যন্ত বাজারে আসেনি। মনে করা হচ্ছে যে, ২০৩০ সালে সব থেকে সাশ্রয়কারী গাড়ির মাইলেজ হবে আজকের দ্বিগুণ এবং ২০৫০ সালে হয়তো গড় মাইলেজও এই মাত্রায় পৌঁছাবে।

এথানল ও জৈব ডিজেলের মতো জৈবজ্বালানির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩০,০০০ কোটি লিটার হয়েছে। এটি হল ব্যবহৃত পেট্রোল ও ডিজেলের প্রায় ৮ শতাংশ। ইউরোপিয় ইউনিয়ন ২০২০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জৈবজ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যমাত্রাও যথেষ্ট বেশি। সুতরাং জৈবজ্বালানির ব্যবহার আরও বাড়বে। কারবন নির্গমনের ক্ষেত্রে জৈবজ্বালানি কতটা উপযোগী? উৎসস্থল থেকে গাড়ি পর্যন্ত সম্পূর্ণ 'জীবনচক্রে' জ্বালানির নির্গমনের মাত্রা নির্ভর করে তার উৎসের উপর। ব্রাজিল বা ভারতে আখের থেকে যে এথানল তৈরি হয়, তা পেট্রোলের তুলনায় ৮০ শতাংশ নির্গমন কমায়। এর কারণ হল দীর্ঘ গবেষণার পরে আখের উচ্চ উৎপাদনশীলতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টা থেকে উৎপন্ন এথানলে মাত্র ১৫ শতাংশ কম নির্গমন হয়। এর কারণ হল, ভুট্টার চাষ যথেষ্ট শক্তি নির্ভর। অনেকে মনে করেন যে মার্কিন এথানল আসলে মোট নির্গমনের মাত্রা বাড়িয়েই দেয়। ইউরোপে বীট থেকে উৎপন্ন এথানল অনেক বেশি কার্যকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সয়বিন থেকে এবং ইউরোপে রেপসিড থেকে জৈব ডিজেল তৈরি হয়। এগুলি সাধারণ ডিজেলের তুলনায় নির্গমন কমাতে পারে ৫০ শতাংশ।

এই ধরনের 'প্রথম প্রজন্মের' জৈবজ্বালানির বৃহদাকার উৎপাদন টিকিয়ে রাখা মুস্কিল কেননা জমি ও অন্যান্য সম্পদের জন্য এগুলি খাদ্যশষ্যের প্রতিযোগী হয়ে ওঠে। ২০০৮ সালে খাদ্যশষ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য জৈবজ্বালানির ব্যবহারকেই দায়ী করা হয়। তাই, লিগনো-সেলুলোজ থেকে এথানলে উৎপন্ন 'দ্বিতীয় প্রজন্মের' জৈব জ্বালানি উৎপাদনকেই এখন অগ্রাধিকার দিচ্ছে যাবতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী। এগুলি কাঠ বা শষ্যের বর্জ্য থেকে তৈরি করা যায় এবং নির্গমন হ্রাস করার ক্ষেত্রে এগুলি সবথেকে কার্যকর। ২০৩৫ সালের মধ্যে ১৪ শতাংশ যানবাহনে এগুলি ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে ৫ শতাংশ যানবাহনে প্রাকৃতিক গ্যাস ও ৫ শতাংশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে। তবেই ৪৫০ পি পি এম-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।

সম্প্রতি, বিদ্যুতের সঙ্গে পেট্রোল, ডিজেল বা জৈবজ্বালানির যৌথ ব্যবহারে চালিত 'হাইব্রিড' গাড়ি কারবন নির্গমনকে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। এই গাড়িগুলিতে অন্তর্দহন ইঞ্জিনের সঙ্গে বিদ্যুৎচালিত মোটরও থাকে। কয়েকটি গাড়িতে মোটরটি সরাসরিভাবে ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে। অন্য গাড়িগুলিতে ইঞ্জিনটি একটি ব্যাটারিকে চার্জ করে যা আবার মোটরকে চালায়। জ্বালানি সাশ্রয় এবং নির্গমনের মাত্রা কমানো হয় 'পুণরুৎপাদক ব্রেক' প্রযুক্তির সাহায্যে (রিজেনারেটিভ ব্রেকিং)। গাড়ি থামাবার জন্য ব্রেক কষলে যে শক্তি তাপে পরিণত হত তাকেই ব্যাটারি চার্জ দিতে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বের সব থেকে সফল হাইব্রিড গাড়ি হল টয়োটা প্রিয়াস। এপর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ প্রিয়াস বিক্রি হয়েছে।

এরপরে আছে 'প্লাগ-ইন' গাড়ি, যেখানে ব্যাটারিকে বাইরে থেকেই চার্জ দেওয়া যায়। বাড়ির মেইন সুইচ থেকেও। অনেক হাইব্রিড নির্মাতারাই 'প্লাগ-ইন' গাড়ি বানাতে চাইছেন। ব্যাঙ্গালোরে নির্মিত 'রেভা' গাড়ি হল বিশ্বের সবথেকে বেশি বিক্রি হওয়া 'প্লাগ-ইন' গাড়ি। ব্যাটারি একবার পুরোপুরি চার্জ হয়ে গেলে এই 'রেভা' গাড়ি ৮০ কিলোমিটার যেতে পারে। সর্বাধিক গতিবেগ ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার। এর দাম বেশি হলেও জ্বালানির কম খরচে তা পুষিয়ে যায়। এই খরচ পেট্রোলের থেকে অনেক কম। এইধরনের গাড়ি অথবা পুরোপুরি বিদ্যুৎচালিত গাড়ি তখনই জনপ্রিয় হবে যখন তাদের দূরত্ব অতিক্রমের ক্ষমতা এবং গতিবেগ, দুইই বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, নির্গমনের ক্ষেত্রে এরা তখনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে, যখন বিদ্যুৎ আসবে পরিচ্ছন্ন উৎস থেকে।

বাইরে থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের বদলে এইসব গাড়ি তাদের ভিতরে 'ফুয়েল সেল' বা 'জ্বালানি কোষ'-এর মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এই কোষগুলি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে যুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এদের একমাত্র উপজাত দ্রব্য হল পরিষ্কার জল। অক্সিজেন বাতাসেই পাওয়া যায়। তবে হাইড্রোজেনকে ট্যাঙ্কে ভরে নিতে হবে। এই হাইড্রোজেন নানারকম উৎস থেকে আসতে পারে। সেই উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস, বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক উপাদান হতে পারে। আলো কিংবা পরমাণু চুল্লি থেকে প্রাপ্ত তীব্র উত্তাপ দিয়ে জলকে বিশ্লেষণ করেও হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। বর্তমানে এরমধ্যে কোনও উৎসই সুলভ নয়। হাইড্রোজেনের উৎপাদনের খরচ পেট্রোলের ৩ থেকে ৪ গুণ। এরসঙ্গে রয়েছে হাইড্রোজেনের পরিবহন, মজুত ইত্যাদির খরচ। এইসব খরচ কমানোর জন্য সুপরিকল্পিত গবেষণা হলেও ২০৫০ সালেও হাইড্রোজেন প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে বলে মনে হয়না।

বাড়ি-ঘর গরম অথবা ঠাণ্ডা করতে আমরা অনেক শক্তির অপচয় করি। বাড়ির নকশাকে উন্নত করে অথবা তাপের গতিরোধক (insulation)-এর মান উন্নত করে এই অপচয় অনেকাংশেই এড়ানো যায়। বাড়িতে আরও বেশি সূর্যালোক আসতে দিলে দিনের বেলা কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন অনেকটাই কমে যায়। একটি বাড়ি একবার তৈরি হলে তা প্রায় ৫০-৬০ বছর থাকে। সুতরাং, শক্তি বেশি খরচ হয় এমন বাড়ির নির্মাণ আমাদের বন্ধ করতে হবে দ্রুত। বাড়ির নকশা তৈরির করার সময়েই ভেবে দেখতে হবে সৌর প্যানেল কোথায় বসালে সারাদিন আলো পাবে আর সৌরশক্তিতে যে জল গরম হবে তা যেন পাইপেই ঠাণ্ডা না হয়ে যায়।

জি এল এস বাল্‌বের ব্যবহার এখন অনেকটাই কমে গেছে। তার জায়গায় এসেছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী সি এফ এল বাল্‌ব। জি এল এস বাল্‌বগুলি মাত্র ৫ শতাংশ

বিদ্যুতকে আলোয় পরিণত করে। বাকি বিদ্যুৎ তাপ হিসেবে ছড়িয়ে যায়। সর্বোৎকৃষ্ট সি এফ এল-এর দক্ষতা তার ছয় গুণ। জি এল এস বাল্‌ব ১০০০ ঘণ্টার পর বদলে ফেলতে হবে। সি এফ এল চলে ৫০০০ থেকে ১০০০০ ঘণ্টা। কিছু কিছু বাল্‌ব ১৫০০০ ঘণ্টাও চলে। তাই সি এফ এল কিনতে যে বেশি দাম লাগে তা পূরণ হয়ে যায় দুবছরের মধ্যে। টর্চ বা অন্য বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য লাইট এমিটিং ডায়োড (এল ই ডি) ইতিমধ্যেই বাজারে এসে গেছে। এদেরকে সলিড স্টেট লাইট ও (এস এস এল) বলা হয়। বর্তমানে জি এল এস-এর তুলনায় এদের দাম ২০০ গুণ-এরও বেশি। কিন্তু এদের কার্যকারিতা প্রায় দশগুণ বেশি। অনেক দেশের কর্তৃপক্ষই ধীরে ধীরে জি এল এস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউরোপিয় ইউনিয়ন এবং চীন এব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করছে বলে জানা গিয়েছে।

কারবনকে আটক করে তাকে মাটির তলায় বন্দী করার প্রযুক্তিকে (সি সি এস) গড়ে তোলা হচ্ছে। এরফলে কয়লা পোড়ানোর থেকে নির্গমনকে ৮০ শতাংশ কমানো যাবে বলে আশা। বর্তমানে এই প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ তবে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের মতো বৃহৎ নির্গমনের উৎসে হয়তো এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। হাইড্রোজেন যদি প্রধান জ্বালানি হয়, তাহলে তার অধিকাংশই উৎপন্ন হতে পারে কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। সেটি আবার কারবন-ডাই-অক্সাইডের এক নতুন উৎস না হয় তা দেখতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র থেকে নির্গত গ্যাসের কারবন-ডাই-অক্সাইডকে পৃথক করে, তাকে সঙ্কুচিত করে পাইপের মাধ্যমে সঞ্চয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যায়। খালি হয়ে যাওয়া তেল বা গ্যাসের খনি, অথবা মাটির ১০০০ মিটার বা তার বেশি গভীরে থাকা নোনা জলের আধারে এই কারবন-ডাই-অক্সাইড সঞ্চয় করা যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে চালু তেলের খনিতে কারবন-ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করালে বেশি তেলও পাওয়া যাবে, সঞ্চয়ের খরচও বাঁচবে। হিসাবমতো আমরা ভূগর্ভে ১০০০ Gt CO_2 সঞ্চয় করতে পারি। বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা ৪৫০ পি পি এম-এ রাখতে হলে সব কয়লা নির্ভর এবং অধিকাংশ গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে ২০৫০ সালের মধ্যে সি সি এস চালু করতে হবে।

ভবিষ্যতে নবীকরণীয় শক্তির উৎস হিসেবে প্রধান হয়ে উঠতে পারে বায়ু, সৌর, জৈবপদার্থ, জলবিদ্যুৎ এবং কিছু ক্ষেত্রে ভূতাপীয় শক্তি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই উৎসগুলির ব্যবহার নির্ভর করছে এদের খরচ কমানোর জন্য বিপুল গবেষণার উপর। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই হল জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের তুলনায় নবীকরণীয় শক্তির খরচ কমানো। আপাততঃ বেশি খরচ করে প্রয়োগ করতে হলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যাতে দাম

কমানো যায়, তারজন্য এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। কারবন নির্গমনের উপর চড়া হারে কর ধার্য করলে তার থেকে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা যাবে।

এই কাজ করা খুব সহজ হবেনা। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হবে। এই প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র বেশিরভাগ বিনিয়োগ এবং গবেষণার অর্থ কুক্ষিগত করে রাখবে। ফলে নতুন ও নবীকরণীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তির দাম ততদিন বেশিই থাকবে। বিকল্প শক্তির ক্ষেত্রে বেশি দামই একমাত্র সমস্যা নয়। সচেতন ক্রেতা হয়তো ব্যারেল পিছু তেলের ১৪৭ ডলার দামের চেয়ে সৌরশক্তির চড়া দাম দিতেই আগ্রহী। কিন্তু তেল সরবরাহকারীদের এমনই প্রভাব যে বেশীরভাগ মানুষই তেলের এই মূল্যবৃদ্ধিকে মনে করবে স্বাভাবিক, কিন্তু সৌরশক্তির দামকে মনে হবে বোঝাস্বরূপ।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প খোঁজার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উৎপাদনকেন্দ্রের নির্গমণই বিবেচ্য নয়। আমাদের 'জীবনচক্রের' নির্গমনের হিসাব করতে হবে। এরমধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির অনুসন্ধান ও উৎপাদন এবং তারপর খনি থেকে উৎপাদনকেন্দ্রে পরিবহনের সময় কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনকে ধরা হয়। শক্তিকেন্দ্র নির্মাণের সময় যে নির্গমন হয়, তাও যোগ করা হয়। যে কংক্রিট এবং ইস্পাত দিয়ে এই উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি হয় সেগুলি তৈরি করতেও যথেষ্ট শক্তি খরচ হয়। এগুলিও বিচার করা উচিত। 'জীবনচক্রের' নির্গমনের মাধ্যমেই বিভিন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির যথার্থ তুলনামূলক বিচার সম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তথ্য সবসময় পাওয়া নাও যেতে পারে।

গ্রিন হাউজ গ্যাসের নির্গমন কমানোর প্রচেষ্টা এবং তার প্রয়োজনীয়তা পরমাণু শক্তি সম্পর্কে উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রত্যাশামতোই ভারতেও পরমাণু শক্তির স্বপক্ষে উষ্ণায়ন রোধের প্রয়োজনকে তুলে ধরা হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নকে রুখতে এবং আমাদের শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এছাড়া যেন আর গতি নেই। সুরক্ষা এবং খরচের কথা বরং এম আই টি ই ভাবুক। পরমাণু চুল্লিকে নিষ্ক্রিয় করুক ইউরোপ। জাপান তাদের চুল্লি বন্ধ করে দিক। যেখানে যাই হোক, পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। এখনই আমদানি করতে হবে ডজন খানেক চুল্লি। ৬০ কোটি ভারতীয়ের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। তাদের বাড়ির পিছনে পরমাণু চুল্লি তৈরি হলেও তারা আপত্তি করবে না।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে পরমাণু শক্তি সম্পর্কে এই মনোভাব ঠিক নয়। আই ই এর হিসাব অনুযায়ী ৪৫০ পি পি এমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০১০ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে তৈরি উৎপাদনকেন্দ্র থেকে উৎপন্ন ৬৩৮৫ গিগাওয়াট বিদ্যুতের মধ্যে মাত্র ৫২৪ গিগাওয়াট পরমাণু শক্তি থেকে উৎপন্ন হতে পারে (৮.২ শতাংশ)।

এই হিসাব তৈরি হয়েছিল ফুকুশিমার দুর্ঘটনার আগে। অতএব এখনই তার সংশোধন প্রয়োজন। তাই পরমাণু শক্তি বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অপরিহার্য অস্ত্র হতে পারেনা। বরং গুরুত্বের বিচারে তা নগন্যই বলা যায়।

১২.৪ দেশ-ভিত্তিক নির্গমনের মাত্রা নির্ধারণ ●

মোট কাজটা কি তা সকলেরই জানা। বাতাসে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ ৪৫০ পি পি এম-এ স্থিতিশীল রাখতে হবে। ২০৫০ সালের মধ্যে গোটা বিশ্বের শক্তি উৎপাদন এবং ব্যবহার থেকে নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে ১৪ গিগাটন কারবন-ডাই-অক্সাইড করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করার শাস্তিও সবারই জানা। উপযুক্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং তাদের উৎসাহ দানের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি—তাও কারও অজানা নয়। তবে কোনও দেশই এককভাবে নির্গমন কমাবার ব্যাপারে প্রয়াসী হবে, এমন প্রত্যাশাও করা যায়নি। এরজন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান। তা তখনই শুরু হতে পারে, যখন নির্গমন কমানোর মোট লক্ষ্যমাত্রাকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রতি দেশের লক্ষ্যমাত্রায় বিভক্ত করা যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ দুদশকের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই দেশ-ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে আমরা একমত হতে পারিনি।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৯২ সালে রিওতে ইউ এন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইম্যাটিক চেঞ্জ (ইউ এন এফ সি সি সি) স্বাক্ষরিত হয়। এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারীরা ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছরই বৈঠকে বসেছে। নির্গমন কমানোর ব্যাপারে প্রথম চুক্তি ছিল ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রোটোকল। এই চুক্তিতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে লক্ষ্যমাত্রার বাইরে রাখা হয়েছিল। কথা ছিল, উন্নত দেশগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২০১০ সালের মধ্যে তাদের নির্গমনের মাত্রা ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫.২ শতাংশ কমাবে। এটা ছিল নেহাতই মামুলি এক লক্ষ্যমাত্রা, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সকলের সদিচ্ছা যাচাই করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য বিফল হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে সম্মত হয়নি। তবে সুখের কথা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সুইডেন নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছিল।

কিয়োটোর পরে আসে ২০০৭ সালের বালি অ্যাকশন প্ল্যান যেখানে দেশগুলি আরও দুবছর আলাপ আলোচনার পর ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে একত্র হয়ে নির্গমন কমানোর নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ব্যাপারে একমত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রভূত প্রত্যাশা নিয়ে কোপেনহেগেনের সম্মেলন হলেও তাতে কোনও চুক্তিই করা

যায়নি। আবারও সেই মার্কিন বাধা। তাদের যুক্তি বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক হোক প্রতি দেশের লক্ষ্যমাত্রা। কার্যত দেখা যায়, ঐচ্ছিক লক্ষ্যমাত্রা একেবারেই অপর্যাপ্ত। জাপান ২০২০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের তুলনায় ২৫ শতাংশ নির্গমন কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ২০২০ সালের মধ্যেই ইউরোপিয় ইউনিয়ন ১৯৯০ সালের তুলনায় নির্গমন ২০ শতাংশ কমাবার কথা বলে। চীন জানায় উৎপাদনের কারবন নির্ভরতা ২০০৫ সালের তুলনায় ৪০ শতাংশ কমাবে। ভারতও ২০২০ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের তুলনায় কারবন নির্ভরতা ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কমাবার সিদ্ধানা ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই একই সময়ের মধ্যে ২০০৫ সালের তুলনায় মাত্র ১৭ শতাংশ কমাবার কথা বলে। কোপেনহেগেনের বৈঠকে তাপমাত্রার বৃদ্ধিকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। তবে ঐচ্ছিক লক্ষ্যমাত্রা যা ধার্য্য হয় তা পূরণ করা হলেও আমরা ৪৫০ পি পি এমের ধারেকাছেও পৌঁছাব না।

নয়ের দশকে আন্তর্জাতিক স্তরের আলাপ আলোচনায় উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের দায়িত্বের পার্থক্য স্বীকৃতি লাভ করে। অতীতে অধিকাংশ নির্গমনের জন্যই দায়ী উন্নত দেশগুলি। সুতরাং পরিষ্কার করার ব্যায়ভার বহন করতে হবে তাদেরই, এই ধারণার সমর্থনেই কিয়োটো প্রোটোকল উন্নয়ণশীল দেশগুলিকে লক্ষ্যমাত্রার থেকে ছাড় দিয়েছিল। এর আরও একটি যৌক্তিকতা এই যে উন্নয়নশীল দেশগুলিকেই উষ্ণায়নের ভার বেশি করে বহন করতে হচ্ছে।

এই মতবাদের আজ আর তেমন আধিপত্য নেই। গত দুই দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলি, বিশেষ করে ভারত ও চীন প্রভূত উন্নতি করেছে। তাদের ভাগের শক্তির খরচ এবং কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। এটি নিঃসন্দেহে উন্নত দেশগুলির মনোভাব বদলের অন্যতম কারণ। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। তারা মনে করে নির্গমন কমানোর ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলিরও বড় ভূমিকা প্রয়োজন।

এই মতপার্থক্যের কারণ অতি সরল। কারবন নির্ভরতা কমানো যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ কেবল বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটি করা যাবে না। সৌর তাপবিদ্যুৎ, কারবন আটক ও বন্দি বা দ্বিতীয় প্রজন্মের জৈবজ্বালানির মতো নতুন প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হবে। প্রথমদিকে এই প্রযুক্তি ব্যয়সাপেক্ষ হবে। পরিমাণ বাড়লে খরচও কমে যাবে। যে দেশ যত আগে নির্গমন কমাতে সম্মত হবে, তার খরচ ততই বেশি হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন বলে যে ১৯৯০ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে নির্গমন ৮০ শতাংশ কমাতে হবে। তাও তারা ২০২০ সালের জন্য কোনো কঠিন লক্ষ্যমাত্রা নিতে রাজি নয়; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই যদি কোনো কার্যকরি লক্ষ্যমাত্রা না নেয়, তাহলে নির্গমন কমাবার খরচই বা কমবে কি করে?

উষ্ণায়নের সম্ভাব্য প্রভাবের ক্ষেত্রে একই জায়গায় রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন। তাপমাত্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি হলে এরা মোটের উপর সুবিধাই পাবে। কিন্তু তার থেকে বেশি বাড়লে তাদের সঙ্কট যথেষ্ট গভীর। তবে সম্পদশালী দেশ হওয়ায় তারা জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে এবং এর ফলে এই প্রভাবও হবে ন্যূনতম। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করার ব্যাপারে কিন্তু এই দুই পক্ষের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল বৃহত্তম নির্গমনকারী। এখানকার মাথাপিছু কারবন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন ১৯ টন, যেখানে বিশ্বের গড় হল ৪ টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যমাত্রা হতে হবে কঠোর এবং এর ভুক্তভোগী হবে মার্কিন নাগরিকরাই। দ্বিতীয়ত, ইউরোপ বরাবরই শক্তি নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তাই জীবাশ্ম জ্বালানির খরচ কমাবার ব্যাপারে যে কোনও লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করতে তারা অনেক বেশি আগ্রহী। শেষ কারণ হল, মার্কিন সরকারের উপর তেল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির চিরকালের বেশি প্রভাব।

কোপেনহেগেনের পর আবার ২০১৫ সালে বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা হলেও কিয়োটোর মতো কোনও চুক্তি হওয়ার বিশেষ কোনও আশা নেই। আপাতত আমরা ঐচ্ছিক লক্ষ্যমাত্রাতেই আটকে আছি। আমরা কেবল আশা করতে পারি যে, এই ঐচ্ছিক লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে করতে হয়তো অনেক দেশই বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করার আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবে।

ভারতের মাথাপিছু কারবন নির্গমনের মাত্রা অত্যন্ত কম। গত এক দশকে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের কারবন নির্ভরতা কমেছে। অর্থনীতির বৃদ্ধির সঙ্গে নির্গমনের মাত্রাকে নিম্নমুখী রাখতে ভারত এক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার নাম ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (এন এ পি সি সি)। এতে সৌরশক্তি, শক্তি সাশ্রয়, নগরায়ন এবং পরিবহন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবার কথা বলা হয়েছে। জওহরলাল নেহরু সোলার মিশনের লক্ষ্য ২০২০ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন।

কারবন নির্ভরতা কমাতে এইসব প্রকল্প গ্রহণে আগ্রহী হলেও ভারত বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণে আপত্তি জানিয়েছে। নয়ের দশকে এই মনোভাব ঠিক ছিল কিন্তু এখন আর তা যথেষ্ট নয়। গত দু দশকে শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি এবং শক্তি ব্যবহারে ব্যাপক বৃদ্ধির পরে ভারতকে আর পুরোপুরি উন্নয়নশীল দেশের পর্যায় ফেলা যায় না। এছাড়া, এখন আর কোন দেশই বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রার কথা বলছে না—এখন ঐচ্ছিক লক্ষ্যমাত্রার যুগ। এই প্রবণতা ভারতকে এখন এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালনের সুযোগ করে দিয়েছে। ভারত ও চীন যদি কার্যকরি লক্ষ্যমাত্রা নেয় তাহলে হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাধ্য হবে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

আমরা যে লক্ষ্যমাত্রার কথা ঘোষণা করেছি, তার পরিবর্তে আমরা কী পাবো তা বলা মুস্কিল। এ ব্যাপারে আলোচনা দীর্ঘ এবং দুরূহ দুইই হবে। এই হারজিতের খেলায় লাভ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। চীন, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের ঐচ্ছিক লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করার পরে ভারতের কাছে আর অন্য পথ খোলা ছিল না। উষ্ণায়নের ফলে ভারত যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবচেয়ে বেশি দুর্দশা হবে এদেশের দরিদ্র কৃষক অথবা উপকূলবর্তী মৎস্যজীবীর। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই প্রয়োজন হলে ভারতের ধনী সম্প্রদায় যদি আরও একটু এগিয়ে এসে, আরও একটু ক্ষতি স্বীকার করে, আরও বেশি কঠিন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে তাহলে আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

ভারত যে মাঝারি মাপের লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেছে তা দক্ষতার উন্নতি এবং বর্তমানে কার্যকর বিকল্প শক্তি কর্মসূচীর মাধ্যমেই অর্জন করা যাবে। দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর এই লক্ষ্যমাত্রার সম্ভাব্য প্রভাবের তীব্রতা নানাভাবে কমানো যায়। সৌরশক্তি যত বেশি দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছে, তা প্রচলিত ধারার বিদ্যুৎ আজও পারেনি। যেসব গরিব মানুষ কাঠের আগুনে রান্না করেন, তাদের যদি আমরা উন্নত উনুন দিতে পারি, তাহলে শুধু নির্গমনের মাত্রাই উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে না, সেইসঙ্গে গ্রামীন স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে। এইধরনের পদক্ষেপ বাতাসে কারবন কমাবে, দারিদ্র্য দূরীকরণেরও সাহায্য করবে। ■

ত্রয়োদশ অধ্যায় শক্তি নিরাপত্তার অর্থ

১৩.১ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলা ●

১৯৫০ নাগাদ বিশ্বের প্রধান জ্বালানি হয়ে ওঠে তেল। পরবর্তী দুই দশকে মধ্যপ্রাচ্যে একাধিক নতুন খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তেলের সরবরাহ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। প্রকৃত অর্থে তেলের দামে কোন বৃদ্ধি ঘটেনি। ফলে, উন্নত দেশগুলিতে তেলের ব্যবহার বেড়ে যায় এবং ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও। গাড়ি চালানো ছাড়াও, পেট্রোকেমিক্যাল এবং সারের কাঁচামাল হিসেবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনেও তেলের ব্যবহার শুরু হয়। সবদেশের অর্থনীতিতেই তেল নির্ভরতা বাড়তে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে কারোরই কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না।

নিশ্চয়তার এই মোহ ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ১৯৭৩ সালে— যখন ওপেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেলের সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং উৎপাদন মাত্রা কমিয়ে দিনে ৪২ লক্ষ ব্যারেল করে। রাতারাতি দ্বিগুণ বেড়ে যায় তেলের দাম, মন্দায় আক্রান্ত হয় ইউরোপিয় দেশগুলি। এটি যে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং তেল সরবরাহে এইরকম বিশৃঙ্খলা আবারও ঘটতে পারে— এ কথা বোঝার মতো দূরদৃষ্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল। তাই তাদের নেতৃত্বে ও ই সি ডি দেশগুলি আই ই এ গঠন করে, যাতে তেলের হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলা করা যায় সঠিক পথে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। তা হল, অর্থনীতির তেল-নির্ভরতা কমানো দরকার। তা কীভাবে সম্ভব? একদিকে সাশ্রয়ের পথ অবলম্বন এবং অন্যদিকে তেলের বিকল্প জ্বালানির অনুসন্ধান—এই দুই পথেই তা হতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টার এই পদক্ষেপগুলিকে 'যুদ্ধের নৈতিক সমার্থক' বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ যুদ্ধের কথা হয়তো বিবেচনা করা হয়েছিল, এবং তা বাতিলও হয়। কারণ ১১টি তেল উৎপাদনকারী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া বাস্তবসম্মত নয়।

১৯৭৩-এর পর তেলের দাম আবার বাড়ে ১৯৮০-৮১ সালে, ইরান-ইরাক যুদ্ধের

সময়। এরপর, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের ফলে তেলের সরবরাহে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে অথবা তার আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে বহুবার। এইসব ঘটনার মূল কেন্দ্র ছিল মধ্যপ্রাচ্য। এছাড়া, মধ্য এশিয়া, নাইজিরিয়া অথবা ভেনেজুয়েলাতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ২০১১-২০১২ সালে এসেছে মিশর বা লিবিয়ার অভ্যুত্থান। প্রতিবারেই তেলের দাম বেড়েছে—কম অথবা বেশি। এই ঘটনাবলির এবং এর ফলে উদ্ভুত সঙ্কট মোকাবিলায় তেল ব্যবহারকারী রাষ্ট্রের গৃহীত ব্যবস্থার পর্যালোচনার থেকেই শুরু হয়েছে শক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণা। গত কয়েক দশক ধরে ড্যানিয়েল ইয়েরগিন, পিটার ওডেল, ফিলিপ ভারলেগার-এর মতো বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত অবদানে বিষয়টি ক্রমেই আরও অর্থবহুল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, তেলের মতোই প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহেও বিঘ্ন হতে পারে। ইউক্রেনের সঙ্গে তাদের বিরোধের ফলে ইউরোপকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয় রাশিয়া। ক্যালিফোর্নিয়া একদিন দেখেছিল যে আচমকা বিদ্যুৎ সরবরাহও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এইসব উদাহরণ সত্ত্বেও, শক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণা মূলত তেলের নিরাপত্তাকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

তেলের সঙ্কট আসন্ন জানলেই শোধনাগারগুলি আতঙ্কিত হয়ে তেল কিনতে শুরু করে। এরফলে দামও বাড়তে থাকে। এইসময় সরকার যদি বহুল পরিমাণ তেল বাজারে ছাড়ে, তাহলেই এই অযথা আতঙ্ক দূর হয় এবং বাজারও থাকে শান্ত। ১৯৭৩ সালের পর, ও ই সি ডি দেশগুলি জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য পেট্রোলিয়মের এক মজুতভাণ্ডার গড়ে তোলে, যার নাম স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়ম রিজার্ভ (এস পি আর)। গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মজুতে ছিল ৫৭ কোটি ব্যারেল অশোধিত তেল। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৭২ কোটি ৭০ লক্ষ ব্যারেল। প্রয়োজনের অনুপাতে মজুত রয়েছে ও ই সি ডি-র অন্যান্য দেশগুলিতেও। বর্তমানে ভারত ও চীন হল দুটি বৃহৎ শোধনকেন্দ্র। তাই স্বভাবতই এই দুই দেশও তাদের আপতকালীন সংগ্রহ গড়ে তুলছে।

এই মজুত ব্যবহার করা খুব সহজ নয়। কোনও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি এলে কেউই বলতে পারেনা তা কতদিন চলবে, অথবা তেলের দাম কতটা বাড়বে। মজুত রাখা তেল খুব তাড়াতাড়ি অথবা দেরিতে বার করলে তা বাজারে যথাযথ প্রভাব ফেলতে পারবে না। সদস্য রাষ্ট্রগুলি এই মজুত কীভাবে ব্যবহার করবে তা পরিচালনা করার দায়িত্ব আই ই এ-র। কোন সময়ে কতখানি পরিমাণ ছাড়া হবে তা সদস্য রাষ্ট্রগুলি যৌথভাবে ঠিক করে। ১৯৯০-৯১ সালে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাদের এস পি আর প্রথম ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তখন ২ কোটি ১০ লক্ষ ব্যারেল ছাড়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০০৫ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ 'ক্যাটরিনা' ও 'রিটা'-এর ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দিতে ১ কোটি ১০ লক্ষ ব্যারেল খরচ করা হয়। মিশর

ও লিবিয়ার অভ্যুত্থানের পর ও ই সি ডি দেশগুলি ৬ কোটি ব্যারেল তেল ছাড়ে।

এস পি আর চটজলদি সমাধান হলেও এটি অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ এবং এর ফলও অনিশ্চিত। এর প্রভাবও কমে গেছে কেননা ৪০ বছর আগের তুলনায় তেলের বাজার এখন অনেক বেশি কার্যকর। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বাজার সংক্রান্ত তথ্য এখন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের নাগালের মধ্যে। আই ই এ দ্বারা তেলের মজুতের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সেই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ফলে আতঙ্কিত হয়ে তেল কেনার ঘটনা অনেক কমে গেছে। সঙ্কট এলেও বাজার দক্ষভাবে কাজ করবে— এ ব্যাপারে এখন সরকারও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তাই তারা এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেও খুব একটা আগ্রহী নয়।

অর্থনীতির এই সঙ্কট দূর করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল তার শক্তি-নির্ভরতা কমানো—এই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সেই ১৯৭০ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদন ১৫০ শতাংশ বাড়লেও শক্তি খরচ বেড়েছে ২৫ শতাংশ। শক্তি সাশ্রয়, বিশেষ করে গাড়ির জ্বালানিতে সাশ্রয়ের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। একই সময়ে জাপানও শক্তি সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। তাই তেলের সরবরাহ বন্ধ হলে এইসব দেশের অর্থনীতি ১৯৭০-এর তুলনায় অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কোনও দেশ যদি তার নিজস্ব খনি থেকে তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানির অনুপাত কমাতে পারে তাহলে কি তার তেল-নিরাপত্তা বাড়ে? ধরা যাক একটি দেশে ১০০ ব্যারেল তেল ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে ৪০ ব্যারেল আমদানি হয়। দ্বিতীয় দেশে খরচ হয় ২০০ ব্যারেল কিন্তু আমদানি হয় মাত্র ২০ ব্যারেল। দ্বিতীয় দেশটি কি বেশি নিরাপদ? আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হলেও তা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। এককালে দেশের খনিগুলি ছিল জাতীয় সংস্থার হাতে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও এই সংস্থাগুলি সরকার নির্ধারিত দামেই তেল সরবরাহ করত। এখন জাতীয় বা বিদেশী, সরকারি বা বেসরকারি যে সংস্থাই দেশে তেল উৎপাদন করুক না কেন, তারা আন্তর্জাতিক দামেই তেল বিক্রি করবে। যেহেতু দ্বিতীয় দেশে তেলের ব্যবহার বেশি, বাড়তি দামের বোঝাটাও হবে বেশি। প্রথম দেশটিতে তেলের ব্যবহার কম—এইটিই বেশি নিরাপদ।

দ্বিতীয়ত, ধরা যাক দুটি দেশ ১০০ ব্যারেল তেল আমদানি করে। প্রথম দেশটি এর সবটাই আমদানি করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে; দ্বিতীয় দেশটি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তেল আমদানি করে। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যেই যুদ্ধ ইত্যাদির সম্ভাবনা বেশি, মনে হতে পারে দ্বিতীয় দেশটি বেশি নিরাপদ। তা কিন্তু নয়। তেল সরবরাহের সঙ্কট যেখান থেকেই শুরু হোক না কেন, সারা বিশ্বের তেলের বাজারই তাতে প্রভাবিত হয়। তাই

নাইজিরিয়াতে স্ট্রাইক হলে মালায়শিয়ান তেলের দামও বাড়ে।

১৯৭৩ পর্যন্ত তেলের দাম কম থাকায় নর্থ সি, সাইবেরিয়া অথবা মধ্য এশিয়ায় তেলের উৎপাদন সম্ভব হয়নি। ওপেক তেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়াতে এইসব অঞ্চল থেকে তেলের উৎপাদন শুরু হয়ে যায় এবং তার ফলে ওপেক-এর দাম বাড়াবার ক্ষমতা কমে যায়। এই অর্থে বলা যায় যে তেলের উৎসের সংখ্যাবৃদ্ধি গোটা বিশ্বে তেল-নিরাপত্তা বাড়িয়েছে। কোনও একটি দেশ কিন্তু আমদানির উৎস বাড়িয়ে তার তেল নিরাপত্তা বাড়াতে পারে না।

তেলের পরিবর্তে অন্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ালে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হতে পারে। ছয় বা সাতের দশকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কৃত হলেও তার উৎপাদন বাড়ে তেল সঙ্কটের পরেই। স্বচ্ছ জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য অনুভূত হয় আরও পরে। 'নিরাপদ' অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যেতেই শক্তি নিরাপত্তার নিরিখে তার বিচার শুরু হয়। আমদানি করা প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম তেলের দামের সঙ্গে যুক্ত করা হলেও, এখানে একটা ফাঁক ছিল। তেলের মতো গ্যাসের দাম অত দ্রুত বাড়েনি। গ্যাসের ব্যবহারে দক্ষতা বেশি হওয়ায় মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবও তত তীব্র হয়নি। অতি সম্প্রতি, তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে অপ্রচলিত গ্যাসের মজুতভাণ্ডারের সদ্ব্যবহার করার কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেল গ্যাসের উৎপাদন। 'নিরাপদ' এলাকা থেকে গ্যাসের সরবরাহও অনেক সময় বিঘ্নিত হয়েছে। তবে সে ঘটনা অনেক কম।

১৯৭০ সালের পর থেকে শক্তি নিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে দুটি বিষয়। প্রথমত, অর্থনীতির শক্তি নির্ভরতা হ্রাস। দ্বিতীয়ত তেলের বাজারের দক্ষ পরিচালনা। তবে এই বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপ যে বন্ধ হয়ে গেছে, তা নয়। ব্রিটিশ বহুজাতিক সংস্থা সেন্ট্রিকা কেনার জন্য বৃহত্তম রুশ সংস্থা গ্যাসপ্রম যখন নিলামে অংশগ্রহণ করে, তখন তার তীব্র প্রতিবাদ করে ব্রিটেন। আবার ইউনোক্যালের চীনা মালিকানা দ্রুত প্রতিহত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই ধরনের হস্তক্ষেপে কি শক্তি নিরাপত্তা বেড়েছে না কমেছে? তেলের নিরাপত্তা বাড়াতে ভারত এবং চীন গত এক দশক ধরে নিজেদের জাতীয় তেল কোম্পানিগুলিকে উৎসাহ দিয়েছে বিদেশে তেলের বা গ্যাসের খনি কিনতে। এর ফলে অন্য কিছু সুবিধা পাওয়া গেলেও, আমাদের শক্তি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে এই নীতি কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।

১৩.২ তেলের দীর্ঘমেয়াদি যোগান ●

তেল সরবরাহে অস্থায়ী বিঘ্ন নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে গিয়ে এই ধারণার জন্ম হলেও শক্তি নিরাপত্তা কিন্তু কেবল এই একটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। যে দুটি নতুন বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা হল, শক্তির দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহের নিরাপত্তা এবং পরিবেশের উপর শক্তি সরবরাহ এবং ব্যবহারের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। দীর্ঘমেয়াদে শক্তির খরচের বৃদ্ধি আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সারা বিশ্বে শক্তির চাহিদা অনেকদিন ধরেই বেড়েছে বছরে ২ শতাংশের মতো। শক্তি সরবরাহকারীরা এই চাহিদা মিটিয়েছে অনায়াসেই। ইদানিং ভারতীয় এবং চীনা অর্থনীতিতে বৃদ্ধি হয়েছে দ্রুত এবং তাদের শক্তির খরচ বছরে ৪ এবং ৬ শতাংশ হারে বেড়েছে। গত এক দশকে তেলের মূল্যবৃদ্ধির পিছনে এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করা হয়। তাই ভারত ও চীনের শক্তি নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কারণ হয়েছে। এতটাই যে, আই ই এ প্রকাশিত এনার্জি আউটলুক-এর ২০০৭ সংখ্যার পুরোটা জুড়ে ছিল ভারত ও চীন।

ভারত এবং চীনে শক্তির খরচ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই দুটি দেশই শক্তি আমদানি করে। এই দুটি তথ্য থেকেই এই দুই দেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ। ভারতের বর্তমান তেল উৎপাদনের পরিমাণ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন। কিন্তু ২০৩০ সালের মধ্যে এই পরিমাণ কমে হবে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন, কেননা আমাদের অনেক খনিই উৎপাদনের শীর্ষবিন্দু অতিক্রম করে গেছে। মধ্যবিত্তের আয় বাড়ছে, বাড়ছে জীবনযাত্রার মানও। গাড়ি করে সে এখন শপিং মল-এ বাজার করতে যায়। ভবিষ্যতে এই সংখ্যাটা বাড়বে। সুতরাং পাল্লা দিয়ে বাড়বে তেলের চাহিদাও। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ খরচের জন্য ১২ কোটি টন আমদানি করা হয়। এটা বেড়ে ৩০ কোটি টন হতে পারে। চীনে বর্তমানে ৪৫ কোটি টন তেল খরচ হয়, যার মধ্যে ২৫ কোটি টনই আমদানি করে আনা। ২০৩০ সালের মধ্যে চীনের খরচ বেড়ে দাঁড়াবে ৮৫ কোটি টন। অভ্যন্তরীন উৎপাদন একই থাকবে এবং আমদানির পরিমাণ বেড়ে হবে ৬৫ কোটি টন।

২০৩০ সালের মধ্যে দুদেশের মিলিত আমদানির পরিমাণ হবে মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনের ৪০ শতাংশ এবং বিশ্বের তেল উৎপাদনের মাত্র ১৫ শতাংশ। আমদানির বিভিন্ন সূত্র থাকায় এই পরিমাণ তেল পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। পেট্রোল ও ডিজেলের পরিবর্ত হিসেবে জৈব জ্বালানি এবং সি এন জি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছে দুদেশই। ভারত পেট্রোলের সঙ্গে ৫ শতাংশ এথানল মেশাচ্ছে, তা বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হবে। ২০০৯ সাল থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে জৈব ডিজেল। ২০১৮ সালের মধ্যে ডিজেলের সঙ্গে ৮ শতাংশ জৈব ডিজেল মেশানোর পরিকল্পনা আছে। চীন পেট্রোলে ১০ শতাংশ এথানল ব্যবহার করে তৈরি করেছে E10। এরজন্য তারা প্রায় ১০ লক্ষ টন এথানল ব্যবহার করছে। ২০২০ সালের জন্য তাদের লক্ষ্য হল ১ কোটি টন এথানল এবং ২০ লক্ষ টন জৈব ডিজেল। এইসব কর্মসূচী সফল হলে তেলের উপর চাপ

অনেকটাই কমবে। যে কোনও সঙ্কটের সময় ভারত ও চীনের তেলের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারকে অগ্নিমূল্য করে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই ভারত ও চীন তাদের স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ গড়ে তুলছে। চীনের সংগ্রহে থাকবে ১০ কোটি ব্যারেল, যা বেড়ে দাঁড়াবে ৫০ কোটি ব্যারেল পর্যন্ত। ভারতে শুরুতে থাকবে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ব্যারেল এবং তা বেড়ে হবে ১১ কোটি ব্যারেল।

ভারত ও চীনের তেলের চাহিদা বিশ্বের শক্তি নিরাপত্তাকে বিপদে ফেলবে না—যদি তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের উৎপাদন বাড়ায়। এই কাজ যে তারা করবে, তা ধরে নেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত? তেল উৎপাদন মুষ্ঠিমেয় কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেক্ষেত্রে, এই দেশগুলি কি উৎপাদন সীমিত রেখে তেলের বেশি দাম পেতে প্রলুব্ধ হবেনা? এই সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আশার কথা হল, তেলের ক্রেতাদের মতো তেল উৎপাদনকারীরাও তেলের বাজারের যথাযথ কার্যকারিতা চান। বিশ্বের প্রধান তেলের খনিগুলিকে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সমস্যা হবে তখনই যদি এই বিনিয়োগ সময়মতো না হয়। তবে, তার জন্য ভারত বা চীনকে দায়ী করা অন্যায় হবে।

১৩.৩ পরবর্তী গিগাওয়াটের চিন্তা ●

যে কোনও দেশের শক্তিক্ষেত্রে গুরুত্বের বিচারে তেলের পরেই আসে বিদ্যুৎ। সাধারণভাবে বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়না। কিন্তু কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস সহ অন্যান্য যে সব প্রাথমিক উৎস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, সেগুলি আমদানি করা হতেই পারে। সেইসঙ্গেই যুক্ত থাকতে পারে নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা কতখানি মজবুত? যোজনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বর্তমানে ২০০ গিগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ২০৩০-এর মধ্যে ৮০০ গিগাওয়াট করা প্রয়োজন। এই হিসাবে ধরা হয় অর্থনীতিতে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি কিছুটা কমই হবে। এছাড়াও, সাশ্রয়ের মাত্রা বাড়িয়ে আমরা হয়তো ২০ শতাংশ শক্তি সঞ্চয় করতে পারব। পরিবহন ও সরবরাহ খাতে যে বিপুল অপচয় হয়, তার মাত্রাও হয়তো কিছুটা কমবে। এইসবই যদি আমাদের পক্ষে থাকে, তাহলে হয়তো উৎপাদন ক্ষমতা ৬৫০ গিগাওয়াট হলেই চলবে। এখন প্রশ্ন হল—এর জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি কি আমাদের কাছে আছে?

আমাদের বিদ্যুতের ৭০ শতাংশই আসে কয়লা থেকে। বর্তমানে অবশ্য কোনও নতুন ইউনিটই কয়লা সরবরাহের নিশ্চয়তা পাচ্ছে না (যাকে বলা হয় 'কোল

লিঙ্কেজ')। তবে আশা করা যায় এই সমস্যা সাময়িক। আমাদের দেশে যদি ৫২০০ কোটি টন নিষ্কাশনযোগ্য কয়লা থাকে, আর আমরা যদি তাকে ৪০ বছর চালাতে চাই (বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি ৪০ বছরের নিশ্চিত জ্বালানি সরবরাহ চায়), তাহলে প্রতি বছর প্রায় ১৫০ কোটি টন কয়লা উৎপন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে তা ৩০০ গিগাওয়াট উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট।

২০৩০ সাল পর্যন্ত এবং তার পরের জন্য আমাদের যা চাহিদা তার তুলনায় এই পরিমাণ নেহাতই সামান্য। আরও বেশি কয়লার মজুত খুঁজে পেতে উন্নত খননপ্রক্রিয়া এবং আরও গভীরে গিয়ে অধিক পরিমাণে কয়লা নিষ্কাশনের জন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি—এই দুটি বিষয়েই আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। যে কয়লা তোলা যাবে না, তাকে ভূগর্ভেই গ্যাসে পরিণত করার প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হবে। এটি আমাদের শক্তি নিরাপত্তাকে উন্নত করবে।

গত বছর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমরা ৫ কোটি টন কয়লা আমদানি করেছি। পরবর্তী পাঁচ বছরে এই আমদানির পরিমাণ বেড়ে হতে পারে ২৫ কোটি টন। এরমধ্যে যদি আমরা আমাদের উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারি, তাহলে হয়তো এই আমদানির পরিমাণ কমে যাবে। কিন্তু আরও ২০০ গিগাওয়াটের জন্য আমাদের আমদানির পরিমাণ বছরে ১০০ কোটি টন বাড়ানো কতখানি সঙ্গত হবে? নীতিগতভাবে তাতে কোনও সমস্যা হওয়া উচিত নয়। তবে তেলের মতো কয়লার আন্তর্জাতিক বাজার ততটা উন্নত নয়। একমাত্র জাপানই দীর্ঘদিন ধরে অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আমদানি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং রাশিয়ার মতো বৃহৎ কয়লা ব্যবহারকারী দেশের নিজস্ব কয়লার মজুত রয়েছে। সম্প্রতি ভারত ও চীনের আমদানির চাহিদা বেড়েছে। আমদানি করা কয়লার দীর্ঘমেয়াদি চাহিদার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রয়েছে। এর ফলে, কয়লা রপ্তানিকারী দেশগুলিতে উৎপাদন এবং সরবরাহে বিনিয়োগে বিলম্ব হতে পারে। ভারত ও চীনকে যথাসময়ে এই সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজে বার করতে হবে। সুবিধা হল তেলের মতো কয়লার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ততটা বাধাবিপত্তি নেই।

বিদ্যুতের আরেকটি উৎকৃষ্ট উৎস হল জলবিদ্যুৎ—যা সস্তা এবং নিরাপদ। ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের জলবিদ্যুতে আরও ৫০ গিগাওয়াট যুক্ত করার পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনা যাতে বাস্তবায়িত হয়, তা দেখাও একান্তভাবে প্রয়োজন। এরজন্য দুটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রথমত, পরিবেশের ক্ষতিকে আটকানো। দ্বিতীয়ত সহানুভূতি এবং দূরদৃষ্টি দিয়ে বাস্তুহারা মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। নেপালের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ কার্যকর হলে ভবিষ্যতে আমরা হয়তো আরও ১০০ গিগাওয়াট পেতে পারি।

সারা বিশ্ব জুড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পছন্দসই জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসকে গণ্য করা হয় একাধিক কারণে। ভারতে গ্যাস উৎপাদনের মাত্রা দৈনিক ১৫

কোটি কিউবিক মিটার ছুঁয়েছে। গ্যাস থেকে ১৯০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করেছি আমরা। অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী সাগরে ও এন জি সি এবং জি এস পি সি দুটি বড় গ্যাসের খনি পেয়েছে। এইসব খনি সহ অন্যান্য খনি থেকে উৎপাদন শুরু হলে ২০৩০ সালের মধ্যে দৈনিক আরও ১০ কোটি কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপন্ন হবে। সব গ্যাসই বিদ্যুতের জন্য পাওয়া যাবে না, কেননা এক্ষেত্রে অনেক প্রতিযোগী আছে। তবে, এর অর্ধেকও যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবহার হয়, তাহলেও আমরা আরও ১০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ পেতে পারি।

আমরা দেখেছি, প্রাকৃতিক গ্যাসের আমদানিতে তেলের মতো অত সমস্যা নেই। সেই ছয়ের দশক থেকে আমদানি করা এল এন জি-র উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল জাপান। আবার আলজিরিয়া থেকে গ্যাস এবং এল এন জি, দুইই আমদানি করেছে ইউরোপ। ভারত ২০০৪ সাল থেকে এল এন জি আমদানি করছে। বর্তমানে এই পরিমাণ ১ কোটি টন হলেও ২০৩০ সালের মধ্যে তা বেড়ে ৫ কোটি টন হয়ে যেতে পারে। ২০০৬ সালে এল এন জি আমদানি শুরু করে চীন। ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের ১০ কোটি টন আমদানি করার পরিকল্পনা আছে। আমরা যে অতিরিক্ত ৪ কোটি টন এল এন জি আমদানি করব, তার থেকে ৩০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে।

এল এন জি নিরাপদ হলেও তা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস আমদানি সবসময় নিরাপদ হয় না,কারণ এই পাইপলাইন সন্ত্রাসবাদীদের নিশানা হতে পারে, অথবা রাজনৈতিক মতবিরোধের ফলে সরবরাহে বাধাও পড়তে পারে। তবে, কম দূরত্বে বেশি পরিমাণ গ্যাস আমদানি করতে হলে পাইপলাইন যথেষ্ট সস্তা। ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরান-ভারত পাইপলাইন প্রকল্প কার্যকর হয়নি। আমরা তাই তুর্কমেনিস্তান থেকে পাইপলাইনের বিকল্প এক ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্যাস আমদানির চেষ্টা করছি। তবে তাও খুব একটা নিরাপদ নয়। ইন্দোনেশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে ভারতে আসা এক পাইপলাইন তৈরি করা সম্ভবপর হতেই পারে, কিন্তু তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। ইরান থেকে দৈনিক ৩০ থেকে ৫০ কোটি কিউবিক মিটার আমদানিই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। তাই সব বাধা পেরিয়ে এই উপায়কে কার্যকর করা উচিত আমাদের।

বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ হল অভ্যন্তরীণ গ্যাস এবং আমদানি করা গ্যাস থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের মাঝামাঝি। বায়ুশক্তির ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত। বর্তমানে তা ১৪ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। একথা আগেই উল্লিখিত যে আমাদের দেশে বায়ুশক্তির সম্ভাবনা ৫০ গিগাওয়াটের সরকারি হিসাবের থেকে অনেক বেশি। ২০৩০ সালের মধ্যে আরও ৫০ গিগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় বিশেষ

সমস্যা নেই।

বর্তমানে সৌরশক্তিই সবথেকে বেশি ব্যয়সাপেক্ষ। কিছুদিন আগে পর্যন্তও সৌর ফোটোভোলটায়িক বিদ্যুতের দাম ছিল ইউনিট পিছু ১৭ টাকা এবং সৌর তাপ বিদ্যুতের দাম ইউনিট পিছু ১৫ টাকা। সৌরকোষের দাম এতই কমে গেছে যে সৌরবিদ্যুৎ ইউনিট পিছু ৭.৫ টাকায় পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু, এই দামও প্রচলিত বিদ্যুতের দামের প্রায় তিনগুণ। সৌর মিশনের অধীনে ২০২০ সালের মধ্যে ২০ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণের এক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা। এই প্রকল্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ প্রকল্প সাফল্যের মুখ দেখলে সৌর বিদ্যুতের দাম কয়লা ও গ্যাসে বিদ্যুতের স্তরে নেমে আসতে পারে। তাহলে তা শুধু ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, গোটা বিশ্বের কাছেই এক বড় সুখবর হবে।

দেশজ বা আমদানি করা কয়লা, জলবিদ্যুৎ, গ্যাস এবং বায়ুশক্তি, এইসবই বিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে সস্তা। পরমাণু শক্তি, এল এন জি বা সৌরশক্তি হল তুলনামূলকভাবে ব্যয়সাপেক্ষ। আজকের কমদামী উৎস নানা কারণে ভবিষ্যতে দামী হয়ে যেতে পারে; আবার গবেষণা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে আজকের ব্যয়সাপেক্ষ উৎস কাল চলে আসতে পারে নাগালের মধ্যে। কোন জ্বালানির এবং কোন প্রযুক্তির ভবিষ্যতে কত দাম হবে তা বলা মুস্কিল কিন্তু এই পূর্বানুমান জরুরি কারণ এছাড়া বিনিয়োগ হয়না অথবা সরকারি নীতিও তৈরি হয়না। শক্তি নীতির অন্যতম দুরূহ অংশ হল 'প্রযুক্তির ভবিষ্যৎবাণী' (Technology Forecasting)। সেইকারণেই এই নীতিকে সর্বদাই সংস্কার ও পরিমার্জনা করে যেতে হয়। তাই, আজকের তারিখে ২০৫০ সালের বদলে ২০৩০-এর কথা বলাই অনেক যুক্তিসঙ্গত।

ভারতে যে সীমিত পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তা ১৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত ভারত মার্কিন চুক্তি আমাদের যে কোনও পরিমাণ ইউরেনিয়াম আমদানির ছাড়পত্র দিয়েছে। তবে ভারত যদি পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে এই ইউরেনিয়ামের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে চুল্লি আমদানির সঙ্গে আমরা সেই চুল্লির আজীবন প্রয়োজনের ইউরেনিয়ামও আমদানি করব। তত্ত্বগতভাবে তা শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বটে তবে প্রকৃতপক্ষে তা কাজ করবে কিনা জানা নেই। ইরান থেকে গ্যাস আমদানির বিপক্ষে প্রধান যুক্তিই হল নিরাপত্তা। একইভাবে আমরা কি এই প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারতাম না? গ্যাস আমদানি করে তাকে খালি হয়ে যাওয়া তেলের বা গ্যাসের খনিতে মজুত করা যেতে পারে। আজীবন প্রয়োজনের গ্যাস না হোক, এক বছরে যতটা গ্যাস লাগে তা মজুত তো করাই যায়। সেই সময়ের মধ্যে

পাইপলাইন আবার চালু করা যায়।

পরমাণু শক্তির সমস্যা হল সুরক্ষা বিষয়ক। কার্যত এই কারণেই ৩০ বছরেও এই শিল্পে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। যে তৃতীয় প্রজন্মের চুল্লি আমদানি করার কথা আমরা ভাবছি, অনেক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষই তার নকশা অনুমোদন করেছে। কিন্তু তা এখনও পর্যন্ত কোথাও চালু করা হয়নি। চালু হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে সে বিষয়ে কেউই কিছু জানেন না। এছাড়া, পরমাণু চুল্লির সুরক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের জন্যও আমরা বিশেষ কিছু করিনি। জইতাপুরের প্রতিবাদের পর এখন কুডমকুলমেও একই ঘটনা ঘটেছে। এই থেকে মনে হচ্ছে না আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ গিগাওয়াটের বেশি পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব।

আমরা শক্তির বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে এখানে যে পর্যালোচনা করলাম তার থেকে কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে পরমাণু শক্তি ছাড়া আমাদের গতি নেই। যে কোনও উৎস থেকে শক্তি পেতে গেলেই বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করতে হবে। অন্যান্য উৎসের সদ্ব্যবহারে আমাদের সংশয় থাকলে অথবা সেই প্রয়াস যথেষ্ট আন্তরিক না হলে, পরমাণু শক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া যাবেনা। ভারত এক্ষেত্রে জার্মানির মতো সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। 'পরমাণু শক্তি—এখনও নয়, কখনও নয়'—এই নীতি অবলম্বন করার অবস্থায় আমরা নেই। আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ হল—অন্যান্য উৎসের বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী হওয়া, যাতে অদূর ভবিষ্যতে পরমাণু শক্তির ভূমিকাকে সীমিত রাখা যায়। ২০৩০ সালের পর পরমাণু শক্তি আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ, ততদিনে তৃতীয় প্রজন্মের চুল্লির কার্যকারিতা প্রমানিত হয়ে যাবে এবং চতুর্থ প্রজন্মের চুল্লি কাজ করতে শুরু করবে। পরে, থোরিয়াম থেকে বিদ্যুৎ বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া গেলে আমাদের শক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশিরভাগ উদ্বেগেরই নিরসন হবে। পরমাণু শক্তি বেশ কিছুটা নিরাপদ হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। এখন থেকেই ৪০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা ঠিক নয়। পরমাণু শক্তির কট্টর সমর্থক ফার্ডিনান্ড ই ব্যাঙ্কস ২০০৭ সালেই বলেছিলেন—'প্রকৃতপক্ষে, পরমাণু শক্তি নিয়ে ধীরে চলার নীতিই যথাযথ। পরবর্তী প্রজন্মের যন্ত্রপাতির জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়, কারণ তা হাতে পেতে খুব একটা দেরি নেই। তার বদলে এখন তাড়াহুড়ো করলে অদক্ষ পরমাণু চুল্লির ভাণ্ডার গড়ে উঠবে।' স্পষ্ট কথা।

ভবিষ্যতের জন্য অনিবার্য হল সৌরশক্তি। তবে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ২০৩০ সালের পরেই। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে গ্রিনহাউজ গ্যাসের

নির্গমন কমাতেও সৌরশক্তি এবং অন্য নবীকরণীয় শক্তির উন্নয়ন একান্তভাবে প্রয়োজন। শক্তি নিরাপত্তা ও বিশ্ব উষ্ণায়নের বিষয়ে এইখানেই সাদৃশ্য। আর পার্থক্য হল এই যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ব্যাপারে আমরা যে ধরনের আর্ন্তজাতিক তৎপরতা দেখতে পাই তা শক্তি নিরাপত্তার বেলায় দেখিনা। ও ই সি ডি-র দেশগুলি ছাড়া অন্য সব দেশই শক্তি নিরাপত্তার সমস্যাটি তার নিজের সমস্যা বলে মনে করে। রাশিয়া যখন ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয় তখন ইউরোপিয় ক্রেতারা সম্মিলিতভাবে এর সমাধানসূত্র বার করতে পারেনি। প্রত্যেক দেশই এককভাবে রাশিয়ার সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে আপোস করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে!

১৩.৪ আবার উৎপাদনের শীর্ষবিন্দু ●

তেল বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা উৎপাদনের শীর্ষবিন্দু এবং তেলের মজুত ফুরিয়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। শক্তি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের কাছে এটি ছিল ফেরম্যাঁর শেষ সম্পাদ্যের মতো— ছাড়াও যায় না, আবার সমাধানও করা যায় না। তবে, আগে এটি যত তীব্র ছিল, এখন আর ততটা মনে হয়না। ভারতের কয়লার মজুত যদি আজই ফুরিয়ে যায়, তাহলে তা হবে খুবই অসুবিধাজনক। বাস্তবে, ২০৫০ সালের পরেও ব্যবহার করার মতো মজুত আমাদের আছে। যখন আরও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি স্বল্পমূল্যে পাওয়া যাবে, তখন আমরা নিজে থেকেই কয়লার ব্যবহার বন্ধ করতে পারি। তখন যদি আমাদের কয়লা ফুরিয়ে যায়, তাতে খুব একটা অসুবিধা হবেনা। ১৯৯৮ সালে ক্যাম্পবেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ২০১০ বা ২০২০ সালে বিশ্বের সমস্ত তেল ফুরিয়ে যাবে। তা সত্যি হলে তার ফল হত বিধ্বংসী। প্রত্যেকেই তাড়াহুড়ো করে সবরকম আধারেই তেল ভরে রাখত। তেল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি সংরক্ষিত বনাঞ্চল খুঁড়ে তেল খোঁজার কাজ চালাতো। সরকার সর্বাধিক তেল উৎপাদনের মাত্রা নির্ধারণের জন্য আইন পাশ করত। (প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে এইরকম আইন আছে। ছয় আর সাতের দশকে এই আইন পাশ করা হয়েছিল, কারণ তখন মনে হয়েছিল গ্যাসের মজুত কম।) তেলের সঙ্কট মোকাবিলার জন্য সরকার তেল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত । নিজেদের তেলের মজুতের উপর নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করে অনেক সরকারই হয়তো অন্য দেশের মজুতভাণ্ডার দখল করতে চাইত, আমেরিকার ইরাক অভিযানের মডেলে। সুখের কথা, ক্যাম্পবেলের ভবিষৎদ্বাণী সঠিক হয়নি। দ্বিতীয় প্রজন্মের জৈবজ্বালানির বাজার ছেয়ে যাওয়া এবং বিদ্যুৎ চালিত গাড়ির বহুল প্রচলন হওয়া পর্যন্ত তেল থাকবে বলেই আশা

করা হচ্ছে। তেলের অভাব তারপরে আর সেভাবে অনুভূত হবেনা। শক্তি নিরাপত্তার মতো ক্ষণস্থায়ী বিষয়টিও হয়তো তেলের সঙ্গেই বিস্মৃতির অতলে চলে যাবে।

১৩.৫ দারিদ্র্য এবং শক্তির নাগাল ●

শক্তি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের অবস্থান কোথায়? বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ প্রায় ২০০ কোটি মানুষ 'পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ এবং সুলভ' শক্তির উৎসের নাগালই পান না। তারা কি শক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত গবেষণার আওতার বাইরেই থাকবেন? দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত আছে অনেক বঞ্চনা। গরিব মানুষ তার সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পারেনা। সে পরিচ্ছন্ন পাণীয় জল পায়না, স্বাস্থ্য পরিষেবাও পায় নামমাত্র। এরই মধ্যে পরিচ্ছন্ন শক্তির অভাব কি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ? দারিদ্র্য আর শক্তির অভাব নিয়ে আগে খুব একটা গবেষণা হয়নি কিন্তু এখন একথা স্বীকৃত যে আধুনিক শক্তির উৎস প্রদানকে আমাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। শক্তি দারিদ্র্য এখনও শক্তি নিরাপত্তার অংশ হিসাবে গণ্য হয়নি। কিন্তু এইটিই তার যথাযথ স্থান।

স্বাধীনতার এত বছর পরেও যোজনা কমিশন এখনও দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। দারিদ্র্যের মতো একটি জটিল বিষয়ে ঐকমত্য সহজ নয়। শক্তি দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ আরও কঠিন। একটি দরিদ্র পরিবারের কতখানি শক্তি প্রয়োজন? বাড়ির জন্য অন্তত সন্ধ্যেবেলা বিদ্যুতের প্রয়োজন। স্থানীয় স্কুল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও বিদ্যুৎ চাই। পানীয় জল আর সেচের কাজেও বিদ্যুৎ দরকার। আমাদের জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি অনুযায়ী এই হিসাব প্রতিদিন ১ কিলোওয়াট—ঘণ্টা। আর প্রতিটি পরিবারের জন্য এই পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে ২০১২ সালের মধ্যে। ২০০৫ সাল থেকে কার্যকর রাজীব গান্ধী গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ যোজনা এ পর্যন্ত ১ কোটি ৮০ লক্ষ পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচীতে ৬০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ২০২০ সালের মধ্যে সার্বিক বৈদ্যুতিকরণ হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।

দরিদ্র পরিবারগুলিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। এতবড় পরিকাঠামো তৈরি করতে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগও কোনও সুফল দিতে পারবে না। এই সমস্যার সঠিক সমাধান হল ছোট ছোট উৎপাদন কেন্দ্র চালু করে ছোট গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ। কিন্তু গ্রামীন স্তরে ছোট ছোট উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে

তোলা এবং তা চালানোর যোগ্য উদ্যোক্তার অভাবেই সরকারি ব্যবস্থা সাফল্যের মুখ দেখেনি। এই স্তরে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ব্যাপক প্রয়াসের প্রয়োজন।

ভর্তুকি ও নাগাল ●

ভারতে কেরোসিনের যথাযথ দাম কি হওয়া উচিত? কেরোসিনে কতটা ভর্তুকি দিলে তা গরিব লোকের নাগালে আসবে? মধ্যপ্রাচ্যে তেলের অনুসন্ধান ও উন্নয়নের খরচ ছিল ব্যারেল প্রতি ১.৫ ডলার। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৩.৫ ডলার। এর সঙ্গে উৎপাদনের খরচ ধরা গেল আরও ২ ডলার, জাহাজের মাসুল ও বীমা ইত্যাদি বাবদ ৩ ডলার, শোধনের লভ্যাংশ বাবদ ১০ ডলার এবং বিপণন বাবদ আরও ১০ ডলার। কর যোগ করার দরকার নেই, কারণ দরিদ্র মানুষ কর কেন দেবে? তাহলে, কেরোসিনের কত দাম পাওয়া যাবে? অঙ্কটা করলে দেখা যাবে, ভারতের গরিব মানুষই ভর্তুকি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তেল শিল্পকে।

এল পি জি বা জৈব গ্যাসের মতো পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানিও আমাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের অর্ধেক পরিবারই এল পি জি ব্যবহার করে। জৈব গ্যাস ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা অনেক কম। বেশির ভাগ পরিবারেরই কিন্তু এল পি জি অথবা জৈব গ্যাস কোনওটাই নেই, তারা কয়লা, কাঠকয়লা, কাঠ, খড়, ঘুঁটে ইত্যাদি ব্যবহার করে। এবং তা উন্নত উনুনের সুবিধা ছাড়াই। মেয়েরা কাঠ সংগ্রহ ও বয়ে আনার অসুবিধা ও সমস্যা ভোগ করে। রান্নার সময় অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়ার মধ্যে নিঃশ্বাস নেয় তারা এবং তাদের ছেলেমেয়েরাও। ফলে পেশির ব্যথা, জ্বালা-পোড়া, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, এমন কি ফুসফুসের ক্যানসারেও আক্রান্ত হয়। এইসব কারণে গোটা বিশ্বে প্রতিবছর ১৬ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যু হয়। সেইসঙ্গে কারবনের নির্গমন উষ্ণায়ণকেও বাড়ায়।

ভারতের গ্রামাঞ্চলে আলো জ্বালানোর জন্য কেরোসিন ও উদ্ভিজ তেল ব্যবহৃত হয়। আমরা প্রতিবছর কেরোসিনে ভর্তুকি বাবদ কোটি কোটি টাকা খরচ করি। কিন্তু এর অধিকাংশই দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছায় না, কেননা ডিজেলে ভেজাল হিসেবে কেরোসিন ব্যবহার করা হয়। গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে আলো দেওয়ার জন্য আরও উপযোগী হতে পারে সৌর আলো বা সৌর লণ্ঠন। ২০০৬ সালে TERI-র উদ্যোগে 'লাইটিং এ বিলিয়ন লাইভস' নামে এক কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এর অধীনে ভারত ও বিদেশে সৌর লণ্ঠন বিতরণ করা হয়। প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগের সমন্বয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এই কর্মসূচী।

দরিদ্র মানুষকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ব্যাপারে একাধিক দেশই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। কিন্তু রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে কেউই তেমন উদ্যোগী নয়। উন্নতমানের উনুন বিতরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভাল কাজ করেছে চীন। তবে অন্যান্য দেশ এব্যাপারে বিশেষ কিছুই করেনি। হিসাব মতো, ২০০ কোটি মানুষকে বিদ্যুৎ সংযোগ, ৩০০ কোটি মানুষকে পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি এবং কাঠ ব্যবহারকারী মানুষকে উন্নত উনুন দিতে হলে প্রায় ৬০,০০০ কোটি ডলারের প্রয়োজন। শক্তিক্ষেত্রে প্রতিবছর যত পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়, তার তুলনায় এই অঙ্ক খুব বেশি নয়। উপযুক্ত এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে এই অর্থ সংগ্রহ করাও খুব একটা কঠিন কাজ নয়। ■

শব্দার্থ ও উৎস

- প্রয়োজনীয় শব্দার্থ
- উৎস ও অনুসন্ধান

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

১. **ব্যারেল (Barrel)** তেলের পরিমাণ সংক্রান্ত একক। বর্তমানে, অশোধিত তেলের বাণিজ্যে ব্যারেলের ব্যবহার না হলেও তেলের পরিমাণ বোঝানোর জন্য এখনও পর্যন্ত ব্যারেলই সর্বাধিক প্রচলিত একক। এক ব্যারেল আনুমানিক ১৬০ লিটারের সমান। ৭.৫ ব্যারেলে এক টন হয়।

২. **বিউটেন (Butane)**— C_4H_{10} তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে পাওয়া যায়।

৩. **ক্যালরি (Calorie)**—তাপ মাপার একক। এক গ্রাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাই হল এক ক্যালরি। তাপের একক হিসাবে কিলোক্যালরি এবং অন্যান্য ব্রিটিশ এককও ব্যবহৃত হয়।

৪. **ক্যালরিফিক ভ্যালু (Calorific value)**—এক একক পরিমাণ জ্বালানিকে পোড়ালে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় ক্যালরিফিক ভ্যালু। ভারতীয় কয়লার ক্ষেত্রে এই তাপের পরিমাণ প্রতি কিলোগ্রামে ৪৫০০ কিলোক্যালরি।

৫. **সিটেন (Cetane)**— $C_{16}H_{34}$ ডিজেলের একটি উপকরণ। ডিজেলের দহনক্ষমতা মাপার জন্য সিটেন নাম্বার ব্যবহার করা হয়। এই নাম্বার বা সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় ডিজেলের দহন কত মসৃণ হবে।

৬. **কোক (Coke)**— প্রায় বিশুদ্ধাকার কারবন, যা কয়লাকে বায়ুর অনুপস্থিতিতে ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন হয়। জ্বালানি এবং ইস্পাত উৎপাদনে বিজারক হিসাবে এর ব্যবহার।

৭. **কম্বাইনড সাইকেল (Combined cycle)**— কম্বাইনড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাস টারবাইন থেকে বার হওয়া গরম গ্যাস বাষ্প উৎপন্ন করে এবং তার সাহায্যে আরেকটি টারবাইন চলে। এর ফলে উৎপাদনকেন্দ্রের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় অনেকগুণ।

৮. **ডিজেল (Diesel)**— অশোধিত তেলের পাতনের ফলে উৎপন্ন তরল জ্বালানি। অন্তর্দহন ইঞ্জিন চালাবার জন্য আদর্শ।

৯. **ইথেন (Ethane)**–C_2H_6। প্রাকৃতিক গ্যাসের উপকরণ যা পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১০. **এথানল (Ethanol)**–C_2H_5OH গাড়ি চালাবার জন্য পেট্রোলের পরিবর্তে ব্যবহৃত অ্যালকোহল।

১১. **ফিউশন (Fusion)**— একধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়া বা সংযোজন যাতে দুটি হালকা পরমাণু কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) জুড়ে একটি অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণু কেন্দ্র গঠন করে। এই বিক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়। এই ধরনের বিক্রিয়ার বাণিজ্যিক ব্যবহার এখনও সম্ভবপর হয়নি।

১২. **গ্যাস হাইড্রেট (Gas Hydrate)**— বরফের অণুতে মিথেন আটকা পড়লে গ্যাস হাইড্রেট গঠিত হয়। মহাসাগরের তলদেশ অথবা রাশিয়া এবং কানাডার চির-হিমায়িত অঞ্চলে গ্যাস হাইড্রেট পাওয়া গেছে।

১৩. **জিওথার্মাল এনার্জি (Geothermal Energy)**— ভূতাপীয় শক্তি যা ভূগর্ভের তপ্ত বাষ্প থেকে পাওয়া যায়।

১৪. **ইন্ডিকেটেড রিজার্ভ (Indicated Reserve)**— নির্দেশিত মজুত। জীবাশ্ম জ্বালানির আনুমানিক হিসাব। অনুসন্ধানের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এই তথ্যে জ্বালানির প্রাপ্তি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা হয়।

১৫. **ইন্টারনাল কমবাশ্চন ইঞ্জিন (Internal combustion Engine)**— অন্তর্দহন ইঞ্জিন। দহনক্রিয়া সিলিণ্ডারের মধ্যে হয়। ফলে, তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।

১৬. **কেরোসিন (Kerosene)**— অশোধিত তেলের পাতনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাপ্ত এই তেল আলো জ্বালানো এবং রান্নার জ্বালানি হিসাবে বহুল ব্যবহৃত। কেরোসিনের উচ্চমার্গের সংস্করণ এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (Aviation Turbine Fuel) বিমান চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

১৭. **কিলোওয়াট আওয়ার (Kwh)**— বিদ্যুতের একটি একক। ভারতীয় গৃহকর্তারা এক kwh বিদ্যুতের জন্য পাঁচ থেকে সাত টাকা দাম দেন।

১৮. **এল এন জি (LNG)**— প্রাকৃতিক গ্যাসকে মাইনাস ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে শীতল করলে পাওয়া যায় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস।

১৯. **এল পি জি (LPG)**— রান্নার কাজে ব্যবহৃত লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়ম গ্যাস। ভারতে

ব্যবহৃত এল পি জি হল অর্ধেক প্রোপেন এবং অর্ধেক বিউটেন

২০. **মার্কার ক্রুড (Marker Crude)**— বাজারে প্রাপ্ত অশোধিত তেলের মানদণ্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডবলিউ টি আই), নর্থ সি-এর ব্রেন্ট এবং দুবাই-এর অশোধিত তেলই হল দিকচিহ্ন। এদের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই অন্যান্য অশোধিত তেলের দাম নির্ধারিত হয়।

২১. **মিথেন (Methane)**–CH_4। বর্ণহীন, পরিচ্ছন্ন ও দাহ্য এই গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপকরণ। ইউরিয়া উৎপাদনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল।

২২. **ন্যাসেল (Nacelle)**— বায়ুচালিত টারবাইনের জেনারেটরের উপরে থাকা ফাইবার গ্লাসের আস্তরন।

২৩. **ন্যাফথা (Naphtha)**— অশোধিত তেলের পাতনের ফলে উৎপন্ন এই তরল কারখানার চুল্লির জ্বালানি এবং ইউরিয়া ও পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২৪. **ন্যাচারাল গ্যাস (Natural Gas)**— মুক্ত অবস্থায় অথবা অশোধিত তেলের সঙ্গে মিশে থাকে। মূল উপাদান মিথেন। সেইসঙ্গে সামান্য পরিমাণে ইথেন, প্রোপেন এবং বিউটেন থাকে।

২৫. **নিউক্লিয়াস (Nucleus)**— পরমাণুর কেন্দ্রে থাকা জমাট, ভারী বস্তু, যাকে পরমাণুকেন্দ্র বলা হয়। এতে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন, যাদের সংখ্যা একেকটি মৌলের ক্ষেত্রে একেকরকম।

২৬. **অক্টেন (Octane)**–C_8H_{18} পেট্রোলের একটি উপাদান। পেট্রোলের নির্বিঘ্ন দহন ক্ষমতা নির্ধারণ করে তার অক্টেন সংখ্যা।

২৭. **ওপেন সাইকেল (Open cycle)**— ওপেন সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাস টারবাইন থেকে বার হওয়া গরম হাওয়াকে বাষ্প উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় না।

২৮. **ওটিইসি (OTEC)**— ওশান থারমাল এনার্জি কনভারশান। মহাসাগরের উপরিভাগ এবং তলদেশের জলের তাপমাত্রার পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে তার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি।

২৯. **ওভারবারডেন (Overburden)**— কয়লার মজুতভাণ্ডারের উপরিভাগের ভূস্তর। খনি থেকে কয়লা তোলার আগে এই স্তর সরানো প্রয়োজন।

৩০. **পেট্রোল (Petrol)**— অশোধিত তেলের পাতন থেকে প্রাপ্ত সর্বাধিক মূল্যবান তরল। যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে অপরিহার্য।

৩১. **প্রোপেন (Propane)**–C_3H_8। জ্বালানি এবং পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত।

৩২. **প্রুভেন রিজার্ভ (Proven Reserve)**— জীবাশ্ম জ্বালানির অনুসন্ধানের উন্নত পর্যায়ে উপনীত জ্বালানির মজুতের তথ্যনিষ্ঠ হিসাব। প্রমাণিত মজুত।

৩৩. **আর পি রেশিও (R/P Ratio)**— প্রমাণিত মজুতকে বর্তমান বার্ষিক নিষ্কাশন দিয়ে ভাগ করে যে অনুপাত পাওয়া যায়। জ্বালানি কত বছর পাওয়া যাবে তার প্রাথমিক হিসাব।

৩৪. **সোলার পি ভি সেল (Solar PV Cell)**— সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোষ বা সেল।

৩৫. **সোলার থারমাল (Solar Thermal)**— সৌর তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র সূর্যালোককে একত্র করে উচ্চ তাপ উৎপন্ন করে এবং তার থেকে বাষ্প তৈরি করে তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

৩৬. **সাওয়ার গ্যাস/সুইট গ্যাস (Sour gas/Sweet gas)**— সালফার যুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস হল সাওয়ার বা অম্ল গ্যাস। গ্যাস ব্যবহারের আগে সালফার মুক্ত করতে হয়। সালফারমুক্ত গ্যাস হল সুইট বা মিষ্টি গ্যাস।

৩৭. **সিনগ্যাস (Syngas)**— হাইড্রোজেন এবং কারবন মনোক্সাইডের মিশ্রণ। এই গ্যাসকে জ্বালানি এবং ডিজেল ও পেট্রোল উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৩৮. **ট্যারিফ (Tariff)**— নিয়ন্ত্রক দ্বারা নির্ধারিত বিদ্যুতের দাম, যা বিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎপন্ন বিদ্যুতের জন্য নিতে পারে উৎপাদনকারী সংস্থা।

৩৯. **টাইডাল এনার্জি (Tidal Energy)**— জোয়ারজাত শক্তি, যা প্রতিদিন জোয়ার-ভাটায় প্রবাহিত জলের থেকে পাওয়া যায়।

৪০. **ওয়েভ এনার্জি (Wave Energy)**— সাগরের তরঙ্গ থেকে প্রাপ্ত শক্তি।

উৎস ও অনুসন্ধান

1. Access to Energy – Enhancing Effectiveness in Electricity Distribution and End-use. Government of India and UNDP 2010.
2. Annual Reports 2010,2011,2012:
3. Ministry of Petroleum and Natural Gas
4. Ministry of Power
5. Ministry of Coal
6. Ministry of New and Renewable Energies
7. Bioenergy Resources Status in India. PISCES 2002.
8. BP Statistical Review of World Energy 2012.
9. Climate Change and India: A 4x4 Assessment. Indian Network for Climate Change Assessment. MOEF 2010.
10. Electricity in India: Providing Power for the Millions. IEA (International Energy Agency) 2002.
11. Energy Recovery from Wastes. Govt of India. MNRE.
12. Harnessing Solar Energy: Options for India. CSTEP 2010.
13. Hydro Power Policy 2008. Ministry of Power. Government of India.
14. In Pursuit of the Future: 25 Years of IEA Research Towards Realisation of Hydrogen Energy Systems. IEA 2004.
15. Integrated Energy Policy. Report of the Expert Committee. Planning Commission 2006.
16. National Action Plan on Climate Change. Government of India.
17. Natural Gas in India. IEA 2010.
18. On the Road in 2035: Reducing Transportation's Petroleum Consumption and GHG Emission. MIT 2008.
19. Phase out of Incandescent Lamps. IEA 2010.
20. Power sector in India: White Paper on Implementation Challenges and Opportunities. KPMG 2010.
21. Report of the Committee on Development of Biofuel. Planning Commission.

22. Review of International Policies for Vehicle Fuel Efficiency. IEA 2008.
23. Stern Review on the Economics of Climate Change. Government of UK.
24. Strategic Action for Rapid Implementation of Energy Efficiency. Prayas 2011.
25. Sustainable Energy for Equitable Development. World Bank 2010.
26. Sustainable Production of Second Generation Biofuels. IEA 2010.
27. Technology Roadmap: Biofuels for Transport. IEA 2011.
28. The Bali Roadmap: Key Issues Under Negotiation. UNDP.
29. The Economics of Transition in the Power Sector. IEA 2010.
30. The End of Cheap Oil. Scientific American March 1998.
31. The Future of Coal: An Interdisciplinary MIT Study. MIT 2007.
32. The Future of Nuclear Power: An Interdisciplinary MIT Study. MIT 2003.
33. The Indian Nuclear Industry: Status and Prospects. M V Ramana 2009.
34. Transport Energy Efficiency. IEA 2010.
35. 25 Years of Renewable Energy in India. MNRE.
36. The World Energy Assessment Report. UNDP.
37. World Energy Outlook 2010, 2011, 2012. IEA. ■

অর্ধেন্দু সেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্যসচিব। দিল্লিতে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকে কাজ করেছেন এবং কিছুদিন টাটা এনার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গবেষণা করেছেন। শক্তি ও পরিবেশ সংক্রান্ত অধ্যয়নে তাঁর বিশেষ আগ্রহ।

দু'শ' বছরের উপর হল আমরা শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করছি। শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে তাল রেখে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে। মোটর গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে; বিস্তার হয়েছে রেল পথের; বেড়েছে বিমান চলাচল। উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে মোবাইল ফোনের ব্যবহার। এসবই সম্ভব হয়েছে কয়লা, তেল, গ্যাসের মতো জ্বালানি সস্তা এবং সহজলভ্য হওয়ায়। গাড়ির চাকা তো বটেই, মোবাইল ফোন চালু রাখতেই এখন বছরে কয়েক লক্ষ টন ডিজেল পোড়াতে হয়।

এই অবস্থার পরিবর্তন আসন্ন। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন ২০৫০-এর আগেই একটা বড়সড় জ্বালানি-সংকট আসবে। যদি না-ও আসে, পরিবেশ দূষণ ও বিশ্ব-উষ্ণায়ন ঠেকাতে জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহার কমাতেই হবে। তার পরিবর্ত কি হবে? কেউ বলবেন পরমাণু শক্তি, কেউ বলবেন সোলার এনার্জি। কেউ আপত্তি করবেন পরমাণু শক্তির নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে, কেউ বা বলবেন সোলার এনার্জির অত্যধিক খরচের কথা। আমরা ঠিক কোন পথে হাঁটবো তা অনেকটাই নির্ভর করবে সরকারের শক্তি নীতির উপরে। এই নীতি যাতে সঠিক হয়, জনসাধারণের স্বার্থে হয়, নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সক্রিয়ভাবে তা সুনিশ্চিত করা।

প্রচ্ছদ : আমাদের দেশে কয়েক কোটি পরিবারের জন্য শক্তিনিরাপত্তার অর্থ একটাই—সময়মতো জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে রাখা।

প্রচ্ছদ-অলঙ্করণ : বিন্দিয়া থাপর • ফোটো : আশিষ কোঠারি